সোভিয়েতে বঙ্গসংস্কৃতি

(লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালা)

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ ; পি-এইচ্. ডি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক



প্রতিমা পুস্তক
১৩, কলেজ রো, কলি:-৯

প্রকাশক ঃ
বিমলেন্দু চক্রবর্তী, বি. এ., সাহিত্যভারতী
প্রতিমা পুস্তক
১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড,
কলিকাতা—১৪।

প্রথম প্রকাশ ঃ
দেবীপক্ষ
২০শে আশ্বিন
১৩৭১ সন।

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
প্রতিমা পুস্তক
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা—৯।

প্রচ্ছদপট ঃ
শক্তিময় বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
তুলসী চরণ বক্‌সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩-ডি, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা—৬।

দাম ঃ
৮·৫০ (আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা)
রেক্সিন বাঁধাই ১০·০০ (দশ টাকা)

ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি-সংঘের সভাপতি

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অশেষ শ্রদ্ধাভাজনেষু

নিবেদন

গত মার্চ-এপ্রিল মাসে সোভিয়েত রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ্ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার লোক-সংস্কৃতি ও নাটক সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় যে বক্তৃতাগুলো দিয়েছিলাম, সেগুলোর পরিবর্ধিত বাংলা অনুবাদ সকল শ্রেণীর বাঙ্গালী পাঠকেরই উপযোগী করে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হলো। মূল বক্তৃতাগুলো এক ঘণ্টার উপযোগী করে বিদেশী শ্রোতার শোনবার এবং বোঝবার মত সাধারণভাবেই রচিত হয়েছিল, বাংলা অনুবাদকালে যাতে তা বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় এনে যোগ করা হয়েছে। কারণ, যথাযথভাবে অনুবাদ করে সেগুলো প্রকাশ কর্‌লে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তাদের বিশেষ কোন মূল্য থাকত না। মূল বক্তৃতাগুলো ইংরেজি ভাষায়ও প্রকাশ করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের লোকশ্রুতি সম্পর্কে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমার পাশপোর্ট পাওয়ার দ্রুত ব্যবস্থা করে এই কার্যে যে ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, তার জন্যও তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম. পি. ও শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এম. পি. এই বিষয়ে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করে আমার বিদেশ যাত্রা ত্বরান্বিত কর্‌তে সাহায্য করেছেন। তাঁরাও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র।

এই গ্রন্থে আমার প্রদত্ত বক্তৃতাগুলোর বাংলা অনুবাদ ব্যতীতও ভূমিকা স্বরূপ একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত যোগ করা হয়েছে; কিন্তু এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বৃত্তান্তটি অসম্পূর্ণ রেখেছি। স্বতন্ত্র আর একটি

খণ্ডে লেনিনগ্রাদের বিস্তৃত সাংস্কৃতিক জীবন বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমার সেখানকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়ও বর্ণিত হবে। দুইটি খণ্ডেই এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হবে।

এই খণ্ড প্রকাশের কার্যে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র অধুনা অধ্যাপক শ্রীমান্ সুধীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার ফলেই তা অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীমান্ সনৎকুমার মিত্রও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তরুণ প্রকাশক পরম সাহিত্যানুরাগী শ্রীমান্ বিমলেন্দু চক্রবর্তী এই গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য যে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, তাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর যত্ন এবং চেষ্টার ফলেই এই গ্রন্থের সুষ্ঠু প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। কবি-বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধীর গুপ্ত বইখানির নামকরণ করে দিয়েছেন; সেজন্য তাঁর কাছেও আমি ঋণী।

সবশেষে আর একটি কথা নিবেদন করি। আমি আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় যা দেখেছি, তাই লিখেছি; যা শুনেছি কিংবা পড়েছি, তা লিখিনি। সুতরাং এই বইয়ের সকল তথ্যেরই দায়িত্ব আমার নিজের, অন্য কারুর নয়। আমি দেখতে কিংবা বুঝ্‌তে যদি ভুল করে থাকি, তার কথা অন্য। এই অল্পদিনের মধ্যেও কোন কোন বিষয় ভুলে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

মুদ্রণ বিষয়ে ন্যাশন্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসের সহযোগিতার ফলে এই গ্রন্থখানির প্রকাশনা তরান্বিত হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
গান্ধী-জন্মদিন, ১৩৭১ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

লেনিনগ্রাদের সংবাদপত্রে যে বিবরণী মুদ্রিত হয়েছিল, তার বঙ্গানুবাদ—

'কোলকাতার অতিথি'

'কয়েক দিন আগে ভারতীয় ভাষা-শিক্ষা-বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীগণ বহুদিনের প্রত্যাশিত অতিথি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের রচয়িতা, তদুপরি তিনি জাতিতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য বহু অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন। কিছুদিন পূর্বে অধ্যাপক ভট্টাচার্য কয়লা খাদের শ্রমিক ও ভারতীয় কৃষক-জীবন ভিত্তি করে একখানি সম্পূর্ণ ছোট গল্পের গ্রন্থও রচনা করেছেন।

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বাংলার লোক-শ্রুতি ও নাটক সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ২৬ শে মার্চ তারিখে অধ্যাপক ভট্টাচার্য এই সহরের ভারতবিদ্যা বিভাগের এক আলোচনা সভায় (seminar) অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তা'তে এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতায় বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বাংলা নাটকের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করেন। তারপর তিনি তাঁর টেপ রেকর্ডে গৃহীত কতকগুলো বাংলার লোক-সঙ্গীত বাজিয়ে শোনান এবং তাদের অর্থ বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেন। যাবার আগে তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে সোভিয়েত যুক্ত সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিজ্ঞান পরিষদের অন্তর্ভুক্ত লেনিনগ্রাদে অবস্থিত প্রাচ্য বিদ্যাভবন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে যে প্রাচীন পুঁথির বিরাট সংগ্রহ আছে, তাদের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি সেখানে সংরক্ষিত কয়েকটি বাংলা পুঁথির পরিচয় বলে দিয়ে সেখানকার গবেষকদের প্রভূত উপকার সাধন করেন।'

'লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটি'
১০ই এপ্রিল, ১৯৬৪

বিবরণ প্রদান-কারিণী ই. ব্রেসেলিনা
ভারতীয় ভাষা-বিভাগের সম্পাদিকা

বিষয়-সূচী



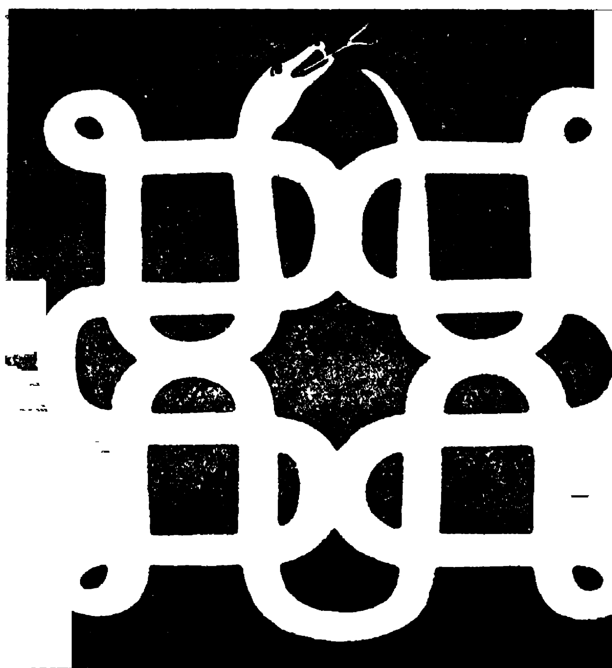
শোলার উপর আঁকা সর্পদেবীর চিত্রপট : (পূর্বমৈমনসিংহ)

সৌজন্যে প্রাপ্ত



চিন্তামণি মনসার ঘট, কেন্দুলি গ্রাম, বীরভূম

সৌজন্যে প্রাপ্ত



নাগপঞ্চমীর আলপনা, মৈমনসিংহ জেলা

সৌজন্যে প্রাপ্ত



নাগঘট ঃ মৈমনসিংহ জেলা

সৌজন্যে প্রাপ্ত



নাগঘট : শ্রীহট্ট জেলা

সৌজন্যে প্রাপ্ত



লেখক

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে বক্তৃতা রত

সেদিনকার বক্তৃতার বিষয় বাংলার যাত্রাগান

ফটো : লুবেজিন



ব্রোঞ্জ অশ্বারোহী

লেনিনগ্রাদ নেভা নদীর তীরে সাম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ স্থাপিত সেণ্টপিটার্সবুর্গের (লেনিনগ্রাদ) প্রতিষ্ঠাতা পিটার দি গ্রেটের অশ্বারোহী প্রতিমূর্তি। অশ্বপদতলে সর্প বিদলিত ; **Bronze Horseman** বলে এটা পরিচিত ; রুশ ভাস্কর্যের একটি বলিষ্ঠ নিদর্শন। বামে লেখক।

ফটো : ভিক্টোর বলিন



ফিন দেশীয় শ্লেজ গাড়ী

পরিশ্রান্ত লেখককে শ্রীযুক্তা ভেরা নভিকোভা ফিনদেশীয় শ্লেজ গাড়ীতে বসিয়ে তুষারীভূত ফিন্ উপসাগরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। বরফের উপর এই একমাত্র যান। ফিনল্যাণ্ড থেকে যানটি রুশ দেশে এসেছে বলে তা ফিনদেশীয় শ্লেজ গাড়ী বলে পরিচিত। কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় যান হিসাবেই যে এটি ব্যবহৃত হয়, তা নয়—শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরই বরফের উপর এটি একটি খেলার জিনিস। সেইজন্য তা ছোটবড় অনেক আকারেরই হয়ে থাকে।

ফটো : নিকলাই নভিকোভ



মৎস্য শিকার

লেলিনগ্রাদের তুষারীভূত হ্রদে মৎস্য শিকার : বরফের মধ্যে গর্ত খুঁড়লেই জল বেরোয়। সূতোতে বঁড়শি বেঁধে টোপ দিয়ে জলে ফেলে বসে মাছে খাবার জন্যে সূতো ধরে অপেক্ষা করা অবসর যাপনের একটি পরম বিলাস। পট-ভূমিকায় হিমক্লিষ্ট বনভূমি ; মধ্যস্থলে লেখক।

ফটো : শিবচরণ মুখোপাধ্যায়



বাঙ্গালীর আতিথ্যে

লেনিনগ্রাদের 'হোটেল রাশিয়া' ও 'মস্কো হোটেলে'র ভাবী-যন্ত্রবিদ্যা-শিক্ষানবীশ

বাঙ্গালী ছাত্রদের সঙ্গে (সর্বনিম্নে)লেখক

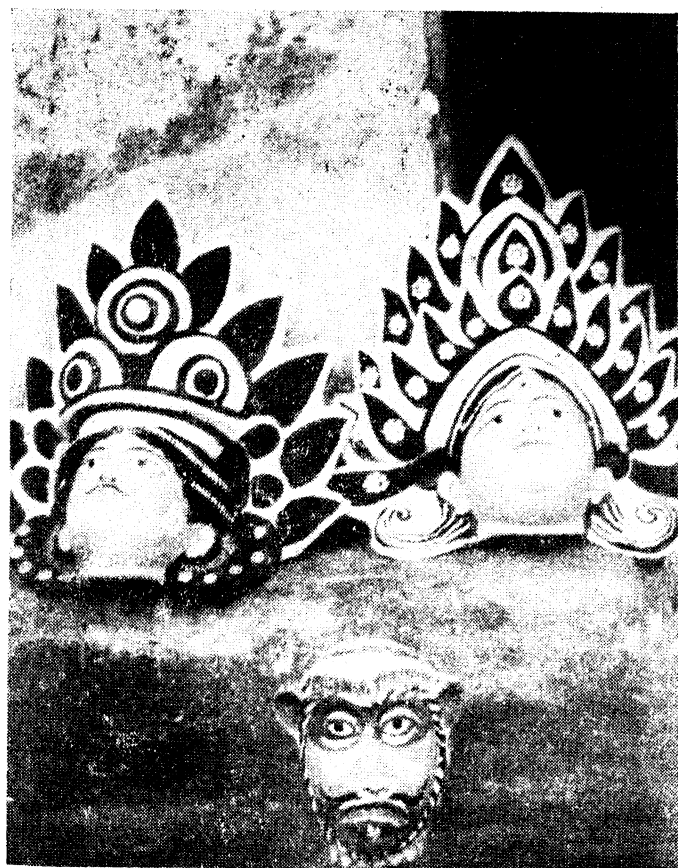
ফটো : শিবচরণ মুখোপাধ্যায়



রেপিনের গৃহোদ্যান

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রুশ চিত্রশিল্পী রেপিন তাঁর যে পল্লীগৃহে বাস করে সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলো এঁকেছেন, তা লেনিনগ্রাদ থেকে কুড়ি মাইল উত্তরে ফিন উপসাগরের তীরে অবস্থিত। তার গৃহটিতে তাঁরই নামে একটি সংগ্রহ-শালা (muséum) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই গৃহের চারপাশে তুষারাচ্ছন্ন উদ্যানের একাংশে শ্রীনিকলাই নভিকোভ-এর সঙ্গে (বামে) লেখক।

ফটো : ভেরা নভিকোভা



ভূমিকা

১

কোলকাতা : দিল্লী : তাসখন্দ : মস্কো

গত ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পত্র পাই, তা'তে জানতে পারি যে, তিন সপ্তাহের জন্য সোভিয়েত দেশে গিয়ে লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলার লোক সংস্কৃতি' বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য সোভিয়েত সরকার আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ভারত এবং সোভিয়েত সরকার উভয়ই আমার যাতায়াত এবং অন্যান্য সকল বিষয়ের ব্যয়-ভার বহন করবেন এবং সকল রকম ব্যবস্থা করবেন। এখন আমার সম্মতির অপেক্ষা।

ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দেবার এত বিষয় এবং এত লোক থাকতে সোভিয়েত দেশের বিদ্বৎ সমাজের আমার কাছ থেকে 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' বিষয়ে বক্তৃতা শোন্‌বার আগ্রহ যে কেন দেখা দিল, তা সহজে বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না ; বিশেষত : সোভিয়েত দেশ এবং তার রীতিনীতি, তার ভাষা—এ সব সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানই সেদিন ছিল না, সুতরাং এই অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ পেয়ে একদিক থেকে যেমন নিজেকে পরম সম্মানিত মনে করলাম, তেমনই অন্য দিক থেকে নিতান্ত বিপন্ন বোধ করলাম। বিশেষতঃ বিদেশ বল্‌তে, পাকিস্তানকে যদি বিদেশ বলা যায়, তবে কয়েক বার আমি পাকিস্তান গিয়েছি, একথা সত্য ; একবার সমুদ্র যাত্রাও ভাগ্যে জুটেছিল ; কিন্তু তাতেও আন্দামান-নিকোবর পর্যন্ত মাত্র গিয়েছিলাম। তবে তাও অবশ্য ভারত সরকারের সহকারী নৃতত্ত্ববিদ্‌রূপে নৃতত্ত্ব সমীক্ষার কাজেই যেতে হয়েছিল। সুতরাং সোভিয়েত দেশের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার মধ্যে আমার জীবনের

সর্বাধিক দূরবর্তী বিদেশযাত্রার একটি অভাবনীয় সুযোগ লাভ করলাম। আমি আমার সম্মতি জানিয়ে দিলাম এবং বাংলার লোক-সংস্কৃতির মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ করে আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে, তা জানাবার জন্য লিখ্লাম।

রুশদেশে লোক-সংস্কৃতির যে বিশেষ চর্চা হয়ে থাকে, তা' জানবার আমার একটু সুযোগ যে না হয়েছিল, তাও নয়; কিন্তু রুশ ভাষা না জান্বার জন্যে সেই চর্চা যে কোন্ ধারা বা প্রণালী অনুযায়ী হয়ে থাকে, তা কিছুমাত্র আমার জানবার সুযোগ ছিল না। যতদূর মনে হয়, ১৯৫৭ সনে যখন আমি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, তখন একদিন আমার একটি ছাত্রী এসে আমাকে বলল, একজন রুশ মহিলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্তে চান।

আমি তাঁকে বললাম, আমি ত রুশ ভাষা জানিনে, আমি কি করে তার সঙ্গে আলাপ কর্ব?

সে বল্ল, তিনি চমৎকার বাংলা বল্তে পারেন। তিনি বাংলাতেই আপনার সঙ্গে আলাপ কর্তে পারবেন।

আমি তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আস্বার জন্যে বল্লাম। বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, বাংলা ভাষায় তিনি আমাকে নমস্কার জানিয়ে আমার ক্লাশ করবার জন্যে তিনি অনুমতি চাইলেন।

আমি বললাম, আমি এখন মনসা-মঙ্গল পড়াচ্ছি, আপনি তার কি বুঝ্বেন? বাংলা সাহিত্যের তা একখানি প্রাচীন গ্রন্থ, দেবদেবী এবং ধর্মের কথাও তা'তে আছে।

তিনি বল্লেন, আমি এই বিষয়ই পড়্তে চাই, আমি বেশ বুঝ্তে পারব, আপনি দেখবেন।

আমার একটু কৌতূহল হলো, তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় শাখার অধ্যক্ষা,

বাংলা ভাষা ও বাংলা দেশের সংস্কৃতি বিষয়ে একটু বিশেষ জ্ঞান লাভ করবার জন্যে ভারতে এসেছেন। তিনি ইতিপূর্বেই বাংলা সাহিত্য থেকে কিছু কিছু রুশ অনুবাদ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের অনুবাদ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে, আসন্ন রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীও অনুবাদ করবেন, সে কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে। শুনে তাঁর উপর আমার শ্রদ্ধা হোলো; এ রকম অনুমতি দেবার আমাদের কোন অধিকার আছে কি না, না জেনেই আমি তাঁকে আমার ক্লাস করবার কথা বল্লাম। তাঁরই নাম শ্রীযুক্তা ভেরা নভিকোভা, রুশ দেশের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে যাঁর সামান্যও জ্ঞান আছে, তিনিই আজ তাঁর নাম জানেন এবং অনেকে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তার পরদিন থেকে আমি দেখ্‌তে পাই, তিনি নিয়মিত আমার 'মনসা-মঙ্গলে'র ক্লাসে উপস্থিত থাকেন। বয়সে তিনি একটু প্রবীণ হলেও বয়ঃকনিষ্ঠা ছাত্রীদের সঙ্গে একত্রই তিনি ক্লাসের বেঞ্চিতে বসে আমার বক্তৃতা শোনেন এবং মধ্যে মধ্যে মাথা নীচু করে বইয়ের পাতার ধারে ধারে কি সব লিখে যান।

ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আমার কথা কিছুই লিখে নিতে না পারে সে জন্য আমি বেশ দ্রুত আমার ক্লাসের বক্তৃতা দিয়ে থাকি; কারণ, আমি জানি লিখ্‌লেই তারা ভুল লিখ্‌বে এবং সেই ভুল আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। 'শতং বদ মা লিখ' নীতিতে আমি খুব বিশ্বাসী; কিন্তু তা' সত্ত্বেও দেখ্‌তে পাই, দু' একজন ছাত্র-ছাত্রী—বিশেষতঃ ছাত্রী আমার কথাগুলো প্রায় নির্ভুল লিখে নিতে পারে; কিন্তু অধিকাংশই লেখনী উদ্যত করে শূন্য খাতা সামনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে, লেখ্‌বার সুবিধা কর্‌তে পারে না। এই অবস্থায় শ্রীমতী নভিকোভা আমার কথা কতদূর বুঝ্‌তে পার্‌ছেন এবং কি-ই বা তার লিখে নিচ্ছেন, তা জান্‌বার জন্য কৌতূহল হোলো। একদিন তিনি নিজে থেকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ক্লাসে আমার কথা কি আপনি বুঝ্‌তে পারেন? আপনার জন্যে ত আমি সহজ করে কিংবা ধীরে ধীরে কোন কথা বলি নে।

তিনি বল্লেন, আপনার কথা আমি চমৎকার বুঝ্‌তে পারি। বলে আমাদের বিভাগের আরও একজন অধ্যাপকের নাম করে বল্লেন, আমি তাঁর কথাও বেশ বুঝ্‌তে পারি; কিন্তু আর কারো কথাই আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনে, ভাষা খুব শক্ত বলে মনে হয়।

সহজ বিষয়কে কঠিন করে বলতে না পারলে অধ্যাপনার, বিশেষ করে বাংলার অধ্যাপনার, কোন মূল্য থাকে না। তাঁর কথা শুনে আমি ভাবলাম—তাইত, তা হলে আমার কথা যখন একজন স্বল্প বাংলা-জানা বিদেশিনীও বুঝ্‌তে পারেন, তবে আমার অধ্যাপনার ত কোন মূল্যই নেই। কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পারলাম, তার মূল্য বাড়ানো আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়, এ' বয়সে আর নতুন করে দুরূহ এবং দুর্বোধ্য হতে পারব না। সুতরাং শ্রীযুক্তা নভিকোভা আমার অধ্যাপনা কার্যকে সেদিন প্রশংসা কিংবা নিন্দা করলেন, তা আমি তখন বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। সেজন্য তাঁর কথায় যে একটা খুব খুসী হয়েছিলাম, তাও বল্‌তে পার্‌ব না।

সপ্তাহে একদিন করে 'মনসা-মঙ্গলে'র ক্লাস হতো, আমি শ্রীযুক্তা নভিকোভাকে প্রতি সপ্তাহেই আমার ক্লাসে উপস্থিত দেখ্‌তে পেতাম। মধ্যে মধ্যে তিনি আমার বস্‌বার ঘরে এসেও কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, তা থেকেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, তিনি যে আমার ক্লাসের কথাগুলো শুধু বুঝতেই পাচ্ছিলেন তাই নয়, গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন। অথচ আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মনসা-মঙ্গলের মত সেকেলে একখানি বই সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি কর্‌তে আমাকে গলদঘর্ম হতে হতো, তাও শেষ পর্যন্ত অরণ্যে রোদনের মত হয়ে দাঁড়াত।

প্রায় এক বছর ক্লাস করবার পর শ্রীযুক্তা নভিকোভা একদিন আমাকে বল্লেন, এ'বার আমার দেশে ফিরে যাবার পালা, যাবার আগে একদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চাই।

আমি তাঁকে আমার বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যায় চা-পানের জন্য নিমন্ত্রণ করলাম, তিনি সাগ্রহে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

সে দিন তিনি বল্লেন, তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত নিকলাই নভিকোভ রুশদেশীয় লোক-সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ ; প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সোভিয়েত দেশীয় Academy of Science-এর অন্তর্ভুক্ত Institute of Russian Literature, Puskin House-এর লোক-সাহিত্য বিভাগে গবেষণার কার্যে রত আছেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে আমার বাংলার লোক-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার কথা জানতে পেরে এ' সম্পর্কে গভীর ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর রচিত রুশ লোক-সাহিত্য বিষয়ক কিছু কিছু রুশ ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আমার জন্য উপহার পাঠিয়েছেন। তবে তিনি রুশ ছাড়া আর কোন ভাষা জানেন না, সেজন্য ইংরেজি ভাষায় কোন বই আমাকে উপহার পাঠাতে পারলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি আমার কাছে একটি বিষয় চেয়ে পাঠিয়েছেন—বাংলা দেশে এ পর্যন্ত বাংলা লোক-সাহিত্য বিষয়ে যে অনুশীলন হয়েছে, তার একটি বিস্তৃত বিবরণী ইংরেজিতে লিখে শ্রীযুক্তা নভিকোভার হাত দিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, শ্রীযুক্তা নভিকোভার সাহায্যে রুশ ভাষায় অনুবাদ করে তা' তিনি *Russian Folklore*-নামে যে লোক-সাহিত্য গবেষণা বিভাগের বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তা'তে প্রকাশ করবেন ; লেখক হিসাবে তা'তে আমারই নাম থাকবে।

আমি সানন্দে স্বীকৃত হলাম এবং তাঁর দেশে রওয়ানা হবার আগেই তাঁর কাছে তা' পৌঁছে দেব বলে তাঁকে আশ্বাস দিলাম। তারপর তাঁর স্বামীকে উপহার দেবার জন্য আমার কয়েকখানি লোক-সাহিত্য বিষয়ক বাংলা বই এবং ইংরেজি

প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ (re-print) তাঁর হাতে দিলাম। যথা সময়ে তাঁর প্রার্থিত প্রবন্ধটিও লিখে শ্রীযুক্তা নভিকোভার হাতে দিলাম। সবগুলো বিষয়ই তিনি তাঁর স্বামীকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন। Study of Folk literature in Bengali নামে যে প্রবন্ধটি লিখে তাঁর হাতে দিয়েছিলাম, তা'তে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে, ১৮৭৩ সনে জর্জ গ্রায়ারসনের মাণিকচন্দ্র রাজার গানের সংগ্রহ, ১৮৮১ সনে রেভাঃ লালবিহারী দের *Folktales of Bengal*-এর প্রকাশ। তারপর রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ক আগ্রহ তাঁর ছেলে ভুলানো ছড়ার সংগ্রহ ও আলোচনা, তাঁর লোক-সাহিত্য গ্রন্থের প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই বিষয়ক প্রয়াস, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রচেষ্টা এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, নাথগীতিকা ইত্যাদির অনুসন্ধান এবং বাংলা এবং ইংরেজিতে তাদের প্রকাশ, গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলন এবং লোক-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের প্রয়াস এই সব বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছিল। শ্রীযুক্তা নভিকোভার অনুরোধে এই বিষয়ে আমার নিজেরও অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসের কথা তা'তে যুক্ত করতে হলো।

শ্রীযুক্তা নভিকোভা অল্পদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে গেলেন। তার কিছুকাল পর একখানি *Russian Folklore* নামক বৃহৎ গ্রন্থ তাঁর কাছ থেকে উপহার লাভ করলাম। তা'তে দেখতে পেলাম, বাংলা দেশের লোক-সাহিত্যের অনুশীলন বিষয়ে আমি যে প্রবন্ধটি লিখেছিলাম, তা'তে তা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে। আমার বোঝবার সুবিধার জন্যে শ্রীযুক্তা নভিকোভা তা লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে করে দিয়েছেন। একজন রুশ ভাষা জানা বন্ধুকে বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এ'সে তাঁকে দিয়ে

প্রবন্ধটি অনুবাদ করিয়ে বুঝ্তে পারলাম, আমি যা লিখে দিয়েছিলাম, তা সবই অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে। এমন কি, আমার নিজের বিষয়টিও তা' থেকে বাদ যায় নি।

কিছুদিন পর শ্রীযুক্তা নভিকোভা লেনিনগ্রাদ থেকে আমাকে একখানি চিঠি লিখে জানালেন যে, আমি আমার উক্ত প্রবন্ধে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সঙ্কলিত যে দু'খানি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছি—'ঠাকুমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝোলা'—এই বই দু'খানি তিনি রুশ ভাষায় অনুবাদ কর্তে চান, আমি যেন এই দুখানি বই সত্বর তাঁর কাছে ডাকে পাঠিয়ে দি'। আমিও কালবিলম্ব না করে দুখানি বই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি ধন্যবাদ সহকারে তার বিনিময়ে প্রচুর রুশ ভাষার লোক-সাহিত্যের গ্রন্থ আমার নামে উপহার পাঠালেন। উপহার প্রাপ্ত রুশ বইয়ের সংখ্যা আমার ক্রমাগতই বাড়্তে লাগল। সুন্দর বাঁধাই ও সুপরিচ্ছন্ন মুদ্রিত বইগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কোনদিন ভাবি—যদি এগুলো পড়্তে পারতাম! কিন্তু সময়ের অভাবে এবং নানা কাজের চাপে মনের অভিলাষ মনেই রয়ে যেত, বাইরে প্রকাশ কর্তে পারতাম না।

এই ভাবেই দিন যায়। শ্রীযুক্তা নভিকোভা চিঠিপত্রের সংযোগ কোন দিন বিচ্ছিন্ন হতে দেন না। স্বামীর স্বাক্ষরিত রুশ ভাষার লোক-সাহিত্যের বই নিয়তই উপহার আসে; নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় চলে। এইভাবে প্রায় ছয় বছর কাটে, তার মধ্যে শ্রীযুক্তা নভিকোভা অল্পদিনের জন্য একবার কোলকাতায়ও এসেছিলেন; কিন্তু আমি তখন কোলকাতার বাইরে ছিলাম বলে, তাঁর সঙ্গে তখন সাক্ষাৎ হয় নি। তারপর সহসা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই চিঠি।

চিঠি পেয়েই আমার সন্দেহ হোল যে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই নভিকোভা-দম্পতির কোন হাত আছে; সেইজন্য তাদেরও এই সংবাদ জানালাম। প্রথম চিঠিখানির কোন জবাব পেলাম না,

ভাবলুম কি ব্যাপার! নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে যখন আর একখানি চিঠি লিখলাম, তখন তার জবাবে শ্রীযুক্তা নভিকোভা লিখ্‌লেন—

লেনিনগ্রাদ
২১।১।৬৪

শ্রীচরণেষু,

আজকে আপনার নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপক পত্র পেলুম। আপনি যে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার লোক-সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন শুনিয়া আমরা খুব খুসি হ'লাম। খুবই আনন্দের কথা যে আমাদের চেষ্টা নিস্ফল হল না। এই বিষয়ে আপনি আগে যে চিঠি লিখেছিলেন তাহা আমি এখনও পেলুম না। যতই শীঘ্র তাহা পাব ততই উত্তর দিব।

লোক-সাহিত্যের ছাড়া আপনি বাংলা নাটকের সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার জন্য প্রস্তুত হলে ভাল হবে। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে আমাদের দেশে খুব শীত, সে জন্য শীতকাপড় নিন।

আমারা সব কুশলে আছি এবং আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনার সোভিয়েত দেশের যাত্রা কল্যাণ ও প্রসন্ন হউক। আমার স্বামীর ও আমার শুভকামনা নিন।

ইতি—

আপনাদের ভেরা নভিকোভা

এই চিঠি পেয়ে এই ভেবে একটু আশ্বস্ত হলাম যে যত দূর-প্রবাসই হোক, সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে অন্ততঃ একটি পরিবারের কাছ থেকে পরিচিতের সমাদর লাভ করতে পারব। প্রবল শীতের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও মার্চ মাসের প্রথম দিকেই আমার সোভিয়েত যাত্রার দিন স্থির করলাম।

পাশপোর্টের হাঙ্গামা কাটিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে মার্চ মাসের ১০ দিন চলে গেল, তবু 'ভিসা' এখনও জুট্‌ল না। কোলকাতার রুশ দূতাবাস জানাল, দিল্লী গেলে তাড়াতাড়ি ভিসা পাওয়া যাবে; আর

বিলম্ব না করে ১২ই মার্চ বিমান যোগে মস্কোর পথে দিল্লী রওয়ানা হলাম। সেদিনকার নতুন প্রবর্তিত ক্যারাভাল বিমানে দিল্লী যাত্রার কথা আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শীতের শেষরাত্রিকে উপেক্ষা করেও বিমান-বন্দরে কয়েকটি ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল, পরিবারের লোকজনও ছিল। বিমান ছাড়বার মুহূর্তে একটি ছাত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গে এসে হাজির হলো—এসব দেখেশুনেও মন একটুকুও বিচলিত হলো না। সকাল ৬ টায় দমদম থেকে রওয়ানা হয়ে আটটার আগেই অর্থাৎ ছ'ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যেই দিল্লীর পালাম বিমান-বন্দরে গিয়ে পৌঁছলাম। বিমানে উত্তর দিকের জানলার ধারে বস্‌বার আসন পেয়েছিলাম। দমদম থেকে বিমান ছাড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যোদয় হলো।

ভোরের আকাশ স্বচ্ছ ও নির্মল, ত্রিশ হাজার ফুট্ উপর দিয়ে অর্থাৎ এভারেস্টের সমান উঁচু পথ দিয়ে যখন দ্রুতগতি বিমান চল্‌ছিল, তখন হঠাৎ উত্তর দিকে তাকিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেলাম—সাদা মেঘের উপর দিয়ে সারি সারি মাথা তুলে হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গগুলো যেন নিঃস্তব্ধ হয়ে ধ্যানাসনে বসে আছে, প্রভাত-সূর্যের আলো তাদের গায়ে সোনার রঙ মাখিয়ে দিচ্ছে। এমন নির্মল আকাশ কদাচিৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাই এই দৃশ্যও সহজে চোখে পড়ে না; আজ আমার সুদূর প্রবাস-যাত্রার পথের পাশে দাঁড়িয়ে যেন ভারতের অতিবৃদ্ধ পিতামহগণ আমাকে তাঁদের মৌন আশীর্বাদ জানালেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেড় ঘণ্টা সময় যে কি ভাবে কেটে গেল, বুঝতেই পারলাম না, পালাম বিমান বন্দরে যখন নামতে শুরু করলাম, তখন চমক ভাঙ্গল।

ছুদিন দিল্লীতে নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে ১৪ই মার্চ ভোর বেলা আধুনিকতম রুশ বিমান 'এরোফ্লোটে' মস্কো যাত্রা স্থির হলো। ভোর সাড়ে পাঁচটায় নয়া দিল্লী এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার-ন্যাশনেলের আপিসে এসে হাজিরা দিতে হবে। সারা রাত্রি সেদিন আর ঘুম হলো না। তবে সেই জাগরণে আমার একটু পুণ্য সঞ্চয়

হয়েছিল। সেদিন ছিল শিবরাত্রি। রাত্রি জাগরণ সেদিন অতি পুণ্যকর্ম। সুতরাং আমার পক্ষে এই পুণ্যটুকু সহজেই সঞ্চয় করা হলো। শেষরাত্রি চারটার সময়ই ট্যাক্সি এসে হোটেলের দ্বারে হাজির হলো। নয়া দিল্লীতে গিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার আপিসে যখন পৌঁছুলাম, তখন সাড়ে পাঁচটা বাজবার অনেক দেরী। বস্‌বার ঘরের দরজা তখনও খোলাই হয় নি। দিল্লীতে শেষরাত্রে তখন প্রচণ্ড শীত, ট্যাক্সি থেকে মালপত্র আপিসের দরজায় নামিয়ে রেখে বাইরেই চুপ করে একাকী দাঁড়িয়ে রইলাম। সারারাত ধরে মস্কোর শীতের পোশাক পরেছি, তার প্রথম সদ্‌ব্যবহার এখানেই হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন শ্বেতাঙ্গিনী মধ্যবয়স্কা যাত্রিণী এ'সে সেখানে হাজির হলেন। তিনিও সেই বিমানেই কোথাও নিশ্চয়ই যাবেন বলে মনে হলো। তিনিও তাঁর জিনিসপত্র বিমান আপিসের দরজার কাছে নামিয়ে রেখে সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেও চুপ করে রইলেন; সম্ভবতঃ তিনি মনে করলেন, আমি তাঁর ভাষা জানিনে। আমিও চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলাম। সাড়ে পাঁচটা বেজে যাবার পরও আর কোন যাত্রী কিংবা আপিসের কোন কর্মচারী কেউ সেখানে এলো না। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে আমরা দু'জন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। এয়ার ইণ্ডিয়া আপিসের বসবার ঘরের দরজাটি self open door অর্থাৎ আপনা থেকে খুলে যায়; কিন্তু তার সামনে একটা শিকলের গণ্ডী টেনে দিয়ে আপিস যে বন্ধ, তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে; সেই শিকলটি ডিঙ্গিয়ে সহজেই ভিতরে ঢুক্‌তে পারা যায়; আমি আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারলাম না।

শ্বেতাঙ্গিনী যাত্রীকে উদ্দেশ করে ইংরেজিতে বল্লাম, আমরা এখন ভিতরে গিয়ে বসতে পারি। বলে আমি গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা আপনা থেকেই খুলে গেল। আমি ভিতরে গিয়ে ঢুকে একটা সোফায় বসে পড়লাম। মহিলা যাত্রীটিও নিঃশব্দে আমার অনুসরণ করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন কর্মচারী এলেন। কাছে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাব।

আমি বল্লাম, মস্কো। শ্বেতাঙ্গিনী যাত্রী বললেন, তিনি যাবেন সমরখন্দ—তাসখন্দ পর্যন্ত আমাদের বিমানে গিয়ে সেখান থেকে অন্য বিমানে যাবেন। এয়ার ইণ্ডিয়ার কর্মচারী একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলেন। আমাদের দু'জনকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে পালাম বিমান বন্দরে নিয়ে যাবার জন্য ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে দিলেন। আমাকে বললেন, ট্যাক্সির ভাড়া আপনারা দেবেন না, ওখান থেকেই সে পাবে।

তখনও দিল্লী নগরী অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দু'একটা গাড়ী শেষ-রাত্রির নীরবতা মুহূর্তের জন্য মাত্র ভেঙ্গে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি শ্বেতাঙ্গিনী সহযাত্রিণীকে পাশে নিয়ে নিঃশব্দে বিমান বন্দরের দিকে চলেছি। সুপ্ত দিল্লী নগরীর আলোকোজ্জ্বল রূপ পেছনে পড়ে রইল। অন্ধকার গ্রামের পথে গিয়ে প্রবেশ করলাম। আমার সহযাত্রিণী স্তব্ধ হয়ে আমার পাশে বসে রইলেন। যখন এই নীরবতা কেবল দুঃসহই নয়, আমার আছে অসৌজন্যপূর্ণ বলে মনে হলো, তখন আমিই সেই নীরবতা ভঙ্গ করে ইংরেজিতে বললাম, আজ শীতটা খুব পড়েছে।

তিনি একটু নড়ে-চড়ে বসেও গায়ের ওভারকোটটা আরও একটু এটে সেটে দিলেন মাত্র, মুখে কোন কথাই বল্লেন না। আমি সিদ্ধান্ত করলাম, তিনি ইংরেজি জানেন না। কিন্তু বিমান-বন্দরে গিয়ে শুন্‌তে পেলাম, তিনি কর্মচারীদের সঙ্গে সুন্দর ইংরেজিতে কথা বল্‌ছেন।

যাই হোক, সকাল সাতটার আগেই বিমানে গিয়ে আরোহণ করা গেল। বিমানটি কাল শেষরাত্রে জাকার্তা থেকে রেঙ্গুন হয়ে সোজা দিল্লী এসেছে। বিদেশী যাত্রীতে ভর্তি; দু'তিনজন যাত্রী দিল্লী নেমে গেলেন, তাই দু' তিনটি আসন সেখানে খালি হয়েছিল। তার মধ্যে একটি আসন আমার জন্য ছিল; রুশ আকাশ-নন্দিনী (Air

hostess) নিজস্ব ভাষায় অভিনন্দন জানিয়ে আসনটি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি আমার ওভারকোট সহই তা'তে বস্‌তে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আকাশ-নন্দিনী কিছু না বলেই আমার গা থেকে ওভারকোটটি খুলে নিয়ে সাম্‌নের দিকে স্টোরের কাছে একটা hanger-এর মধ্যে নিয়ে তা ঝুলিয়ে রাখলেন। সেখানে অন্যান্য যাত্রীদের ওভারকোট্‌গুলোও সারি সারি ঝুল্‌ছিল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রোদ উঠে শীতের কুয়াসা কেটে গেল। আবার সেদিনকার মত সুনির্মল নির্মেঘ আকাশ। ৭'১০ মিনিটে পালাম্‌ বন্দর থেকে তাসখন্দ অভিমুখে বিমানটি যাত্রা করল। সেদিন শিব-চতুর্দশীর পরের দিন, অর্থাৎ অমাবস্যা, শনিবার—হয়তো বারবেলাও ছিল। এমনি দিনে ভারতের মাটি ত্যাগ করলাম।

কাশ্মীরের উপর দিয়ে হিমালয়ের তুষার-শৃঙ্গ অতিক্রম করে 'এরোফ্লাট' বিমান প্রথমতঃ চীন দেশের সীমানায় প্রবেশ করে, তারপর মধ্য এসিয়ার উপর দিয়ে পূর্বদিকে গিয়ে সোভিয়েত দেশের সীমানার মধ্যে পৌঁছোয়; পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের উপর দিয়ে যে সোজা পথ আছে, তা পরিত্যাগ করে যায়। আমার পাশেই যে রুশ যাত্রীটি বসেছিলেন, তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে জাকার্তায় এসে এই বিমানটি ধরেছেন, তিনি ইংরেজি বল্‌তে পারেন। আমাকে একটি মানচিত্র ধরে আমাদের 'এরোফ্লোট' বিমানের যাত্রাপথটি বুঝিয়ে দিলেন।

কিছুদূর গিয়েই নীচের দিকে তাকিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেল। আকাশের প্রান্ত পর্যন্ত যতদূর চোখ যায়, কেবল অগণিত পর্বতমালার তুষারাচ্ছন্ন শৈলের স্থির তরঙ্গরাশি, প্রভাতসূর্যের আলোকে পৃথিবীর স্বর্ণ-কিরীটের মত শোভমান। এ যেন রূপকথার রাজ্যের আকাশ দিয়ে আমরা নিরুদ্দেশের পথে উড়ে চলেছি। আমি যে আসনটিতে বসেছিলাম, তা' জানালা থেকে দু'টি আসন বাদ দিয়ে একটু দূরে পড়ে গিয়েছিল। জানালার পাশেই একজন রুশ যাত্রী বসেছিলেন, তাঁর আসনটি দেখে তাঁর প্রতি আমার

মনে মনে খুব ঈর্ষা হচ্ছিল। কারণ, বাইরের এই দৃশ্য দেখবার পক্ষে সেই আসনটিই যথার্থ উপযোগী ছিল।

আমাকে বার বার উৎকণ্ঠ হয়ে জানালার দিকে তাকাতে দেখে সেই রুশ যাত্রী ইংরেজি ভাষায় আমাকে জিজ্ঞেস কল্লেন, 'এই পথে তুমি বুঝি আর কোনদিন আস নি।' আমি বল্লাম, 'না এই পথে আপনি আর কোনদিন আসো নি!' এমন ভাবে কথাটা বল্‌লাম যে, পৃথিবীর অন্যান্য পথে আমি সর্বদাই বিমানে ঘুরে বেড়িয়ে থাকি, কেবল এই পথটিই আমার পক্ষে দেখা হয় নি। বিশেষতঃ রুশ বিমান বিভাগ বিমানের 'এরোফ্লেট' হিমালয়ের উপর দিয়ে এই পথটি সম্প্রতি খুলেছে। সুতরাং আমার পক্ষে এই পথ দিয়ে নূতন যাওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। আমার বিদেশী প্রশ্নকর্তাও এই পথে নতুন আসবার জন্য আমাকে বিমান-যাত্রী হিসেবে অর্বাচীন বলে মনে করলেন না।

তবে তিনি যে এই পথে আরও এসেছেন এবং গেছেন, সেকথা তিনি বল্লেন। তিনিও অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে জাকার্তায় এই বিমানটি ধরেছেন।

তিনি একটি আশাতীত সৌজন্য প্রকাশ করে বল্লেন,—আপনি এ'সে আমার আসনটিতে বসুন, আপনার আসনটি আমাকে দিন।

বলেই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর আসনটি ছেড়ে আমায় বসতে বল্লেন। আমি হলে কোন সিংহাসনের বিনিময়েও সেই আসনটি কাউকে ছেড়ে দিতাম না; কারণ, চোখ মেলে যেখান থেকে দেখে রূপকথার রাজ্যে এত সহজে প্রবেশ করা যায়, সেস্থান কাউকে ছেড়ে দেবার মত উদারতা আমার নেই, এ'কথা প্রচার কর্‌তেও আমার কোন লজ্জা নেই। সেজন্য এই অপরিচিত রুশযাত্রীর এই অভাবনীয় উদারতার পরিচয় পেয়ে আমি যেমন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম, তেমনই মনে মনে বিস্ময়ও বোধ করলাম। আমি জানালার পাশে সেই আসনটি দখল করে মন্ত্র মুগ্ধের মত বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গগুলোর উপর দিয়ে বিমান

চলেছে, নীচের দিকে তাকালে শুভ্র তুষারের স্বপ্ন, সূর্যের আলোয় সোনালি মায়া মাখিয়ে রেখেছে। দুই তুষার-শৃঙ্গের মাঝখানে তুষারাচ্ছন্ন উপত্যকা উচ্চ নীচ তুষার-শৃঙ্গের কঠিন তরঙ্গলীলা। এই ভাবে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বিমান চল্‌বার পর, তুষারমুক্ত সমতল ভূমি নীচে দেখতে পাওয়া গেল। বিমান উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দের নিকটবর্তী হলো। সোভিয়েত দেশে এ'খানেই প্রথম ভূমি স্পর্শ কর্‌তে হবে।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় তাসখন্দ বিমান বন্দরে এসে বিমানটি নাম্‌ল। ইতিপূর্বেই যাত্রীদের উদ্দেশে রুশ এবং ইংরেজি ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ডাক্তারী ছাড়পত্র পরীক্ষা করা না হয়, ততক্ষণ কোন যাত্রী যেন তার নিজের আসন ছেড়ে না ওঠেন। বিমান স্থির হয়ে দাঁড়াবার সঙ্গেসঙ্গেই একজন নার্সের পোশাক ধারিণী প্রৌঢ়া মহিলা একটি কাঁচের গ্লাসের মধ্যে কতকগুলো অস্বাভাবিক রকমের বড় 'থার্মোমিটর' নিয়ে আসনস্থ প্রত্যেক যাত্রীর হাতে দিতে লাগলেন, যাত্রীরা তা নিজেরাই বগলের নীচে পুরে চুপ করে বসে রইল। একজন পুরুষ কর্মচারী প্রত্যেকের ডাক্তারি ছাড়পত্রগুলো একে একে পরীক্ষা করে যেতে লাগ্‌লেন।

'থার্মোমিটর' বিতরণ এবং ছাড়পত্র পরীক্ষার পর প্রত্যেক যাত্রীর কাছ থেকে 'থার্মোমিটর'গুলো একে একে ফিরিয়ে নেওয়ার কাজ আরম্ভ হলো। এক-একজন যাত্রীর হাত থেকে যন্ত্রটি ফিরিয়ে নেবার সময় উক্ত পুরুষ কর্মচারীটি (সম্ভবতঃ ডাক্তার) তা খুব নিবিষ্ট ভাবে দেখে নিতে লাগ্‌লেন। দেখেশুনে আমার আপনা থেকেই জ্বর এ'ল বলে মনে হলো। ভাবলাম, এইবার বিমান থেকে নামিয়ে হয় আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে, নয়তো, হিমালয় ডিঙ্গিয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে পাঠাবে। ভয়ে ভয়ে আমার 'থার্মোমিটর'টি সংগ্রহকারীর হাতে দিলাম। তিনি খুব নিবিষ্ট হয়ে তা কিছুক্ষণ ধরে দেখে তার কাঁচের গ্লাসের মধ্যে তা' পূরে নিলেন। ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছেড়ে গেল।

এই ভাবে ডাক্তারী পরীক্ষা যখন সবারই শেষ হলো, তখন 'মাইকে' ঘোষণা করা হলো যে যাত্রীদের এখন বিমান থেকে নেমে নিকটবর্তী কাস্টম্‌স্ চেক্ অফিসে গিয়ে Customs declaration লিখে দিতে হবে। একে একে সব যাত্রী এবার বিমান থেকে নাম্‌তে লাগ্‌ল। আমিও নেমে পড়লাম। রোদ উঠেছে, কিন্তু রোদের সে তেজ নেই। মাটিতে কোথাও বরফের লেশমাত্র নেই। কিন্তু গাছের পাতাগুলো সব ঝরা; মনে হলো, কিছুদিন আগে তুষার পাতের ফলে সব পাতা ঝরে পড়েছে। বসন্তের নোতুন পাতার আবির্ভাবের জন্য এখনো তাদের তপস্যা শেষ হয় নি। বিস্তৃত বিমান ক্ষেত্র জুড়ে নানা জায়গায় ফুলের গাছ; এখন ফুল ত নেই-ই, পাতাও নেই; একজন মজুর শ্রেণীর লোক কোদাল দিয়ে গাছের গোড়াগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে দিচ্ছে।

বিমান থেকে নেমে একটু সামনেই দুই সারি নিষ্পত্র ফুল গাছ। তার মধ্য দিয়ে কাঁকর ঢালা পথ; কাস্টম্‌সের ছাড়পত্র নেবার আপিসটি সেই পথ বেয়ে গেলে একটু সামনেই। বিরাট কক্ষ, সুন্দর ঝাড় লণ্ঠন ও অন্যান্য প্রাচ্য কারুকার্য বিশিষ্ট চিত্র ও আসবাবে সুসজ্জিত, সমগ্র পরিচ্ছন্ন পরিবেশটি কাস্টম্‌সের অপ্রীতিকর ব্যাপারটিকে অনেকখানি ভুলিয়ে রাখবার মত। এক-একজন করে যাত্রী নির্দিষ্ট 'ফরম্' পূরণ করে দিতে লাগল। বাক্স-পেট্‌রা খোলাখুলি করে যে কিছু দেখা হলো, তা নয়। রুশ ও ইংরেজি ভাষায়ই 'ফরম্' পাওয়া যায়; ইংরেজি ভাষায় ফরমটি পূর্ণ করে যখন কর্মচারীর হাতে দিলাম, তখন তিনি দোতালার ভোজ-গৃহে গিয়ে প্রাতরাশ করবার অনুরোধ কর্‌লেন। প্রাতরাশ একবার বিমানেই হয়েছিল। সুতরাং প্রাতরাশ কথাটির ঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না।

তবু কার্পেট মোড়া সুন্দর সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে গিয়ে দেখলাম এক সুসজ্জিত বিরাট ভোজ-গৃহ। ইতিমধ্যে অনেক যাত্রীই ভোজে বসে গিয়েছেন। ভোজ-গৃহের সাজসজ্জা ও আসবাব-

উপকরণ দেখে বিস্মিত হলাম। উপরে ছোট-বড় নানারকম ঝাড় লণ্ঠন, দেয়ালের গায়ে বড় বড় তৈলচিত্র, আসবাব-উপকরণের পরিচ্ছন্নতা, সুবেশা ও স্বাস্থ্যবতী পরিবেষণকারিণীর দল সহজেই মনকে প্রসন্ন করে দেয়। পাশ্চাত্ত্য জগতের বিলাস ও ভোগের রূপ প্রথম এই প্রত্যক্ষ করলাম।

একটি টেবিলে বসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গেই একজন মহিলা একটি বেশ বড় প্লেটে এক প্লেট 'সুপ' পরিবেষণ করে গেলো। 'সুপে'র মধ্যে একটি বিরাট মাংসের টুক্‌রো। মাংসের টুক্‌রোটির দিকে তাকিয়ে আমার একটু সন্দেহ হলো। এ-ত আমাদের পরিচিত পাঁঠা, খাসি, ভেড়া বলে মনে হচ্ছে না, হরিণ-ময়ূরের মাংসও খেয়েছি, তাও এ নয়। সহজেই বুঝতে পারলাম, এ' গো-মাংস। প্লেটটি সামনে করে চুপ করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর পরিবেষণকারিণী এসে রুশ ভাষায় আমাকে কি বল্লেন। আমি একটি মাত্র রুশ বাক্য শিখেছিলাম, 'ইয়ান গভরিউ প-রুস্‌কি' অর্থাৎ আমি রুশ ভাষা জানিনে; তার কথা বুঝতে না পেরে তাই বলে চুপ করে রইলাম। তিনি ধীরে ধীরে প্লেটটি তুলে নিয়ে গেলেন। তারপর আর এক প্লেট চপ্ জাতীয় জিনিস ও কিছু কাঁচা শাকশব্জী রেখে গেলেন। জিনিসটি চপ জাতীয়, কিন্তু চপের আকার থেকে অনেক বড়, চামচ দিয়ে কেটে দেখা গেল, মাংসের চপ; কিন্তু এই মাংসও সেই মাংস। সুতরাং আবার চুপ করে বসে থাকা ভিন্ন কোন উপায় রইল না। অন্যান্য যাত্রীরা নিজেদের সঙ্গী-সঙ্গিনীদের নিয়ে বসে মুখে কলরব এবং কাঁটা চামচে খট্ খট্ শব্দ করে পরম পরিতোষের সঙ্গে আহারে মত্ত হয়েছে। আর আমি সঙ্গীহীন যাত্রী, ভাষা-হীন বিদেশী, নিষিদ্ধ খাদ্যের থালা সাম্‌নে নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। চারদিকের গৃহ-সজ্জা আমার চোখের ক্ষুধা মেটাতে লাগল মাত্র। ভাবলাম, এই ভাবে কি বিদেশে এসে না খেয়ে প্রাণ দিতে হবে?

এমন সময় পরিবেষণকারিণী আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমার

দ্বিখণ্ডিত এবং অভুক্ত চপ্‌টির দিকে তাকিয়ে কি বল্‌লেন। আমাকে নিরুত্তর দেখে প্লেটটি তুলে নিয়ে চলে গেলেন। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই কিছু কেক্ স্যানডুইচ ও কমলালেবু এবং আতা জাতীয় কয়েকটা কি ফল সামনে রেখে গেলেন। তৃপ্তির সঙ্গে তা আহার করলাম।

তারপর তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, চা না কফি? রুশ ভাষায় শব্দ দুটি একই, সুতরাং আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না। কিন্তু আমি এই দুয়ের কারুরই ভক্ত নই। তবু একটা বল্‌তে হবে—না বল্‌লে এক্ষেত্রে মান থাকে না। গম্ভীর ভাবে বল্‌লাম কফি।

শুনেছি, কফির আভিজাত্য, চায়ের চাইতে বেশি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কফি পরিবেষণ করা হলো।

সুন্দর সুসজ্জিত ভোজ-কক্ষটি থেকে উঠতে ইচ্ছে কচ্ছিল না, কোন যাত্রীই প্রায় উঠ্‌ছে না। সবাই গল্পগুজবে ও ধূমপানে মত্ত। আমিও অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে কফি পান করলাম। তারপর কক্ষ যখন প্রায় জনশূন্য হতে আরম্ভ করল, তখন নীচে নেমে গেলাম। বিমান ছাড়বার আরও আধ ঘণ্টা কাল বাকি।

বিমান থেকে নামবার সময় আমাদের পাশপোর্টগুলো একব্যক্তি নিয়ে গিয়েছিলেন। মাইকে কাস্টম্‌স চেক আপিস থেকে পাশপোর্টগুলো ফিরিয়ে নেবার জন্য ঘোষণা করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্টারের কাছে এক লম্বা 'লাইন' হয়ে গেল। কোলকাতা শহরে আমি কোনদিন 'লাইনে'র অভ্যাস করি নি; সুতরাং 'লাইনে' দাঁড়ানোটা ঠিক আমার ধাতস্থ হতে পারে নি।' আমি নির্বিকার চিত্তে 'লাইন' থেকে দূরে বেড়াতে লাগলাম। ভাবলাম, সবার শেষ হয়ে যাক, তারপরই না হয় আমি আমার পাশপোর্ট নেব, তাড়া কিসের? তবু 'লাইনে' দাঁড়াতে পারব না।

এমন সময় শুন্‌তে পেলাম, 'মাইকে' আমাকেই প্রথম আহ্বান করা হচ্ছে। শুনে আমি কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। যে

কর্মচারী পাশপোর্ট বিতরণ কচ্ছিলেন, তিনি সহাস্যে আমার দিকে অভিবাদনের ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 'প্রফেসার ?'

আমি বল্লাম, হ্যাঁ।

বলা মাত্র তিনি পাশপোর্টটি আমার হাতে দিয়ে আর একবার অভিবাদন করলেন। লাইনসুদ্ধ বিদেশী যাত্রী ও যাত্রিণী আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আগেই শুনেছিলাম, সোভিয়েত দেশে 'প্রফেসারে'র বড় সম্মান। পরে তার আরও পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু এই তার প্রথম প্রমাণ পেলাম; আমার পাশপোর্ট-ভিসায় আমার বৃত্তিরূপে 'প্রফেসার' কথাটি লেখা ছিল, তাই দেখেই তিনি আমাকে এই বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে সম্মান দেখালেন। আমি সমস্ত বিমান সুদ্ধ যাত্রীর ঈর্ষার পাত্র হলাম।

প্রায় ১ টার সময় Aeroflot বিমান তাসখন্দ বিমান বন্দর থেকে মস্কোর দিকে যাত্রা করল। এবার অনেক উঁচু দিয়ে বিমান চল্‌তে লাগল, নীচের দিকে তাকিয়ে আর কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। অনেক যাত্রীই পানাহার করবার ফলে আসনের মধ্যে বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু আমার কিছুতেই ঘুম এলো না। কারণ, আমি আহারই করেছিলাম, কিছু পান করিনি; তারপর ভাবলাম, পোড়া চোখে কত ঘুমই ত ঘুমিয়েছি, আজ যখন ত্রিশ হাজার ফুট উপরে সোভিয়েত দেশের আকাশ দিয়ে ছুটে চলেছি, তখন না হয় কয়েক ঘণ্টার পথ না ঘুমিয়েই সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে তার শিহরণটুকু উপভোগ করি, কয়েক ঘণ্টা সময় বইত নয়। শুনেছি সাড়ে তিনটের সময়ই মস্কো বিমানবন্দরে পৌঁছানো যাবে। আমি সারাক্ষণ জেগে থেকেই যা দেখা যায় না, নীচে তাই লক্ষ্য করে বসে রইলাম। যদি দৈবাৎ একটা কিছু চোখে পড়ে তবে তার দাম কে দিতে পারবে!

এইভাবে কতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম জানিনে, হঠাৎ দেখতে পেলাম যাত্রীরা একটু চঞ্চল হয়েছে।

আমার পাশের যাত্রীটি ইংরেজিতে আমাকে বললেন, আমরা মস্কোর কাছে এসেছি, এখনই বিমান নামতে সুরু করবে।

ক্রমে বিমান নীচে নাম্‌তে আরম্ভ করল ; কিছু কিছু করে দেখ্‌তে পাওয়া গেল, সাদা থান পরে সারা পৃথিবী যেন চুপ করে ঘুমিয়ে আছে, চারিদিকে সাদা ছাড়া আর কিছুই এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আমি তখনও বুঝে উঠ্‌তে পারিনি, এত সাদা কিসের। বিমান যখন আরও নীচে নেমে এল, তখন মস্কো শহরের বাড়ী-সাদার মধ্যে মধ্যে কালির দাগের মত ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ঘরগুলো সেই তারপর আরও দেখা গেল, নিষ্পত্র বৃক্ষের সারি ; দেখ্‌তে দেখ্‌তে মস্কো বিমানবন্দরে বিমানখানি অবতরণ করল। তখন দেখা গেল, এই সাদা আর কিছু নয়, বরফের স্তর ; বিমান বন্দরের চারিদিকেই বরফের আচ্ছাদন, কেবলমাত্র যে অপরিসর পথ ধরে বিমানটি মাটিতে নেমে এল, তার উপর থেকে বরফ সরিয়ে দিয়ে দু' ধারে স্তূপ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। বিমানের মাইকে ঘোষণা করা হলো মস্কোতে তখন তাপ মাত্র শূন্য ডিগ্রির ১২ সেন্টিগ্রেট্ নীচে।

যাত্রীরা পোশাক-পরিচ্ছদ ও টুপী পরে নামবার জন্য তৈরী হতে লাগ্‌ল। আমি আমার ওভারকোট্‌টি খোঁজবার জন্য সাম্‌নের দিকে গেলাম, গিয়ে এক রাশি ওভারকোটের মধ্য থেকে আমার ওভারকোটটি অতি কষ্টে খুঁজে বার করলাম। সবাই মাথায় এঁটে টুপী পর্‌ছে, কেউ বা তার দু'পাশ খুলে দিয়ে কান দু'টোও ঢেকে নিচ্ছে। আমি তেমন টুপী ভারতবর্ষ থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি নি, ভেবেছিলুম মস্কো গিয়েই কিনে নেব ; কিন্তু মস্কো বিমান বন্দর থেকে শহরে যে কি ভাবে পৌঁছুব, তা আগে বুঝ্‌তে পারিনি। আমার এক বন্ধু তাঁর 'বাঁদর টুপী' বা monkey Capটি আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন, অগত্যা তাই পরে বিমান থেকে নামবার জন্য পা বাড়ালাম।

দেখলাম, আমার আগে এখনও পর্যন্ত আর কেউ নামে নি'।

বিমানের নিকটেই কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কোন কোন অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি ভাবলাম, এ'দের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ আমাকে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য এসেছেন। কারণ, দিল্লী থেকে আসবার সময় Indian Council for Cultural Relations-এর আপিস থেকে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে আমার মস্কো যাত্রার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকতে পারে, যদি দৈবাৎ না থাকে, তবে আমি সেখান থেকেই যেন ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করি। দিল্লীর রুশ দূতাবাস থেকেও যখন আমাকে ভিসা দেওয়া হয়, তখন সেখানকার একজন পদস্থ কর্মচারীও আমাকে জানিয়েছিলেন যে, আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মস্কো বিমান বন্দরে লোক থাকবে, আমার কোনই অসুবিধা হবে না। কিন্তু তবু আমার একটা আশঙ্কা ছিল; শনিবার ভোরবেলায় যে আমি মস্কো রওয়ানা হব, তা মাত্র আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থির হয়েছিল, তাও চূড়ান্তভাবে নয়; কারণ, শুক্রবার সন্ধ্যায় যখন আমার হাতে বিমান-যাত্রার টিকিটটি তুলে দেওয়া হয়, তখনও আমাকে বলা হ'লো আমি টিকিট পেলাম বটে, কিন্তু আমি সিট (seat) পাবই কিনা তা তখনও স্থির (confirmed) হয় নি। সুতরাং এত অল্প সময়ে তারা কি করে খবর পেতে পারে? তবু আমি প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলাম।

কিন্তু শেষ ধাপ পর্যন্ত নামা সত্ত্বেও কেউ আমাকে কোন রকম অভ্যর্থনা জানাতে অগ্রসর হয়ে এলোনা; আমি বড় বিপন্ন বোধ করতে লাগলাম। তারপর বিমান থেকে মাটি অর্থাৎ বরফের উপর পা দিতেই নূতন জুতোয় পা পিছলে গিয়ে একেবারে ধরাশায়ী অর্থাৎ তুষার শয্যাশায়ী হয়ে পড়বার উপক্রম হলো। কোন রকমে টাল সামলে নিলাম; কিন্তু ভাবনা হোল, কাউকে যে দেখতে

পাচ্ছিনে, এখন আমার উপায় কি হবে! তাপমান শূন্য ডিগ্রীর নীচে নামলে যে কি অবস্থা হয়, তা আগে আমার কোনদিন জানা ছিল না, তাও আবার বার ডিগ্রী নীচে! বিমানের বাইরে মুখ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখটা এক বরফের দেয়ালের গায়ে লেগে থেঁৎলে গেল বলে মনে হলো। কিন্তু সর্বাঙ্গ খুব সুরক্ষিত বলে মনে হলো ; এমন কি, monkey cap পরা মাথাটাতেও ঠাণ্ডা খুব একটা লাগছে বলে বোধ হল না।

আমি বরফের উপর দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। এমন সময় বিমান বিভাগেরই একটি গাড়ী এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল, যাত্রীরা তা'তে উঠ্‌তে লাগল, আমিও তা'তে উঠে পড়ে আপাততঃ শীতের প্রকোপ থেকে খানিকটা আত্মরক্ষা করলাম। গাড়ী একটু দূরেই Customs clearance office এর সামনে এনে আমাদের নামিয়ে দিল। কাঁচ দিয়ে চারদিক আঁটা ঘরটির মধ্যে ঢুকে বেশ আরাম বোধ করতে লাগলাম। Customs-এর ছাড়পত্র তৎক্ষণাৎই পাওয়া গেল।

এমন সময় একজন ভদ্রমহিলা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি প্রোফেসার ভট্টাচার্য কি না। ভট্টাচার্য শব্দটির উচ্চারণ আমি আন্দাজ করে নিলাম। আমি অকূলে কূল পেলাম। সন্ধ্যা আসন্ন হচ্ছিল, বন্ধু-বান্ধব ও ভাষাজ্ঞানহীন দূর প্রবাসে সেই তুষারাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় নিরাশ্রিত হয়ে পড়বার আশঙ্কায় আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছিল। এতক্ষণ পর যেন স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারলাম। আমি তাঁকে ইংরেজিতে নিজের পরিচয় দিলাম ; তিনি ইংরেজি জানেন, ইংরেজিতেই বললেন, Ministry of Higher Education-এর পক্ষ থেকে আমাকে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য তিনি গাড়ী নিয়ে বিমান-বন্দরে উপস্থিত হয়েছেন। আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আমাকে গাড়ীতে উঠতে বল্‌লেন।

সোভিয়েত দেশে 'কুলি' (porter) বলে বিমান-বন্দরেই হোক

কিংবা রেল-স্টেশনেই হোক, কোথাও কোন সম্প্রদায় নেই, নিজের মোট নিজেই বইতে হয়, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সে কাজ করে। আমার সঙ্গে একটি বিরাট সুটকেস ছিল, কাস্টমস থেকে মুক্ত হয়ে তা' কাস্টমস্ ক্লিয়ারেন্সের ঘরেই পড়েছিল। যখন ভদ্রমহিলা আমাকে গাড়ীতে উঠতে বললেন, তখন আমি কাতরভাবে আমার সেই সুট্‌কেসটির দিকে তাকালাম, আমার একার তা গাড়ীতে তোলবার সাধ্য নেই। আমার অক্ষমতার কথা বুঝতে পেরে আমার অভ্যর্থনা-কারিণী মহিলা তার দিকে নিজেই এগিয়ে গিয়ে তা' ধরে তুল্‌তে গেলেন, আমি তাঁকে বাধা দিয়ে একজন নারীর কাছে নিজের পৌরুষের মর্যাদা রক্ষা করতে অগ্রসর হয়ে গেলাম।

আমি আমার প্রাণপণ শক্তিতে সুট্‌কেসের হ্যাণ্ডেল ধরে তুলতে গেলাম, তিনি নিজে সরে দাঁড়ালেন না, নিজেও হাতে ধরলেন এবং প্রকৃতপক্ষে দু'জনেই টেনে নিয়ে তা গাড়ীতে তুললাম। বিরাট গাড়ীটিতে একজন পুরুষ ড্রাইভার এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, আমরা গাড়ীতে উঠবা মাত্র, তিনি গাড়ী ছেড়ে দিলেন। তুষাররাশির উপর দিয়ে বিমান বন্দরের এলাকা অতিক্রম করে গাড়ী গিয়ে বাইরের বাঁধান পথে পড়ল।

পথের দুই ধারে যতদূর দেখা যায়, কেবল তুষার ছাড়া আর কিছুই নেই, পথের দুই ধারে পাইন ও বার্জ গাছগুলো নিষ্পত্র, যেন বজ্রাহতের মত আড়ষ্ট হয়ে আছে। বনভূমিও তুষারে আচ্ছন্ন ; সমস্ত দেশ যেন এক বিধবার বেশ ধারণ করেছে। বিমান-বন্দর থেকে মস্কো শহর প্রায় পনের মাইল দূরে। ততক্ষণে সূর্যাস্ত হয়েছে ; কিন্তু তার আলো তখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। তবে শীতের সন্ধ্যা বলে সেই আলোতে কোন দীপ্তি নেই, কেমন যেন মলিন।

আমাকে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য যে ভদ্রমহিলা বিমান বন্দরে এসেছিলেন, তার নাম কুমারী শেস্তাকোভা রীমা। তিনি ইংরেজি এবং ফরাসী ভাষার শিক্ষয়িত্রী ; মস্কোতেই থাকেন। বয়স ত্রিশ বছরের বেশি হবে না।

তিনি গাড়ীতে বসেই বল্লেন, আপনার সত্যকার অভ্যর্থনা আজ হলো না; কারণ, আজ শনিবার বলে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের আপিস দু'টোর সময় ছুটি হয়ে গেছে, যাঁদের আপনাকে বিমানবন্দরে এসে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার কথা, তাঁরা আপিস ছুটির পর বেরিয়ে গেছেন; সুতরাং আজ আর কাল রবিবার দিনটা আপনাকে একটু কষ্ট করে থাকতে হবে সোমবার আপিস খোলবার পর আপনাকে যথার্থ অভ্যর্থনা করা হবে।

আমি বল্লাম, অভ্যর্থনার আর বাকি কি রইল, আপনি ত গাড়ী নিয়ে বিমান-বন্দরে এসে আমায় আশ্রয়স্থলে নিয়ে যাচ্ছেন, তার উপর আর অভ্যর্থনার কি প্রয়োজন!

রীমা বল্লেন, যথাযোগ্য ব্যক্তি এসে আপনাকে অভ্যর্থনা কর্‌বেন, আমি ত তাদের কেউ নই। তার উপর আর কিছু না বলে আমি চুপ করে রইলাম।

পথের দু'ধারে বরফে আচ্ছন্ন সমতলক্ষেত্র; কোথাও কোথাও ঝরা পাতা পাইন ও বার্জ গাছের ঘন বন, কোন কোন বার্জ গাছে পাতাও দেখা যাচ্ছে, তবে অধিকাংশই আগুনে পোড়ার মত নিষ্পত্র এবং মসীবর্ণ। বরফের মধ্যে মধ্যে দু'একটি কাঠের ঘর চোখে পড়ল, দু'একটি লোক বরফের উপর দিয়েই একটি সরু পায়ে চলার পথ করে নিল; মনে হল যেন, দিনের কাজের শেষে নিজেদের ঘরের দিকে ফিরছে।

ক্রমে মস্কো শহর নিকটবর্তী হতে লাগল। দু'একটি বড় বড় বাড়ী চোখে পড়তে লাগল।

রীমাকে জিজ্ঞেস করলাম, মস্কো আর কতদূর?

তিনি বললেন, এই ত প্রায় এসে পড়েছি।

আমারও মনে হলো কোন একটা খুব বড় শহরে প্রায় এসে প্রবেশ করেছি। রীমা ইংরেজি এবং ফরাসী ভাষার শিক্ষয়িত্রী বলে নিজের পরিচয় দেওয়ায় আমার কেন যেন মনে হল, তিনি জাতিতে হয়ত রুশীয় ন'ন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মাতৃভাষা (mother-tongue) কি ? Mother-tongue কথা তিনি বুঝতে পারলেন না, একটু বিস্ময় প্রকাশ করে ইংরেজিতে বল্লেন, What ? my mother ?

অর্থাৎ তাঁর মা কোন দেশীয়া এ'কথা আমি জিজ্ঞেস করেছি বলে তিনি মনে করেছেন! আমি ছু' তিন বার mother-tongue কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু তাঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না, শেষটায় নিরস্ত হয়ে মনে করলাম, তিনি ইংরেজির শিক্ষয়িত্রী হলেও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ধারা হয়ত এদেশে স্বতন্ত্র ; হয়ত mother-tongue কথাটি তাদের জানা নেই।

তিনি যে রুশ জাতীয়া এ'বিষয়ে আমার আর তখন কোন সংশয় রইল না। তবে তিনি যখন তাঁর নামটি আমাকে বলেছিলেন, তখন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার নামের রীমা কথাটি আরবি। কি সূত্রে যে আরবি কথাটি তার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, তা' আর জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাই নি ; কারণ, ইংরেজির জ্ঞান তাঁর যেমন পরিমিত, আমারও প্রায় তেমনই, সুতরাং এই ভাষায় চুল-চেরা বিশ্লেষণ ছু'জনের পক্ষেই অসম্ভব।

গাড়ী এবার মস্কো শহরের ভিতরে প্রবেশ করেছে, বুঝতে পারলুম। খুব চওড়া রাস্তা, রাস্তার উপরেই যে ঝুঁকে পড়ে বড় বড় বাড়ীগুলো তা নয়, রাস্তার ছু'পাশে বেশ চওড়া ফুটপাত ; তবে বড় রাস্তাগুলো বরফ থেকে মুক্ত করা হয়েছে ; কিন্তু ফুটপাত, ভেতরের রাস্তা এবং পার্ক-বাগান—সবই বরফে আদ্যোপান্ত আচ্ছন্ন, গাছপালা নিষ্পত্র—যেন আড়ষ্ট হয়ে কোন রকমে বরফ-স্তূপের মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এ'গুলো জীবিত কি মৃত বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু শুনেছি, গ্রীষ্মকালে এ'গুলোই ফুলে-পাতায় ভরে ওঠে।

গাড়ী একটি পার্কের পাশে সারি সারি কতকগুলো বিরাট অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ীর ভেতরে বেশ আরামেই

বসেছিলাম, এখন দরজা খোলবামাত্র মনে হলো উত্তর মেরু থেকে বরফের কণা বয়ে নিয়ে আসা এক দমকা হাওয়া আমার শ্বাস বন্ধ করে দেবার উপক্রম করেছে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়ে পথের পাশের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। কোন কোন দোকানঘরে ও সামনেও আলো জ্বল উঠ্ছে। অতএব তাপমাত্রা ততক্ষণে আরও অনেক নীচের দিকে চলে গেছে। যেখানে নামতে হলো, সেটা একটা আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস।

রীমা বারবার নিতান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বলতে লাগলেন—সোমবার সকাল পর্যন্ত একটু কষ্ট করে আপনাকে এখানে থাক্তে হবে, সোমবার দুপুরেই আপনার অভ্যর্থনা হবে, তখন আপনার যথাযথ সমাদর হবে।

এখানে থাকলে সোভিয়েত দেশের একটা আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস দেখবারও একটি সুযোগ পাব বলে আমি মনে মনে যতই উৎফুল্ল, রীমা ততই সঙ্কোচ প্রকাশ করতে লাগলেন। তখন আমারও আশঙ্কা হলো, এখানে না-জানি আমার কত কষ্টই হবে।

তবু খুব সাহস করে বার বার বলতে লাগলাম, না আমার কোনই অসুবিধা হবে না।

রীমা আমার সুট্‌কেসটা ধরে নামাতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম, তারপর গাড়ী থেকে নেমে দু'জনে সুটকেসটাকে টেনে বরফের উপর দিয়ে খানিকটা গিয়ে দরজা ঠেলে হোস্টেলের ভিতরে ঢুকলাম। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকাও গায়ে বিশেষ শক্তি থাকার প্রয়োজন। তাও দরজা একটা নয়, পরপর দুটো, যাকে double door বলে। ভিতরে ঢুকতেই শীতের কন্‌কনে হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল। এইটুকুন সময়ের মধ্যেই আমার মনে হলো যেন আমার মাথার ভিতরটা শীতে জমাট হয়ে গেছে। যে টুপী আমার মাথায় ছিল, তা এদেশের শীতের কাছে

নিতান্ত তুচ্ছ। তাই এখান থেকে এইদেশীয় টুপী কিনে মাথায় না পরা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

ছাত্রাবাসের ভিতর ঢুকে সামনেই সোফায় চেয়ারে টেবিলে সুসজ্জিত বসবার জায়গা; টবের মধ্যে কয়েকটা সপত্র পাম গাছ, শীতের মধ্যে এ'দেশে এ' দৃশ্য বড় সহজে দেখা যায় না; কয়েকটা বড় বড় ছবিও দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো। কয়েকটি আফ্রিকাবাসী ছাত্র সেখানে বসে খবরের কাগজ পড়ছে; আমি গিয়ে একটি আসনে বসে পড়লাম। রীমা কার কাছে যেন টেলিফোন করলেন, রুশ ভাষায় অনেকক্ষণ ধরে কি আলাপ হলো। আমি বুঝতে পারলাম, আমারই বিষয় নিয়েই একটা কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে। তারপর টেলিফোন ছেড়ে হোস্টেলের কর্ত্রীর কাছে গিয়ে আমার পাশপোর্ট দেখিয়ে খাতাপত্রে কি যেন নাম ধাম লেখালেন।

আমাদের দেশের হোস্টেলগুলোতে যেমন চানাচুর-ওয়ালা থেকে আরম্ভ করে কাবলিওয়ালা পর্যন্ত অবাধে যাতায়াত করে, সেখানে তার উপায় নেই, বুঝতে পারলাম। ছুটো দরজা ঠেলে প্রত্যেক হোস্টেলেরই ভিতরে ঢুক্‌লেই দেখতে পাওয়া যায় যে এক গম্ভীর-মূর্তি প্রৌঢ়া মহিলা তার রক্ষয়িত্রী রূপে সেখানেই একটি কাউণ্টারের মত জায়গায় বসে আছেন; দিন-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই একজন-না-একজন ঐ আসনে বসে থাকবেন। যে ভিতরে ঢুকবে তার যথারীতি পরিচয়পত্র সেখানে না দেখিয়ে এবং তার সেখানে আসবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করতে না পারলে তার প্রবেশের অনুমতি জুটবে না—রুশ এবং বিদেশী সকল ছাত্রের পক্ষেই এই একই নিয়ম।

রীমা তার কাছে গিয়ে আমার বিষয়ে কি সব জানালেন, তারপর তাঁর কাছ থেকে একটি চাবি নিয়ে তিনি বললেন, চলুন আপনার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

তিনি আবার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বল্লেন, কিছু মনে করবেন না, আজ শনিবার অর্ধেক দিন আপিস বলে আনুষ্ঠানিক ভাবে আপনার

অভ্যর্থনা হলো না, তাই এখানেই রোববার দুপুর পর্যন্ত আপনাকে কষ্ট করে থাকতে হবে। সোমবার আপনার অভ্যর্থনা হবে। চলুন, আপনার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করবেন।

আবার সেই স্যুটকেসটাকে দু'জনে ধরে নিয়ে চল্‌লাম ; হোস্টেলে কোন ভৃত্য নেই, এসব কাজ সকলকে নিজেদেরই করতে হয়। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে দেখলাম একটি বেশ সুসজ্জিত বড় ঘর আমার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ঘরটি খালিই ছিল, স্প্রীং-এর খাটের উপর গদি দেওয়া বিছানায় সুন্দর ধবধবে চাদর, বালিশ, লেপ—কিছুরই অভাব নেই। ঘরে একটি রেডিও সেট। কৃত্রিম উপায়ে ঘরটি গরম রাখবার ব্যবস্থা ছিল বলে ভিতরে ঢুকবামাত্রই একটু মৃদু উত্তাপ অনুভব করলাম, বেশ আরামবোধ হলো। ঘরের ভিতরে আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, লিখবার টেবিল, টিপয়, কাঠের মেঝের উপর আগাগোড়া কার্পেট মোড়া। পূবদিকে বিরাট কাঁচ আঁটা জানালা, জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকালে দেখা যায়, দূরে আর একটা হোস্টেলের মাঝখানে যে খোলা জায়গাটুকু ছিল, তা আগাগোড়া বরফে আচ্ছন্ন। বরফে ঢাকা পথের ধারে দু'একটি আলো জ্বলছে।

রীমা বল্লেন, এবার আমি যাব। আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না। একেবারে সোমবার দশটার সময় আমি আসব। এগারটায় সময় Ministry of Higher Education-এর কোন পদস্থ কর্মচারী এসে আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা করবেন। আপনার আজ রাত ও কালকের খাবার জন্য এই রুবল কয়টি দিয়ে যাচ্ছি, সোমবার দিন খরচের বাকী টাকা সব দেওয়া হবে বলে পাঁচ রুবলের একটি নোট তাঁর ভেনিটি ব্যাগ খুলে আমার হাতে গুঁজে দিলেন।

আমার সঙ্গে পালাম বিমানবন্দর থেকে ৪২৲ টাকার বিনিময়ে তিনটি পাউণ্ড মাত্র আনতে দিয়েছিল। পাউণ্ডগুলো ভাঙ্গানো হয়নি। সুতরাং আমার অর্থের আবশ্যক। তাই বিবেচনা করে

তিনি তাঁর নিজের কাছ থেকেই এই পাঁচ রুবল আমাকে দিলেন। কি জানি কোন্ কাজে লাগে বিচার করে আমি তাঁর কাছ থেকে হাত পেতে নিলাম।

রুবল! ছেলেবেলায় তলস্তয়ের গল্প পড়্তে খুব ভাল লাগত। তার একটি ইংরেজি অনুবাদ কি ভাবে আমার হাতে পড়েছিল, তা পড়ে পড়ে একেবারে সেদিন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এত ভালও লাগত গল্পগুলো! তখন কে জানত, সেই তলস্তয়ের দেশে, সেই রুবল-ভড্কার রাজ্যে একদিন আসবার সুযোগ পাব। হাতের মুঠোতে করে রুবল নিয়ে নিজে বাজার খরচ করব। সেই রুবল সত্যই আজ আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। ভেবে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শিহরণ অনুভব করলাম।

রীমা অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন। আমি চুপ করে সেখানে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে যে ধবধবে সাদা বরফের স্তূপগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর দিকে অনিমেষে তাকিয়ে রইলাম। বরফের উপরে দিয়ে কচিৎ এক-আধজন লোক সেখান দিয়ে চলে যাচ্ছে, তারা যেন সেই আমার ছেলেবেলাকার তলস্তয়ের গল্পের লোকগুলো—মাথায় কান ঢাকা টুপী, গায়ে দীর্ঘ ওভারকোট, পায়ে লম্বা বুট, গলায় শতপাকে জড়ানো গলাবন্ধ।

এবারে কিছু কিছু ক্ষুধা অনুভব করতে লাগলাম। তাসখন্দে খাবার পরও বিমানে মধ্যাহ্নভোজ হয়েছিল, তার ক্রিয়া এতক্ষণ ধরে চল্‌ছিল; কিন্তু এবারে মনে হলো, কিছু খাওয়া দরকার। চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করে নীচের সেই বসবার জায়গায় চলে এলাম।

সেখানে দুটি অল্পবয়সী ছেলে গল্পগুজব কচ্ছে, তাদের ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কোন্ দেশ থেকে এসেছ?

তারা ইংরেজিতেই বল্লে, আমরা ব্রহ্মদেশ থেকে এসেছি!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি বৌদ্ধ?

তারা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আবার তাই জিজ্ঞেস করলাম; তারা বল্লে, কি জানি আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি না!

ইতিমধ্যে আফ্রিকার দু'টি কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র সেখানে এসে উপস্থিত হলো। আমি তাদেরে ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা ইংরেজি বলতে পার?

তারা বল্লে, পারি! বলে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি এবং একজন প্রফেসার একথা শুনে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, আমরা দু'জনই ঘানা থেকে এসেছি ডাক্তারি পড়বার জন্যে।

ঘানায় আমার একটি পুরানো ছাত্র অশোক ঘোষ ডাক্তারি কর্‌ত। তার কথা জিজ্ঞেস করা মাত্রই তারা তাকে চিনতে পারল; যখন শুনতে পেল যে ঘোষ আমার ছাত্র, তখন তাদের আমার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল বুঝতে পারলুম। তারা অত্যন্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনার এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে না ত!

আমি বল্লাম—দেখ, এখনও আমার রাত্রের খাওয়া হয়নি; কোথায় খাওয়া যাবে বলতে পার?

তারা ঘড়ি দেখে বল্‌ল, 'তাইত, এখন ত বড় দেরী হয়ে গেছে, রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। দেখা যাক এখনও 'বুফেতে কিছু পাওয়া যায় কিনা!

বলে তারা দু'জনেই ছুটে চলল, আমিও তাদের পিছু কিছু যেতে লাগলাম।

আমাদের দেশে হোস্টেলের মধ্যেই যেমন ছাত্রদের খাবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে গেস্ট চার্জ দিয়ে ছাত্রের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবও খেতে পারে—যার ম্যানেজার হবার জন্য ছাত্রেরা লালায়িত হয়ে থাকে—সেদেশে তা নেই। সেখানে হোস্টেলের মধ্যে কয়েকটা ঘর আছে, তাতে কতকগুলো electric heater জ্বলতে থাকে। কিংবা সুইচ টিপে জ্বালিয়ে নেওয়া যায়, তার বেশি আর কিছু নেই। ছাত্রেরা যে-যেখানে পড়তে যায়, সেখানকার রেস্তোরাঁতে দ্বিপ্রহরের

খাবার খায়। রাত্রে হোস্টেলের বাইরে নিকটেই যে রেস্তোরাঁ থাকে, তাতে রাত্রের খাবার খেয়ে আসে। এখানকার প্রত্যেক হোস্টেলের মধ্যেই একটা 'বুফে' আছে। সেগুলোকে ছোটো খাটো 'স্টোর' বা খাবারের দোকান বলা যায়। মোটামুটি রুটি, মাখন, সেদ্ধ ডিম, চিপ, দুধ, দই, এসব সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয়, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বন্ধ হয়ে যায়। তখন রাত্রি ১০ টা বাজবার মাত্র ১০ মিনিট বাকি, ১০ টায় 'বুফে' বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ১০ মিনিট বাকি, ১০ টার মধ্যে কিছু কেনা কাটা করতে না পারলে সারারাত অভুক্ত থাকতে হবে। বাইরের কোন রেস্তোরাঁও এখন আর খোলা নেই। এদিকে আমার ক্ষুধা ক্রমেই বাড়ছিল।

'বুফে'তে গিয়ে ত চক্ষুস্থির! দেখি এক লম্বা 'লাইন'। ইতিমধ্যেই ঘানার ছাত্রটি আমার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অবস্থাটা দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। আর একটি যে ছাত্র ছিল, সে চুপ করে আমার পাশে দাঁড়িয়ে 'লাইনের' মধ্যে তার সঙ্গীর অগ্রগতি লক্ষ্য করছিল।

সে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌ল, যাক্, কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবে।

হঠাৎ আমার মনে হলো, যে-ছেলেটি লাইনে দাঁড়িয়েছে, তার হাতে ত আমার কিছু রুবল দেওয়া দরকার। আমার কাছে পাঁচ রুবলের একটা নোটই ছিল, আমি একটু এগিয়ে গিয়ে তার হাতে সেই নোটটা গুঁজে দিতে গেলাম।

সে ইংরেজিতে বল্‌ল, থাক, এখন থাক, এখন রেখে দিন।

আমি আর কিছু না বলে সরে পিছিয়ে এলাম। তারপর সে আমার জন্য কিছু পাউরুটি, মাখন, বিস্কুট, দই, এ সব কিনে নিয়ে নিজে থেকেই তার দাম শোধ করে দিয়ে এল।

সে বলল, সিদ্ধ ডিম পাওয়া গেলনা, নেই, ফুরিয়ে গেছে। আমার ঘরে আছে, আমি আপনাকে এনে দিচ্ছি।

বলে খাবার জিনিসগুলো অন্য ছাত্রটির হাতে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল। আমরা ছু'জন আমার নিজের ঘরে এসে তার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘানার ছাত্রটি এক কেট্‌লি গরম জল, চা, সিদ্ধ ডিম ও কিছু কমলা লেবু তার নিজের ঘর থেকে নিয়ে এসে হাজির হলো। ছাত্ররা তাদের জল গরম করে চা তৈরী করা কিংবা ডিম সিদ্ধ করবার জন্যে বারোয়ারী হিটারগুলো ব্যবহার করে থাকে। সেখান থেকেই সে আমার জন্যে চায়ের জল গরম করে নিয়ে এসেছে। আমার জন্যে তার যা খরচ হয়েছে, তাও তাকে নিয়ে নেবার জন্য পাঁচ রুবলের নোটখানি তার হাতে দিতে গেলাম, সে কিছুতেই নিতে চাইল না।

বললে, আপনি ডাঃ ঘোষের শিক্ষক, ডাঃ ঘোষ আমার শিক্ষক, আমি কি আপনার খাবারের দাম নিতে পারি?

আমি বললাম, তোমার বাড়ীতে গিয়ে ত আর আমি নিমন্ত্রণ খাচ্ছি নে, নিজের হাতের পয়সা দিয়ে, তুমি 'বুফে' থেকে কিনেছ, এ পয়সা তোমাকে নিতেই হবে।

কিন্তু সে কিছুতেই নিতে রাজি হ'লো না। মনে হলো, তার এক রুবলের বেশী খরচ হয়েছে। সাধারণ ছাত্র সে, কি-ই বা আর বৃত্তি পায়, তবু তার ভিতর থেকেই অতিথি সৎকার করবার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। আফ্রিকার অধিবাসী নিগ্রো, তাদের আমরা দূর থেকে জানি অসভ্য, আরণ্য, হিংস্র, নরমাংসাহারী; কিন্তু যখন কাছে এল, তখন তার মধ্যে কি দেখলাম! ভেবে সেই পাথরের মত কালো রঙ্‌ স্বাস্থ্যবান্‌ যুবকের দিকে আমি কৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলাম। বাইরের কালো রূপটার ভিতর দিয়েও তার অন্তরের সৌন্দর্য ফুটে বেরুল।

রাত্রে ঘরের মধ্যে উত্তাপের ব্যবস্থা থাক্‌লেও অত্যন্ত শীত অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল, কাঁচের জানালা ভেদ করে বরফে হাওয়া ঘরে ঢুকছে, লেপের ভিতরে গিয়ে ঢুকেও কাঁপুনি বন্ধ হচ্ছে না।

সে রাত্রে তাপমাত্রা যে কত নীচে নেমেছিল, তা জানতে পারি নি তবে সারারাত ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় নি।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কাঁচের জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখি, সে এক কাণ্ড! গুঁড়ি গুঁড়ি পেঁজা তুলোর মত অনবরত আকাশ থেকে কি যেন ঝরে পড়ছে। আগে জীবনে কোন-দিন বরফ পড়া দেখিনি, তবু দেখেই বুঝতে পারলুম, বরফ পড়ছে, হয়ত শেষরাত্রি থেকেই পড়তে আরম্ভ হয়েছে। জানালার ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করলাম, হোটেল বাড়ীর পূর্বদিকে যে ফাঁকা জায়গাটুকু আছে, তা একটি পার্ক, বোধ হয় শিশুদের পার্ক; কারণ, তাতে শিশুদের কতগুলো খেলার সরঞ্জাম বরফে ঢাকা পড়ে থাকৃতে দেখা গেল। বেঞ্চিগুলোর উপরেও বরফ পড়ে রয়েছে, তুলোর মত সাদা নরম বরফে সারা পার্কটি ঢাকা পড়ে গেছে।

আমি আর কিছুতেই ঘরের ভিতরে বসে থাকতে পারলাম না। কোন রকমে হাতমুখ ধুয়ে ওভারকোট ও আমার সেই টুপীটি মাথায় দিয়ে বরফ পড়ার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম দু'একটি স্ত্রী-পুরুষ বরফ পড়ার মধ্যেই বরফের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে ছোট একটি পথ, পথ পেরিয়েই একটি পার্ক। পার্কটির দু'ধারেই কয়েকটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস, প্রত্যেকটি সাত-আট তলা করে উঁচু হবে। তার একটির মধ্যে আমার আশ্রয় ছিল।

বরফে ঢাকা পথটি পেরিয়েই পার্কের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম। সারা পার্ক জুড়ে একটি মাত্র বয়স্ক ভদ্রলোক বরফের উপর দিয়েই ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, রৌদ্র উঠেছে, কিন্তু তার তেজ নেই, কুয়াসায় আচ্ছন্ন। আমার মাথার টুপীতে গায়ের ওভার কোটে বরফের কণা এসে রাশি রাশি পড়ছে, এক-একবার খুব বিজ্ঞের মত গা ঝাড়া দিয়ে তা ফেলে দিচ্ছি। জুতো প্রায় হাঁটু পর্যন্ত গিয়ে বরফের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, কাল রাত্র থেকে যে বরফ পড়ছে, তা এখনও পেঁজা তুলোর মত যেমন দেখতে, তেমনই তারই

মত নরম। এক-একবার মুঠি মুঠি হাতে তুলে নিচ্ছি, কিন্তু তক্ষুণি ছুঁড়ে ফেলে দিতে হচ্ছে—এত ঠাণ্ডা যে হাতের দস্তানা বেশিক্ষণ খুলে রাখবার কোন উপায় নেই। ক্রমে আরও কয়েকজন বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ পার্কে এসে হাজির হলেন, তাঁদের দেখে মনে হ'লো, তাঁদের কোন তাড়া নেই; বেড়াবার জন্যই এসেছেন। দেখ্‌তে পাওয়া গেল, পথ দিয়ে নানা বয়সী স্ত্রী-পুরুষ হাতে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে Metro-র বা মাটির নীচে যে রেলপথ আছে, তার স্টেশনের দিকে ছুটে যাচ্ছে; মনে হচ্ছে, তাঁরা কাজে বেরুচ্ছে। কিন্তু সেদিন রোববার, কাজের তাড়া ছিল না, তবু অন্য কোন কাজে নয়, শুধু বেড়ানোর জন্য বেরিয়ে পড়েছে। আমি পার্কের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম। বরফ পড়ে পড়ে আমাকে শ্বেত ভালুকের মত দেখ্‌তে হলো।

রোববার বলে আমারও কোন কাজ ছিল না, রীমা বলে গেছেন, রোববার কেউ আমার কাছে আসবে না, আমারও সেদিন পরিপূর্ণ ছুটি। মনে করলাম, ছুটির দিনটি আমিও যতদূর পারি বেড়িয়েনি। কিন্তু পার্কটুকুই আমার সীমানা; কারণ, ভাষা জানিনে, সঙ্গী কেউ নেই, পথ হারিয়ে যাবার ভয় পদে পদে; তাই যে হোটেলে উঠেছি, তার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে একবার পার্কের এদিক আর একবার ওদিক করতে লাগলাম।

পার্কের চারপাশের বড় বড় বাড়ীঘরগুলোর মধ্যে এখনও জনপ্রাণীর প্রাণের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না; মনে হয়, এখনও কেউ একটা বড় জাগেনি। অবরুদ্ধ কাঁচের জান্‌লাগুলোর অন্তরালে আজ রোববারের শীতের সকালে এখনও বেশির ভাগ লোকই শয্যাত্যাগ করেনি।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, আমার অনুমান পুরোপুরি ঠিক নয়, পার্কের পশ্চিম দিকে একটা ছোট্ট দোকানের

সাম্‌নে দেখলাম স্ত্রী-পুরুষের একট মস্ত ভীড়, কিন্তু এই ভীড়ের মধ্যে একটা শান্ত ও সংযত শৃঙ্খলা আছে।

একটা ছোট্ট দোকান সবে মাত্র খুলেছে বলে মনে হলো, তা থেকে প্রত্যেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন—রুটি, মাখন, দুধ—এ'সব কিনে নিচ্ছে। আর একদিকে একটি বিরাট বাড়ীর নীচের তলাকার একটি ঘর থেকে ক্রমাগতই লোক যাতায়াত করছে। আমার একটু কৌতূহল হ'লো। এদিকে বরফ পড়বার বিরাম নেই, সেই ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলে যে প্রথম দেখেছি পেঁজা তুলোর মত বরফের কণাগুলো আকাশ থেকে পড়ছে ত পড়ছেই, এখনও অবিরাম তেমনি পড়েই চলেছে; মাথার টুপীর উপর, গায়ের ওভারকোটে, ঘরের ছাদে, পার্কের বেঞ্চিতে, মোটরের হুডে রাশি রাশি বরফের কণা হিমশীতল আস্তরণ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে মানুষের নিত্যকর্মের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হচ্ছে না; আমি সেদিনকার মত নিষ্কর্মা, আমি চারদিক অবাক হ'য়ে শুধু তাকিয়ে দেখছি। আমার কোন সঙ্গী নেই, আবশ্যক থাকলেও সেই আবশ্যকের বোধ নেই।

সাহসে ভর করে পার্ক ছেড়ে পথের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'জন নিগ্রো যুবক কথা বল্‌ছে। আমার আগের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, নিগ্রোরা যেমন ইংরেজি বল্‌তে পারে, তেমনই অতিথি-বৎসল; সুতরাং তাদের দেখে একটু ভরসা হোল। এখন যে একটু ইংরেজি বল্‌তে জানে, তাকেই বন্ধু বলে মনে হয়।

কাছে যেতেই তারা আমার দিকে তাকিয়ে সুপ্রভাত জানাল।

আমি আশ্বস্ত হয়ে আমার পরিচয় দিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলাম, একটা ডাকঘর আমাকে দেখিয়ে দিতে পার? আমার কিছু চিঠিপত্র লিখতে হবে। কে জানি আমাকে বলেছিল, সোভিয়েত দেশে রবিবারেও ডাকঘরে নিয়মিত কাজ হয়। যে ঘরটির ভিতর থেকে লোক যাতায়াত কচ্ছিল, সেইটি একটি ডাকঘর। তারা আমাকে

সঙ্গে করে নিয়ে তার ভিতরে গেল; কর্মচারী সবই নারী, তাদের কাছ থেকে আমার প্রয়োজনীয় টিকিটপত্র কিনে দিয়ে যেখানে ছাত্র দুটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেখানেই তারা পথের উপর আমাকে রেখে গেল।

আমি বললাম, আমি ঠিক আমার হোটেলে গিয়ে উঠতে পারব, তোমাদের পৌঁছে দেবার প্রয়োজন হবে না।

কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আমাকে যে শিক্ষা দেবেন, তা তখন বুঝতে পারিনি। সব হোটেলগুলোই দেখতে একই রকম; এমন কি, সাম্‌নের আঙ্গিনার বাগানের মাপটুকু এবং বাগানের মধ্যে যে প্রাচীন ভাস্কর্য মূর্তি আছে, সেগুলোও প্রায় অভিন্ন—একই ছাঁচে যেন ঢালাই করা। যেমন বাড়ীগুলো, বাইরের আঙ্গিনার রূপটিও তাদের তেমনি, বিশেষতঃ বরফে ঢেকে গিয়ে সব একাকার হয়ে যাবার ফলে একটি থেকে আর একটিকে পৃথক্ করে দেখবার কোন উপায় ছিল না। আমি ভুল করে আর একটি হোস্টেলের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেলাম; তারপর মাথার টুপী ও ওভারকোট নিয়েই হন্ হন্ করে দোতালার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম ভিতরের সাজসজ্জাও সব হোটেলেরই এক।

আগেই বলেছি, ছাত্রাবাসের মধ্যে অনুমতি-পত্র ছাড়া বাইরের কেউ ঢুকতে পারে না; সুতরাং আমি ভুল করে যখন আর একটি হোস্টেলের দরজা দিয়ে ঢুকে গেলাম, তখন তার দ্বারদেশে যে এক ভীষণ-দর্শনা রক্ষয়িত্রী ছিলেন, তিনি আমাকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে রুশ ভাষায় কি বলতে লাগলেন। আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি যে আমাকেই উদ্দেশ্য করে তিনি কিছু বলছেন; তারপর ঘরের দিকে গতি আমার যতই বাড়তে লাগল এবং তারও চীৎকার ততই বেড়ে চলল, তখন আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালাম, দেখি তিনি আমার দিকেই মুখ করে কি বল্‌ছেন। কিন্তু ignorance is bliss, আমি তার একটি কথাও বুঝতে না পেরে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দু' একবার অস্ফুট সুরে

ইংরেজিতে কিছু বললাম, কিন্তু তাতে যে কোন কাজ হোল, তা মনে হলো না।

এমন সময় একটি শ্বেতাঙ্গ ছাত্র সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল, সে ইংরেজি জানত। সে রক্ষয়িত্রীর কথা শুনে আমাকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, তিনি তা জান্‌তে চাইছেন!

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে ত আমি বুঝতে পারিনি যে, আমি যে হোটেলটিতে উঠেছি, এটি সে হোটেল নয়। একই রকম ভাবে যেন ছাঁচে ঢালাই করে আসবাব পত্র ছবি টব এসব সাজান! তখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি ঠিক হোটেলেই উঠেছি।

আমি ইংরেজিতেই বল্‌লাম, কেন, আমি আমার নিজের ঘরে যাচ্ছি। কাল সন্ধ্যায় এসে ত আমি এই হোটেলেরই ৫০নং ঘরে উঠেছি! এইত আমার ঘরের চাবি!

বলে পকেট থেকে বার করে ঘরের চাবিটি দেখালাম। চাবিটি দূর থেকে দেখতে পেয়েই সেই মহিলা আসন ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, চাবিটি নিজের হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর আমাকে তার সঙ্গে যাবার ইঙ্গিত করলেন।

ইংরেজি জানা ভদ্রলোকটি বললেন, আপনি ভুল জায়গায় এসে উঠে পড়েছেন, তাঁর সঙ্গে যান।

আমি মহিলার অনুবর্তী হয়ে তাঁরই প্রদর্শিত পথে নীরবে অগ্রসর হতে লাগলাম, নিজের মূঢ়তার জন্য নিজেই মর্মযাতনা অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লাম।

তুটি দরজা পর পর ঠেলে ভদ্রমহিলা বাইরের তুষারাচ্ছন্ন আঙ্গিনার মধ্যে এসে পড়লেন, আমি বাইরে পা বাড়াতেই নূতন জুতো আবার পিছলে যাবার উপক্রম হলো; ভদ্রমহিলা পিছন ফিরে হঠাৎ আমাকে তু'হাত দিয়ে ধরে ফেল্‌লেন। প্রথম পদস্খলনের পর থেকে বরফের উপর আমি আজ সকালে খুব সন্তর্পণেই চলেছি; কিন্তু এখন মানসিক উত্তেজনায় দ্বিতীয়বার পদস্খলন হলো, বুঝতে পেরে একটু অপ্রতিভ হলাম। যাতে কোন তুর্ঘটনা না ঘটিয়ে

ফেলি, সেজন্য সেই মহিলা আমাকে হাত ধরে নিয়ে চল্‌লেন। অবস্থাটা ভাবতেও আমার বড় খারাপ লাগল। আমিই ভুল করে তাঁর হোটেলে ঢুকে তাঁকে বিব্রত করেছি, তিনিই আমার নিরাপত্তার জন্য এতখানি সতর্ক হয়ে উঠে আমার অপরাধ এবং লজ্জাকেই যেন আরও বাড়িয়ে তুল্‌ছেন। কিন্তু তাকে যে কৃতজ্ঞতা জানাব, সেই ভাষাও আমার অধিকারে নেই, আমি অস্ফুটবাক্‌ শিশুর মত তার হাতে আত্মসমর্পণ করে সেই অবিরাম তুষারপাতের মধ্যে নীরবে পথ চল্‌তে লাগলাম।

আঙ্গিনার সদর দরজা পেরিয়েই বরফ ঢাকা পথ, সেই পথ দিয়ে কিছু দূর এগিয়েই আর একটি হোটেলের সদর দরজা। তিনি আমাকে তার ভিতরে নিয়ে গেলেন, তারপর পরপর দুটি দরজা খুলে একেবারে হোটেলের ভিতরে প্রবেশ কর্‌লেন। আমাকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে তিনি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার জানা ছিল না বলে তাঁকে আমি নীরবেই বিদায় দিলাম।

আমি আমার নিজের ঘরে এসে টুপী ওভারকোট খুল্‌লাম; বরফে জুতো ভিজে উঠেছিল, পা থেকে তা খুলে ইলেকট্রিক হিটারের ওপর রেখে দিলাম, তিন জোড়া নাইলনের মোজা পায়ে ছিল, শুধু তাই কিছুক্ষণের জন্য পায়ে রইল।

ইতিমধ্যে বেশ ক্ষুধা বোধ হতে লাগল। আগের রাত্রের অভুক্ত প্রচুর খাবার ঘরে ছিল, তারই সদ্ব্যবহার করা গেল। তারপর বাড়ীতে একখানি চিঠি লিখবার কাজে মন দিলাম।

এমন সময় দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ। কি ব্যাপার? দেখি, একজন ভারতীয় অধ্যাপক আগের রাত্রের নিগ্রো ছাত্র দুটির কাছ থেকে আমার আগমন-বার্তা জেনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছেন। তার নাম অধ্যাপক ভাসানি। তিনি উত্তর প্রদেশের অধিবাসী, কাশী হিন্দুবিশ্ববিত্থালয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর লেকচারার, রাষ্ট্রীয় বৃত্তি নিয়ে মস্কো বিশ্ববিত্থালয়ের একজন রসায়ন শাস্ত্রের

অধ্যাপকের নিকট ডক্টরেটের জন্য গবেষণা করতে প্রায় দু' বছরের ওপর এ'দেশে এসেছেন। তিনি এই হোস্টেলেরই একটি ঘরে থাকেন। তবে সকাল ন'টায় বেরিয়ে যান, রাত্রি বারোটার সময় ফেরেন। কাল অনেক রাত্রে ফিরে এসে আমার সংবাদ শুনেছেন, তিনি রাত্রে আর আমাকে বিরক্ত কর্‌তে আসেননি। আজ সকাল ৯টায় অর্থাৎ লেবরেটারিতে বের হ'য়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

তিনি ঘরে ঢুকেই অত্যন্ত বিরক্তির সুরে বললেন, আপনাকে এখানে এনে কে তুলেছে? আপনার থাকবার কথা মস্কোর একটা বড় হোটেলে!

আমি বল্লাম, তা আমি জানি, যে এ'নে আমাকে এখানে তুলেছে, সেও আমাকে তাই বলেছে। কিন্তু আমি নিজেই এ'জন্য দায়ী, বেশিদিন আগে থেকে আমি খবর দিয়ে আস্‌তে পারিনি, গত বৃহস্পতিবার দিল্লী থেকে ভিসা পেয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় প্লেনের টিকেট পেয়েছি, তারপর যখন এখানে জানান হয়েছে, তখন সে সংবাদ শনিবার অর্ধেক দিনের আপিশ ছুটি হবার আগে এখানে এসে পৌঁছয় নি, পৌঁছুতে পারে না; তবুও সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে একজন মহিলা কাল বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করে এখানে দু'রাত্রির জন্য রেখে গেছেন। বলেছেন, সোমবার ১০টার পরই সকল ব্যবস্থা হবে।

তিনি এই ব্যাখ্যা শুনেও প্রসন্ন হলেন না; তারপর ভারতীয় দূতাবাসের কেউ যোগাযোগ করেছিল কিনা, তাও জিজ্ঞেস করলেন; আমি যখন বললাম, না, তখন তিনি আরও বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লেন।

আমি বল্‌লাম একই কারণে তারাও যোগাযোগ কর্‌তে পারেন নি। কিন্তু এখানে এসে আমার খুবই উপকার হয়েছে। দেশ বিদেশের উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা যে কি, তা দেখবার একটি সুযোগ পেয়েছি। আপনার সঙ্গেও ত আলাপ হবার সুযোগ হলো!

তার অপ্রসন্নতা দূর হলো না। তিনি বল্লেন, আজ রোববার হলেও আমাকে এক্ষুনি লেবরেটারিতে বেরুতে হবে। এই হোস্টেলে আমি ছাড়া আর কোন ভারতীয় নেই। আপনার ভার আমি আর একজনের হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তিনি কাছেই আর একটি হোস্টেলে থাকেন, চলুন।

আমি কালবিলম্ব না করে তৈরী হয়ে নিলাম। মাথায় monkey cap-টি আঁটতে যাচ্ছি দেখে তিনি বল্লেন, এ কি? টুপী নেই?

আমি বললাম, কাল রাত ত প্রথম এসে উঠেছি, এখানকার টুপী এখনও কেনা হয়নি।

তিনি বললেন, আচ্ছা টুপী একটা ও'খানে গিয়ে পাওয়া যাবে চলুন।

তিনটে গরম সোয়েটারের উপর গরম কোট, তার উপর এক মোটা ওভারকোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়্লাম। বাইরে যেতেই দেখা গেল, বরফ পড়া কখন বন্ধ হ'য়ে গিয়ে সামান্য একটু রোদ উঠেছে। তবুও শীতের গাঢ়তা যে কিছু কমেছে তা মনে হলো না।

অধ্যাপক ভাসানি পথ ছেড়ে পার্কের ভিতর দিয়ে সোজা পথ ধর্লেন, দ্রুত পদে চল্তে চল্তে বল্লেন; দেখুন, রিসার্চ করা বড় দায়। আজ প্রায় তিন বছর ধরে কাজ কর্ছি! কাজ প্রায় শেষও হয়ে এল, এখন দাখিল করবার সময় হলো, এখন আমার অধ্যাপক বল্ছেন কি না, আমার কাজ কিছুই হয়নি! তাই দেখুন না, রোববারেও বেরুতে হচ্ছে, আজকে তাঁর সঙ্গে আমার একটা বোঝা পড়া হবে।

আমি সহানুভূতির সুরে বল্লাম, তাইত, আপনার যদি সত্যিই কোন কাজ না হয়ে থাকত, তবে তিনি তা প্রথম থেকেই আপনাকে জানালেই পারতেন, এখন শেষ অবস্থায়······

তিনি বাধা দিয়ে বল্লেন, না না আগে ত বলেছিলেন, আমি যে ভাবে কাজ করে যাচ্ছি, তা ঠিকই আছে, এখন আবার মত

বদ্‌লে ফেলেছেন। সেজন্য এখন আমাকে দিন রাত খেটে তাঁরই কথামত নতুন করে কাজ আরম্ভ কর্‌তে হচ্ছে, বলুন ত সেটা কি কখনও সম্ভব ?

আমি বল্‌লাম, সে ত বটেই ; তা কি কখনো সম্ভব হতে পারে ? তবে আপনার শিক্ষক যা কচ্ছেন, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজে নিয়েই ত কচ্ছেন! সুতরাং তাঁর কথা আপনার শোনা দরকার।

ইতিমধ্যে আমরা গিয়ে আর একটি হোস্টেলের দরজায় পৌঁছলাম। তার ভিতরকার ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র বলে মনে হলো ; বাড়ীটা নূতন, আধুনিক ধরনের লিফ্‌টের ব্যবস্থা আছে।

এখানে ঢুকেও গম্ভীর-দর্শনা এক মহিলা এক কাউণ্টারের পাশে বসে আছেন দেখা গেল ; অধ্যাপক ভাসানি তার কাছে গিয়ে নিজের এবং আমার জন্য হোটেলে প্রবেশ করবার অনুমতি সংগ্রহ করলেন। আমি ভারতীয় একজন অধ্যাপক এই পরিচয় দেবার ফলে অনুমতি পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। তিনি মহিলার পূর্ব পরিচিত ; অর্থাৎ এই হোটেলে যাতায়াত করে থাকেন বলে মনে হলো।

দুজনে 'লিফ্‌ট' বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম, এই হোটেলে কেবলমাত্র পুরুষই নয়, নারীও আছে, তারা ছাত্রী কি না জানি নে, কিন্তু তারা নানা বয়সী এবং তাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। অধ্যাপক ভাসানির মন নানা কারণেই বিশেষ প্রসন্ন নয় জেনে, এই বিষয়ে তাঁকে আর কোন অহেতুক কৌতূহল দেখিয়ে বিরক্ত করতে চাইলাম না। শীতে আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে গম্ভীরভাবে উচ্চে আরোহণ করতে লাগলাম।

এক জায়গায় এসে 'লিফ্‌ট' থামল, দুজনেই নেমে পড়লাম। অধ্যাপক ভাসানি এক রুদ্ধ ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় ঘা দিতে লাগলেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ; কিন্তু কোন সাড়া নেই।

ভাসানি আগে থেকেই নানা কারণে বিরক্ত হয়েছিলেন ; বল্লেন, দেখলেন, এখনও ঘুম ভাঙ্গেনি। রোববার কি না। কাল শনিবার হয়ত রাত একটার সময় হোস্টেলে ফিরেছে ; কি বলবেন ? তারপর শেষ পর্যন্ত আমার অবস্থা না হ'য়েছে, তবে কি বলছি, রোববারেও ছুটোছুটি করে কুল পাবে না।

অনেকক্ষণ পর ঘরের দরজা খুলল। নিদ্রাজড়িত চক্ষে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক দরজা খুলেই আমার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

ভাসানি তার কাছ আমার পরিচয় দিলেন ; তারপর বল্লেন, আমাকে এক্ষুনি আমার প্রোফেসারের কাছে ছুট্‌তে হচ্ছে, এঁর সকল ভার তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছি ; ব্যবস্থা করো, কাল আমার সঙ্গে দেখা হবে। বলে তিনি অপেক্ষা মাত্র না করে বেরিয়ে গেলেন।

নৈহাটী মিত্রপাড়ার অধিবাসী ডাক্তার শঙ্কর পাল, কোলকাতা ন্যাশান্যাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম, বি, বি, এস, পরীক্ষা পাশ করে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডক্টরেট নিতে এসেছেন। তিনি আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পেরে প্রাণটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। নৈহাটীর আমার বন্ধু শ্রীঅতুল্য চরণ দে পুরাণরত্নের তিনি আত্মীয় এবং আমার সহকর্মী ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের ছাত্র বলে পরিচয় দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই পরম সৌহার্দ্য স্বষ্টি হয়ে গেল।

তার ঘরটি অপ্রশস্ত, তার মধ্যেই তিনটি শয্যা। দুইটি শয্যায় এখনও দুইজন আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে গভীর নিদ্রাগত ; ডাক্তার পালেরও নিদ্রা অসময়ে ভেঙ্গেছে, তা সহজেই অনুমান করা গেল।

তিনি নিজেই বল্লেন, কাল শনিবার ছিল, অনেক রাত্রে ফিরেছি, আর দেখছেন ত ঠাণ্ডা! একটু রোদ না উঠলে বিছানা থেকে উঠেই বা কি করব ?

আমি বল্লাম, আমি আপনার নিদ্রাভঙ্গের কারণ হলাম বলে খুবই দুঃখিত।

তিনি বল্লেন, না না, সেকি কথা? আপনার সঙ্গে দেখা হতে কত আনন্দ হলো। অনেক দিন দেশের খবর পাইনে! কোলকাতার কি খবর, বলুন।

আমি বল্লাম, কি আবার খবর? কোলকাতায় শীত নেই, খাবার জিনিস দাম হতে আরম্ভ করেছে!

তিনি বলে উঠলেন, মাছ?

আমি বললাম, আমদানি কমে গেছে, সেই পরিমাণ দামও বাড়ছে।

তারপর আরও কয়েকটি ছোটখাট ঘটনার কথা বললাম। দেখলাম, কোলকাতার কোন খবর সেখানে পৌঁছয়নি।

তিনি আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলেন। তারপর বাইরের পোশাক পরে তৈরী হয়ে বললেন, আজ আমার ছুটি, আর আপনারও যখন কোন লোক আজ আর আসবার কথা নেই, তবে চলুন দু'জনেই বেরিয়ে পড়ি। বেশ আপনাকে নিয়ে বেড়ানো যাক, তারপর বেলা ৪টার সময় Indian Embassy-তে যাওয়া যাবে, সেখানে আজ ভারতীয় ছাত্রদের বসন্তোৎসব, আপনাকে পেলে সকলেই খুব খুশী হবে।

আমি বল্লাম, বসন্তোৎসব? এই দারুণ শীতে!'

তিনি বল্লেন, আগে এর নাম ছিল দোলোৎসব, নানা সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী এখানে আসে বলে দোলোৎসব কথাটিতে আপত্তি হলো, তারপর থেকে তা' হয়েছে বসন্তোৎসব। ভারতে যখন দোলোৎসব হয়, তখনই এখানে বসন্তোৎসব হয়। অনুষ্ঠান ত আর কিছু নয়, এবার রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা ছবিটা দেখানো হবে, আর মস্কোয় বসে সিঙ্গারা, লুচি, বুটের ডাল খাওয়া হবে। সব ভারতীয়ই তাদের পরিবারের সবাইকে নিয়েই হাজির থাক্‌বেন। এক জায়গাতেই সকলের সঙ্গে আপনার দেখা হবার সুযোগ হবে।

আমি তা'তে সহজেই রাজী হলাম।

ডাক্তার পাল বল্লেন, দাঁড়ান, আমি আগে থেকেই টেলিফোন করে আপনার কথা কয়েকজনকে জানিয়ে দিচ্ছি।

বলে আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায়ই একটা টেলিফোন ছিল। প্রথমেই তিনি শ্রীবিশ্বজিৎ রায়কে টেলিফোন করলেন। এই বিশ্বজিৎ রায়েরই 'মস্কোর চিঠি' কোলকাতার কাগজে মধ্যে মধ্যে বেরোয়। তিনি তাঁর কাছে আমাকে তখনই যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন।

ডাক্তার পাল বল্লেন, এম্বেসীতে যাচ্ছি, সেখানেই দেখা হবে।

কোন বড় হোটেলে না তুলে সেখানে আমাকে নিয়ে তোলা হয়েছে শুনে তিনিও খুব বিরক্তি প্রকাশ কর্লেন। ভারতীয় দূতাবাস থেকে বিমান বন্দরে কেউ যায়নি শুনে তাঁর বিরক্তি-বোধ আরও বেড়ে গেল। তাঁকে টেলিফোনে বিশেষ কিছু বুঝিয়ে বলা সম্ভব হলো না, শুধু বলা হলো সাক্ষাতে সকল কথা বলা হবে। তারপর শ্রীযুক্ত ননী ভৌমিকের নিকট টেলিফোন করা হলো; তিনিও তাঁর কাছে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁকেও একই কথা বলা হলো যে ভারতীয় দূতাবাসে বসন্তোৎসবে সাক্ষাৎ হবে। আরও কয়েকজনের নিকট টেলিফোনে আমার আগমনবার্তা প্রচার করে ডাক্তার পাল অবশেষে ঘরে ফিরে এসে বল্লেন, চলুন এবার বেরিয়ে পড়ি, দুপুরের খাওয়া দাওয়াও বাইরেই সার্তে হবে ত।

ইতিমধ্যে যে দুই ব্যক্তি আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে এতক্ষণ শুয়েছিলেন, তারা গা মোড়ামুড়ি দিয়ে এ'পাশ-ও'পাশ করতে লাগলেন; মনে হল আমাদের কথাবার্তায় তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে। তারা উভয়েই শ্বেতাঙ্গ যুবক, একজন ইস্টোনিয়ার অধিবাসী, আর একজন জর্জিয়ার অধিবাসী, দুটি রাজ্যই সোভিয়েত দেশেরই অন্তর্গত, তাঁরা উভয়েই রুশভাষী। ডাক্তার পাল সুন্দর রুশ ভাষায় তাঁদের সঙ্গে আলাপ কল্লেন। তারপর আমরা দু'জনেই বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

'লিফ্‌ট' দিয়ে নামবার সময় বললাম, এ হোস্টেলে বুঝি ছাত্রছাত্রী সবাই একসঙ্গেই থাকে।

তিনি নির্লিপ্ত ভাবে বললেন, তাইত দেখতে পাই, তবে কে ছাত্র, কে ছাত্রী—তা ঠিক বলতে পার্‌ব না।

আমার নিজের টুপীটিই মাথায় ভাঁজ করে এক ভাবে পরেছিলাম, ডাক্তার পালের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হলো।

তিনি বল্লেন, আপনার বুঝি টুপী নেই? আগে বললে আমার একটা ফেল্ট হ্যাট্‌ ছিল, সেটা আপনাকে দিতে পারতাম।

আমি বললাম, আমি এখনও এখানকার টুপী কিনতে পারিনি, এ'টাতেই এক রকম আজ চালিয়ে নেব।

কিন্তু অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলাম, এ টুপীতে কাজ চলবার উপায় নেই, মাথার মগজটুকুও যেন জমে বরফ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। চামড়া লাগানো ছাড়া টুপী এখানে এ সময় ব্যবহার করতে রুশবাসীরাও সাহস পায় না।

একটু যে রোদ উঠেছিল, তা'তে বরফ সামান্য গলে গিয়ে পথ-ঘাট পিছল হয়ে গিয়েছে, নূতন জুতো পায় দিয়ে সাবধান হয়ে আমাকে চলতে হচ্ছিল।

কিছুদূর গিয়েই একটি Metro অর্থাৎ মাটির নীচের রেলগাড়ীর স্টেসন। জীবনে এই আর এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। ভিতরে ঢুকে দরজার পাশেই একটি বাক্সে পাঁচ কোপেকের একটি মুদ্রা ফেলে দিয়েই সরাসরি গিয়ে একটা চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, তারপর সেই সিঁড়ি আপনা থেকে নীচের দিকে নামতে নামতে কয়েক শত কিংবা হাজার ফুট মাটির নীচে নেমে যায়; সেখানে ইন্দ্রপুরীর মত আলোয় আলোময় পাতালপুরী, সাদা পাথরে গাঁথা বিরাট স্তম্ভের উপর পাথরে বাঁধান ছাত ধরা রয়েছে, তার ভিতর দিয়ে রেলপথ চলেছে—পৃথিবীর উপরিস্থিত রাজপথ, প্রাসাদ-বিপণি-নদনদী অতিক্রম করে।

প্রায় প্রতি মিনিটে যাত্রিপূর্ণ আপ এবং ডাউন দুটো লাইন ধরে

ইলেকট্রিক ইঞ্জিনে টানা অগণিত ট্রেণ আসছে, আর যাচ্ছে। শহরের জনতার একটা প্রধান অংশ এমনি ভাবে জনচক্ষুর অন্তরাল দিয়ে সর্বদা যাতায়াত করে; সেইজন্য রাজপথের জনতা থেকে রাজধানীর বিশালত্ব সম্বন্ধে কোন অনুমানও করা যায় না। পাঁচ কোপেকের একটি মুদ্রা নিজের হাতেই দরজার পাশে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। তারপর যেই চলন্ত সিঁড়ির সব চাইতে উপরের ধাপে পা দিয়েছি, তখনই আমাদের নিয়ে সিঁড়ি নীচের দিকে নামতে শুরু করছে। যারা একেবারে এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাদের পক্ষে প্রথম হেঁচকা টানটি সাম্‌লে ওঠা কঠিন। আমারও তাই হ'য়েছিল, চলন্ত অবস্থায় পড়তে পড়তে কোন রকমে ডাক্তার পালকে জড়িয়ে ধরে টাল সামলে নিলাম।

ডাক্তার পাল পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখে বল্লেন, দেখুন, আপনার অবস্থা দেখে মেয়েরা হাসছে।

পথেঘাটে মেয়ে-পুরুষকে হাস্‌তে ত দূরের কথা, ক্বচিৎ কথা বল্‌তে শুনেছি। কাজ থেকে অনেক রাত্রে ফিরবার পথে চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নবদম্পতি, স্বামি-স্ত্রী কিংবা আসন্ন-বিবাহ প্রণয়ি-প্রণয়িণীও যে কথাবার্তা বলত, তাও অন্য কারুর কানে প্রবেশ করত না। এই অবস্থায় আমার এমন একটা কি হলো যে, তা দেখে এই 'শান্ত পাষাণ-মূরতি' মেয়েরাও হাস্‌তে পারে, তা দেখ্‌বার জন্য আমিও পিছনের দিকে তাকালাম; তারা আমাকে বিদেশী বুঝ্‌তে পেরে অপ্রতিভ হয়ে একেবারে চুপ করে গেল। আমিও ডাক্তার পালকে ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে চলন্ত সিঁড়ির উপরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, ভাবটা এই যে, এমনিও ত আমি কতই চলাফেরা করে থাকি, আজকে না হয় একটা হেঁচ্‌কাটানে একটু বেসামাল হ'য়েই পড়েছিলাম, তাতে কিই বা হয়েছে!

চলন্ত সিঁড়ি চল্‌তেই থাকে, তা কখনও থেমে যায় না; তার চলার মধ্যেই উঠতে হয়, চলার মধ্যেই নামতে হয়। তাই উঠবার সময় যেমন প্রথমেই হেঁচকা টানে পড়ে যাবার আশংকা,

নামবার সময়ও তাই। প্রথম নামবার সময়ও আমি তা বুঝ্‌তে পারলাম।

সিঁড়ি থেকে নেমেই সামনে প্রশস্ত প্ল্যাট্‌ফরম। অধিকাংশ রেলকর্মচারীই নারী; গার্ড নারী, ড্রাইভার নারী, অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধানকারিণীও নারীই। সুন্দর 'ইউনিফরম' পরে তারা নিঃশব্দে কর্মরত হয়ে আছে। কোন টিকিট পরীক্ষক নেই; কারণ, যান্ত্রিক নিয়মে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা'তে পয়সা না দিয়ে কেউ ভিতরেই ঢুকতে পারবে না। ইলেক্‌ট্রিকের সাহায্যে রেলপথের নক্সা এঁকে এখানে-সেখানে গাড়ী চলাচলের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে; তা থেকে কোথায় আছি, কোথায় যেতে চাই, তার পথ কোনদিক দিয়ে, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়; কিন্তু রুশ ভাষা ছাড়া তা'তে অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা হয়নি।

দ্রুত একটি ইলেকট্রিক ট্রেন প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করল। গাড়ীর দরজা বন্ধ, দরজার সাম্‌নে গিয়ে ওঠবার যাত্রীরা সারি দিয়ে দাঁড়াল; গাড়ী স্থির হয়ে দাঁড়াতেই আপনা থেকে প্রত্যেক কক্ষেরই বন্ধ দরজা খুলে গেল, নামবার যাত্রীরা একে একে নামল, তারপর ওঠবার যাত্রীরা একে একে উঠ্‌ল। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী, কিংবা মহিলা কামরার বালাই নেই, সব কামরাই সমান; যে-যেখানে পারল, উঠ্‌ল। নিঃশব্দে যন্ত্রের নিয়মে এই শৃঙ্খলা আপনা থেকেই যেন পালিত হয়ে চলেছে। সব যাত্রীর ওঠা বন্ধ হয়ে গেলে গাড়ীর দরজা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ট্রেন ঊর্ধ্বশ্বাসে পরবর্তী স্টেশনের দিকে ছুটে চল্‌ল। স্টেশনের প্ল্যাটফরম্‌ আলোকোজ্জ্বল; কিন্তু তারপর নিরন্ধ্র অন্ধকার পথ, গাড়ীর ভিতরকার আলোতে সামান্য আলোকিত মাত্র। সব গাড়ীই নরম ও প্রশস্ত গদীতে মোড়া, কামরাগুলো প্রশস্ত, ভীড়ের সময় বহু যাত্রীকেই দাঁড়িয়েও যেতে হয়।

পরবর্তী স্টেশনটি যখন নিকটবর্তী হয়, তখন মাইক্রোফোনে তার নাম ঘোষিত হয়, যাত্রীরা নামবার জন্যে দ্বারের কাছে এসে

অপেক্ষা কর্‌তে থাকে। দরজা খুলে যায়, একে একে সবাই নেমে যায়, একে একে উঠে; দরজা আবার আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায়। ছাড়বার সময় গাড়ীতে কোন বাঁশী (whistle) বাজে না; ঢং ঢং ঢং করে তিনবার লৌহ ঘণ্টাতে কেউ ঘা দেয় না, গার্ডেরও কোন হুইস্‌ল বাঁশী নেই, দরজাগুলো বন্ধ করে নিঃশব্দে গাড়ী ছেড়ে দেয়। দরজা বন্ধ করে দিয়ে গাড়ী ছাড়বার ফলে চল্‌তি গাড়ীতে কেউ উঠ্‌তে গিয়ে পড়ে মরে না, পা-দানিতে বাদুড়-ঝোলা হয়ে যাবারও কারো কোন উপায় থাকে না। গাড়ীতে ফেরিওয়ালারও কোন উৎপাত নেই।

মেট্রো-তে করে প্রায় রেড্‌ স্কোয়ারের কাছে একটা মাটির নিচের স্টেসনে এসে আমরা নেমে পড়লাম। তারপর আবার চলন্ত সিঁড়িতে করে উপরে উঠতে লাগলাম। চলন্ত সিঁড়ি একদিক দিয়ে নাম্‌ছে, আর একদিক দিয়ে উঠ্‌ছে; নাম্‌বার যাত্রীদের নিয়ে ডানদিকে দিয়ে নামছে, ওঠবার যাত্রীদের নিয়ে বাঁ দিক দিয়ে উঠ্‌ছে; ওঠা-নামার পথে চলন্ত অবস্থাতেই যাত্রীদের পরস্পর চোখ চাওয়া চাওয়ি হচ্ছে। কেউ বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ বইও পড়ছে। ওপরে উঠে প্রথমেই ডাক্তার পাল আমাকে নিয়ে মস্কোর প্রসিদ্ধ রেড স্কোয়ারে এলেন, রেড স্কোয়ার সেদিন তখন জনাকীর্ণ।

ডাক্তার পাল বল্লেন, এতদিন শীত আরও বেশি ছিল বলে লোক বাইরে বেরুতে পারত না, আজ শীতটা একটু কম, তাই অনেকদিন পর লোকজন একটু বাইরে বেরিয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আজ শীত কম?

তিনি বললেন, তা হলে বুঝুন, এর আগে কি অবস্থা ছিল!

এখানে রাস্তাঘাট এবং রেড্‌স্কোয়ারের উপর থেকে বরফ সরিয়ে রেখে সব পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। রেড্‌ স্কোয়ারের আশেপাশেই মস্কোর কতকগুলো প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থান আছে। তাদের মধ্যে লেনিনের দেহ কৃত্রিম উপায়ে যেখানে রক্ষা করা

আছে, সেখানে লম্বা 'লাইন' লাগিয়ে নরনারী, শিশু-যুবা বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক্তার পাল বল্লেন, ওখানে দাঁড়ালে আজ সন্ধ্যা হয়ে যাবে, আজ অন্য দিকে চলুন। ক্রেমলিন, জারের আমলের পুরাণো গির্জা, পৃথিবী বিখ্যাত মস্কোর বলশয় থিয়েটারের বাড়ী এ সব দেখা গেল।

এখানে একটা কথা বলতে চাই। আমাদের দেশে এখানে সেখানে যত লাল ঝাণ্ডা দেখতে পাই, রাশিয়ায় গিয়ে তত দেখতে পাইনি। রাশিয়ায় যতদিন ছিলাম, তার মধ্যে মাত্র দুটি লাল ঝাণ্ডা আমার চোখে পড়েছিল; একটি মস্কোতে ক্রেমলিনের উপর, আর একটি লেনিনগ্রাদে স্মোল্‌নি (Smolny)-র উপর, যথেচ্ছভাবে জিনিসটির এখানে সেখানে ব্যবহার হতে কোথাও দেখ্‌তে পাইনি।

এ সব দেখাশোনার পর ডাক্তার পাল আমাকে নিয়ে এক বিরাট 'ডিপার্টমেণ্টেল স্টোরে' গিয়ে ঢুকলেন। সে বিরাট এক তিনতলা কি চারতলা বাড়ী, কোলকাতার এক একটা মিউনিসিপ্যাল মার্কেট তার এক এক তলাতে ঢুকেও জায়গা পড়ে থাকবে। রাজ্যের মানুষের ভীড় সেখানে। প্রত্যেকটি স্টলের সাম্‌নেও স্ত্রীপুরুষ, যুবা বৃদ্ধ, যুবতী বৃদ্ধা, বালক শিশুর ভীড়; নড়াচড়া করাই কষ্টকর। এই দুর্দান্ত শীতের মধ্যেও বালক বৃদ্ধ প্রায় সবারই হাতে এক একটা আইসক্রীমের বাটি।

ডাক্তার পাল বল্লেন, জানেন, শীতের মধ্যে 'আইসক্রীম' খুব চমৎকার লাগে, নিন খান।

বলে এক জায়গা থেকে দুটো কিনে একটা আমার হাতে দিয়ে আর একটা আমার খাবার জন্য প্রতীক্ষা না করেই নিজে খেতে লাগলেন। আইসক্রীমের বাটিটা হাতে ধরে রাখা যায় না, এত ঠাণ্ডা, তা মুখে দেব কি করে? কিন্তু চারদিকে চেয়ে যখন দেখলাম, ছেলেবুড়ো সবাই চামচ দিয়ে কেটে কেটে খাচ্ছে, তখন আমি বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞের মত তাদেরই অনুসরণ করে খেতে লাগলাম; ভাবলাম, যদি শীতে শীত কাটে!

স্টলগুলোতেও খুব ভীড়, কোন কোন স্টলে মেয়ে পুরুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক জায়গায় দেখা গেল, মেয়েদের খুব ভীড়; কি ব্যাপার? মেয়েদের মাথায় বাঁধবার সিল্কের রুমাল বিক্রি হচ্ছে।

ডাক্তার পাল বল্লেন, এগুলো মুর্শিদাবাদের ছাপানো সিল্ক, এই ভারতীয় জিনিসটির প্রতি এখানকার মেয়েদের বড় লোভ। যে যার পছন্দ মত ছাপ ও রঙ দেখে কেনে তখনই মাথার চুলের উপর দিয়ে বেঁধে নিচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে এ জিনিস নাকি এখানে রপ্তানি হয়। বাংলার শিল্প রুশ যুবতীদের এত আদরের সামগ্রী হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়ে মনটা আনন্দে এবং গর্বে ভরে উঠ্‌ল। জিনিস কিছুই নয়, রুমালের চাইতে কিছু বড়; কিন্তু রুশ যুবতীরা তাকে মাথায় তুলে রেখেছে।

আমার একটা টুপী কিন্‌বার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার পকেটে যে পাঁচটি রুবল আছে, তা'তে আমার কোন টুপীই পাওয়া যায় না। একটা টুপী দেখ্‌লাম, একটু দামে কম; পাঁচ রুবলেই হয়; আমার মোটামুটি পছন্দও হয়েছিল; কিন্তু যখন তা মাথায় পরে দেখ্‌তে গেলাম, তখন স্টলওয়ালী আমাকে বারণ করে রুশ ভাষায় যেন কি বল্ল।

ডাক্তার পাল আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে বল্লেন, এটা মেয়েদের টুপী; সেইজন্য আপনাকে পরে দেখতে বারণ কচ্ছে।

তৎক্ষণাৎ টুপীটা রেখে দিয়ে বিদায় হয়ে চলে এ'লাম। মনে মনে এইটুকু ভেবেই খুশী হলাম, যাই হোক, তবু আমাকে পুরুষ বলে ত চিন্‌তে পেরেছে!

অনেক সময় পুরুষ এবং মেয়েদের জিনিসের স্টল আলাদা থাকে, মেয়েদের জিনিসের জন্য আলাদা ষ্টোরও থাকে, সেখানে কেবল মেয়েরাই কেনা কাটা করে।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম; একতলা, দোতলা করলাম; তিনতলায় আর উঠবার শক্তি নেই। পা দুটো আর চলছে

না, তাতে গায়ে আধমণ ওজনের পোশাক। একটু বস্‌তে পারলে বাঁচি।

ডাক্তার পাল বল্লেন, চলুন এ'বারে লাঞ্চ করা যাক।

সিঁড়ি দিয়ে দুজনেই নীচে নেমে গেলাম, তারপর পথ পেরিয়ে অনেক খোঁজা-খুজি করে একটা রেস্তোরাঁর সন্ধান পাওয়া গেল।

ভিতরে ঢুকেই দেখি ওভারকোট টুপী খুলে নিয়ে রাখবার জন্য একজন লোক এক কাউন্টারের ধারে দাঁড়িয়ে আছে; দুজনেই টুপী ওভারকোট খুলে তাঁর হাতে দিলাম, সে একটি নম্বর আমাদের দিল। আমরা গিয়ে টেবিলে বসলাম।

বেশ বড় হোটেল, তবে জাঁকজমক কিছু নেই, বাদ্যভাণ্ডও কিছু শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। বসে আছি ত বসেই আছি। কেউ আমাদের খোঁজ নিতে আসছে না। এ'দিকে দেখতে পাচ্ছি, লাইন দিয়ে লোক নিজে হাতে করে খাবার নিয়ে এসে টেবিলে বসছে।

ডাক্তার পাল হঠাৎ বলে উঠলেন, তাইত এ'যে একটা সস্তার রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছি!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সস্তা কি রকম?

তিনি বল্লেন, দুরকম রেস্তোরাঁ এদেশে দেখতে পাবেন। সস্তা আর দামী। সস্তার রেস্তোরাঁয় আপনাকে নিজে হাতে করে খাবার নিয়ে আস্‌তে হবে, দামী রেস্তোরাঁয় আপনার কাছে এসে খাদ্য তালিকা দেখাবে, আপনার নির্দেশ মত খাবার আপনার টেবিলে এসে পরিবেষণ করবে। মনে হচ্ছে, এ'টি সস্তার হোটেল, খাবার জিনিসও এখানে সস্তা; দেখুন, নিরামিষই খেতে হয় কি না! আপনি বসুন, দেখি যা পাওয়া যায়, আমি হাতে করে নিয়ে আসছি।

আমি বসেই রইলাম, উঠে দাঁড়াবারও আর শক্তি ছিল না; কিন্তু নিরামিষের নাম শুনে বড় নিরুৎসাহ হয়ে গেলাম। ক্ষুধা যা পেয়েছে, তা আর বল্‌বার নয়; এই অবস্থায় যদি নিরামিষই খেতে হয়, তবে কি অবস্থা হবে, ভেবেই পেলাম না।

ডাক্তার পাল হু'হাতে হু'থালা খাবার নিয়ে এসে টেবিলে রাখলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি, নিরামিষ?

তিনি বল্লেন, না ডিম সিদ্ধ আছে, আর আমিষ কিছু নেই।

ভাবলাম তবু ভাল। আমিষের একটা কিছু গন্ধ না থাকলে এই দুরন্ত ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে না।

মাখন, রুটি, দই, সিদ্ধ ডিম তারপর কফি দিয়ে কোন রকমে সস্তার মধ্যাহ্নভোজন শেষ করা গেল।

ডাক্তার পাল বল্লেন, এবার এম্বেসীর দিকে যেতে হয়; সেখানে গেলে সবার সঙ্গেই দেখা হবে, চলুন।

বলে তুজনই উঠে পড়লাম। রেস্তোরাঁর খরচ তিনিই দিলেন, আমার অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা তিনি জানেন; সেজন্য আমিও এ'বিষয়ে কোন লৌকিক ভদ্রতা দেখানো সঙ্গত মনে করলাম না।

ভারতীয় দূতাবাসের সামনে এসে দরজা দিয়ে ঢুকতেই একটা বিষয় দেখে একটু চমক লাগল। দরজায় একটি নিরস্ত্র প্রহরী বসে ছিল, বোধ হয় জাতিতে সে রুশই হবে; আমরা যখন দরজা দিয়ে ভিতরের আঙ্গিনায় ঢুকতে যাব, তখন সে দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের salute-এর ভঙ্গিতে অভিবাদন জানাল। এটি ভারতে ইংরেজ প্রবর্তিত একটি রীতি; রুশ দেশের কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানেই তা: প্রচলিত দেখতে পাইনি, আর বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ত সেখানে কিছু নেই-ই। মিউজিয়ম কিংবা কোন আপিসের সামনেই দারোয়ান, কিংবা প্রহরী বলে কোন লোক এ'দেশে কোনদিন দেখতে পাইনি সবাই একই পোশাক পরা কর্মচারী। সুতরাং দরজায় এসেই বুঝতে পারলাম, ভারতীয় সমাজের মধ্যে প্রবেশ কচ্ছি।

নিঃসঙ্কোচে ভিতরে প্রবেশ করলাম; ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখা গেল, ইতিমধ্যে অনেকেই এসেছেন। সস্ত্রীক শ্রীবিশ্বজিৎ রায়, শ্রীননী ভৌমিক আরও অনেক বাঙ্গালী এসেছেন; সবাই আমার সঙ্গে আলাপ করে সবাই তাঁদের নিজ নিজ বাড়ীর ঠিকানা ও

টেলিফোন নম্বর জানিয়ে দিলেন, বাঙ্গালী সবারই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। সকলের কাছ থেকেই পরম হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার পেয়ে মনটা প্রসন্ন হলো।

আমার একজন পূর্বপরিচিত অবাঙ্গালী বন্ধুর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ হলো ; তিনি ডক্টর টি. এন. দীক্ষিত। ১৯৬১ সনে উজ্জয়িনীতে অখিল ভারত লোক-সংস্কৃতি সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তারপর থেকে তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীর অধ্যাপনা করছেন। দেশ থেকে পরিবার নিয়ে আসেন নি, নিজে একাই একটা ফ্ল্যাটে থাকেন, নিজের হাতে রান্না করে খান। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে থাকবার জন্য তখনই তিনি আমাকে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু বাঙ্গালী বন্ধুরা কিছুতেই ছাড়তে চান না।

তাঁরা বলেন, ওখানে গিয়ে আপনি নিরামিষ খেয়ে কেন ভুগবেন, আমাদের সঙ্গে থাকলে নিরামিষ আমিষ দুই জুটবে।

এটা আমার পক্ষে একটা খুব বড় যুক্তি ছিল সন্দেহ নেই, তবে তার জন্যই যে আমার ডঃ দীক্ষিতের কাছে যাওয়া হলো না তা নয়। আমি জানি, আগামীকাল সোমবার শ্রীমতী রীমা এসে আমাকে যে জায়গায় রেখে গিয়েছিলেন, সে জায়গায় খোঁজ করবেন ; সেজন্য আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই ফিরে যাব বলে সবাইকে জানালাম।

শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ রায় এবং ননী ভৌমিক স্থির করলেন, আগামী বুধবার পর্যন্ত যদি আমি মস্কোতে থাকি, তবে আমি স্থানীয় লেখক-সঙ্ঘের এক সভায় মিলিত হবো।

অবাঙ্গালী ছাত্র, দূতাবাসের কর্মচারী এবং অন্যান্য আরও অনেকে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তারপর 'কাবুলীওয়ালা' চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হতে লাগল। ভারতীয় কায়দায় দূতাবাসের একটি বড় হলঘরে মেঝের উপর ঢালাও বিছানা করে দেওয়া হলো। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ সবাই তা'তে এক সঙ্গে বসে গেল। একটি মাত্র চেয়ার আনা হলো, সেটি আমার জন্যে।

একজন কে অচেনা লোক চীৎকার করে বলে উঠল, All must sit on the ground ; nobody should be given any chair.

শুনে আবার কে একজন বলে উঠল, No ! He is our guest ; Professor.

আর কোন প্রতিবাদ শুনা গেল না। আমি গম্ভীর ভাবে গিয়ে চেয়ারে বস্‌লাম, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী তাঁদের পত্নীদের নিয়ে মাটিতে বস্‌লেন।

বাংলা 'কাবুলীওয়ালা' ছায়াচিত্র প্রদর্শনী আরম্ভ হোল ; আমার একবার দেখা ছবি, আর একবার দেখতে লাগলাম। ভীড়ের মধ্যে ডাক্তার পাল কোথায় হারিয়ে গেছেন, তাঁকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। একবার দেখা ছবি দেখতে দেখতেও সেখানে বসে একটি নতুন বিষয় লক্ষ্য করলাম। সেখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ২৫০ শত দর্শক উপস্থিত, বাংলা ছবির বাংলা সংলাপ, বাঙ্গালীর জীবন একাগ্র মনে তারা তার ভিতর দিয়ে সবেই গভীর ভাবে যে অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন, তা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। যেখানে হাস্‌বার সেখানে হাসি উচ্ছ্বসিত হয়েছে, যেখানে সংলাপের মধ্যে কারুণ্য প্রকাশ পাচ্ছে, সেখানে সকলের চোখ ছল ছল করে উঠেছে।

বাংলা ভাষার ছায়াচিত্র বলে কেউ কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গেল না, কেউ যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না, তাও বুঝতে পারা গেল না ; 'কাবুলিওয়ালা'র যে একটি কেবলমাত্র শাশ্বত আবেদনের গুণেই তা সম্ভব হয়েছিল, তা নয়। আমার মনে হয়, বাংলা ভাষাও যে পরিমাণে অবাঙ্গালী বুঝতে পারে না বলে ভাণ করে, ভারতবাসীর মধ্যে সে পরিমাণে বাংলা ভাষায় অজ্ঞতা সত্যিই নেই। অবশ্য বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যের জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে। মস্কোতে বসে অবাঙ্গালীদের সঙ্গে বাংলা 'কাবুলিওয়ালা' ছবি দেখে এই কথাটাই আমার বারবার

মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বাংলার সাহিত্য এবং তার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের খুঁটিনাটি নানা আচার-আচরণ আজ যে শুধু ভারতবর্ষে নয়, তার বাইরেও কত ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে, তাও এ থেকে বুঝতে পারা যায়।

ছবি যখন শেষ হলো, তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। এমন সময় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত কাউল এসে উপস্থিত হলেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ রায় আমাকে বল্লেন, আপনি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপ করুন। কেন কাল বিমানবন্দরে আপনাকে আনবার জন্য ভারতীয় দূতাবাস থেকে কেউ হাজির ছিলেন না, সে কথা জিজ্ঞাসা করুন।

আমি দেখলাম, আজ উৎসবের দিন, অভাব-অভিযোগ জানানোর নয়—আমি তাঁকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম।

কিন্তু শ্রীযুক্ত রায় কিছুতেই শুনতে চাইলেন না। বললেন, 'না-না, আপনাকে তাঁর কাছে এ'কথা বল্‌তেই হবে।'

আচ্ছা আমি বল্‌ব। বলে চুপ করে গেলাম।

সভা আরম্ভ হলো। রাষ্ট্রদূত ছাত্রদের সম্বোধন করে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তা'তে বসন্তোৎসবের কথা কিছু নেই। ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার কথা ইংরেজিতে কিছু আলোচনা করলেন। ইংরেজিতে তিনি সুবক্তা এবং রাজনৈতিক সমস্যার জটিল বিষয়ও তিনি সহজ ভাষায় প্রকাশ করে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, আগামী গ্রীষ্মকালে (অর্থাৎ বর্তমান বছরের জুন-জুলাই মাসে) ভারতের রাষ্ট্রপতি সোভিয়েত পরিভ্রমণে আসবেন।

বক্তৃতা শেষ হবার পর উপস্থিত দু'একজন ছাত্র তাঁকে কয়েকটি মৌখিক প্রশ্ন করল। একজন জিজ্ঞেস করল, What will be the effect of Asoke Mehta's joining Congress ?'

তিনি তাঁর একটি জবাব দিলেন। কিন্তু আমার রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান এত অল্প যে, তা দিয়ে তাঁর বক্তব্য বিশেষ কিছুই বুঝে

উঠতে পারলাম না। অশোক মেহ্‌তা যে এতদিন কংগ্রেস দলে ছিলেন না, কিংবা তিনি এতদিন কোন্ দলে ছিলেন, তাও আমি জান্‌তাম না। তাঁর জবাব নিশ্চয়ই খুব যুক্তিযুক্তি হয়েছিল। কিন্তু আমার তা বোঝবার কোন উপায় ছিল না। এই রকম ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কেও কোন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বলে আমার মনে হচ্ছে।

যাই হোক, সভা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবিশ্বজিৎ রায় এসে আবার আমায় বল্‌লেন, আসুন, রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপ করবেন। আপনার কথা তাঁকে বলুন। বলে নিজেই আমাকে নিয়ে রাষ্ট্রদূতের সামনে হাজির করিয়ে দিলেন।

আমি তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম। শুনে তিনি সহাস্যে আমার করমর্দন করে আমি কবে এসেছি জানতে চাইলেন।

আমি বল্লাম, কাল সন্ধ্যেয় মস্কো এসে পৌঁছেচি।

শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ রায় আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিই প্রথম কথাটা তুল্‌লেন, বল্‌লেন, বিমানবন্দরে ভারতীয় দূতবাস থেকে কেউ এঁর জন্য উপস্থিত ছিল না।

আমিও বল্লাম, ভারতীয় দূতাবাসের কাউকে সেখানে পাইনি। সোভিয়েত Ministry of Higher Education-এর পক্ষ থেকে এক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তিনিই নিয়ে আমাকে এক জায়গায় তুলেছেন।

রাষ্ট্রদূত বিস্ময় প্রকাশ কর্‌লেন। বল্‌লেন, এসব বিষয় মিস্টার দাস 'ডিল' করেন। এই বলে তিনি নিজেই মিস্টার দাসের খোঁজ কর্‌তে লাগলেন। মিস্টার দাস এলেন। তিনি বাঙ্গালী নন—একজন পাঞ্জাবী হিন্দু।

তিনি সব শুনে বল্লেন, তাইত, নথিপত্র (file) না দেখে ত আমি কিছুই বল্‌তে পারব না। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি দয়া করে যদি কাল ১টার সময় একবার এম্বেসীতে আসেন, তবে সব বল্‌তে পারব।

মনে মনে বল্লাম, আর বলে কি হবে। আমি তো এখানে এসেই গেছি, এখন কেন বিমান-বন্দরে কেউ উপস্থিত ছিল না, তা জানাও আমার পক্ষে যা, না-জানাও তাই ; বিশেষত যাদের কাছে যাবার তাদেরও সন্ধান পেয়েছি। তবু বল্‌লাম—বেশ, যদি সম্ভব হয়, তবে আসব। কারণ, আমার ত এখানে সব অচেনা। সঙ্গী না হলে চল্‌তে পারি নে। যদি সঙ্গী পাই, নিশ্চয়ই আস্‌ব।

তারপর খাওয়াদাওয়ার পালা আরম্ভ হলো। এক-একটি প্লেটে লুচি, বুটের ডাল, আলুর ডাল্‌না : ডাল আর ডাল্‌নায় ভারতীয় রান্নার স্বাদ পাওয়া গেল। কিন্তু লুচিগুলো দাঁত দিয়ে ছেঁড়া খুব কঠিন বলে মনে হলো। হয়ত খুব বেশীক্ষণ আগে এগুলো ভাজা হয় নি। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে এরই মধ্যে দড়ির মত শক্ত হয়ে গেছে। তবু তাদের সদ্ব্যবহার হতে দেরী হলো না। সবাই হাতে হাতে করে প্লেট নিয়ে খেতে লাগলেন।

ভারতীয় খাদ্যের এই স্বাদটুকু গ্রহণ করবার জন্যে নাকি অনেকেই অনেক দিনে ধরে অপেক্ষা করে ছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে মস্‌লা, সর্ষের তেল ও শিলনোড়া নিয়ে এসে মধ্যে মধ্যে ভারতীয় খাদ্য পরিবেষণের এই ব্যবস্থা প্রায়ই হয়ে থাকে। সর্বভারতীয় জাতীয় খাদ্য বলে ত কিছু নেই ! এই লুচি, আলুরদম ও বুটের ডালের মধ্যে আমি বাঙ্গালীর খাদ্যেরই স্বাদ পেলাম !

মস্কোতে এসেও চোখে দেখলাম বাংলা ছবি ; খাদ্যে পেলাম বাঙ্গালীর খাদ্যের স্বাদ। সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙ্গালীর দান যে আজ কত দিকে বিস্তার লাভ করে চলেছে, তা এখানে অনুভব করলাম। দেশে থেকে তা সবসময় বুঝে উঠতে পারি না। আহারাদির পর সকলের কাছ থেকেই বিদায় নেওয়া হলো। প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালীই তার বাড়ী যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন ; বাড়ীর ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিলেন। স্থির হলো, আগামী বুধবার স্থানীয় লেখকসঙ্ঘের সভায় মিলিত হবার ব্যবস্থা হবে।

শ্রীননী ভৌমিক সে রাত্রেই আমাকে 'ডিনারে'র নিমন্ত্রণ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল্লেন; ডাক্তার শঙ্কর পালও আমার সঙ্গী। তাঁর সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত আমাকে স্বস্থানে পৌঁছুতে হবে।

ওভারকোট ও টুপী নিতে এসে দেখি, সে এক কাণ্ড! যে জায়গায় ওভারকোট রেখেছিলাম, সেখানে পাহাড় প্রমাণ উঁচু হয়ে ওভারকোটের এক স্তূপ পড়ে আছে। তার মধ্য থেকে নিজের ওভারকোট টেনে বার করা এক সমস্যা। নিজের ওভারকোট হলেও সহজেই চিন্‌তে পারতাম; কিন্তু আমারটি পরের কাছ থেকে ধার করা। মাত্র দু'দিন গায় দিয়েছি, সুতরাং ভাল করে এখনও জিনিসটা চেনাই হয় নি।

এদেশে যখনই যেখানে গিয়েছি, ওভারকোট মজুত রাখবার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। একব্যক্তি দায়িত্ব নিয়ে সেটি রাখেন, প্রয়োজন মত তা ফিরিয়ে দেন। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাসে সে রকম কোন ব্যবস্থা নেই। যেখানে খুসী সেখানে সেটি গা থেকে নিজ দায়িত্বে খুলে রাখ, তারপর খুঁজে নাও। অল্পলোকের মধ্যে তার জন্যে কিছু অসুবিধা হয় না; বেশি লোক হলেই সেখানে সমস্যা দেখা দেয়।

আমারও সে সমস্যা দেখা দিল। অনেক খোঁজাখুজির পর একটা গায়ে দিয়ে দেখি সেটা আমার নয়; এদিকে রাত বাড়তে লাগল, সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে দেহ ও মন অবসন্ন, এই অবস্থায় আধ মণ ওজন এক-একটা ওভারকোট টানাটানি করে গায়ে পরে বার বার দেখতে গিয়ে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে ডাক্তার পালের সাহায্যে অনেক কষ্টে নিজের জিনিসটি উদ্ধার করা গেল। ওভারকোটও টুপী পরে শ্রীননী ভৌমিক, ডাক্তার শঙ্কর পাল আর আমি রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

রাত্রি প্রায় দশটা হবে। প্রচণ্ড শীত। ননীবাবু বল্লেন, একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক। সহজেই একটি ট্যাক্সি পাওয়া গেল। নিঃস্তব্ধ মস্কো শহরের জনবিরল পথ ধরে নিঃশব্দে চল্‌লাম।

ননীবাবু বল্লেন, বেশ বড় একটা রেস্তারেঁাতে গিয়ে ওঠা যাক।

ডাক্তার পাল দুপুরে আমাকে একটা সস্তার রেস্তারেঁাতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়েছিলেন। তিনি চুপ করে রইলেন। অবশ্য ইচ্ছা করেই যে তিনি সস্তার রেস্তোরঁাতে গিয়েছিলেন, তা নয়। দৈবাৎ গিয়ে তা'তে পড়্তে হয়েছিল।

একটা বিরাট চৌদ্দতলা বাড়ীর সাম্নে গিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়াল। ট্যাক্সি থেকে তিন জনে নেমে লিফ্‌টে উঠ্‌তে লাগলাম। শুন্‌লাম, সাত তলায় একটি বেশ উঁচু দরের হোটেল আছে। তাতে ঢুকে যথাস্থানে টুপী-ওভারকোট রেখে ভোজকক্ষে পা দিয়ে মনে হল, ইন্দ্রপুরীতে এসে প্রবেশ কর্‌লাম। বিরাট ভোজকক্ষ। আলোয় আলোয় দিনের মত উজ্জ্বল। সে আলোর রঙেরও যেমন অন্ত নেই, তেমনই সংখ্যারও শেষ নেই। ওপর থেকে ছোট-বড় নানা আকারের কাঁচের ঝাড়লণ্ঠন ঝুল্‌ছে। তার মধ্যে নানা রঙের বৈদ্যুতিক আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে শত রঙের স্বপ্নপুরীর মত দেখাচ্ছে। নীচে আগাগোড়া পুরু কার্পেট। দেয়ালের গায়ে বড় বড় আয়নার পাশে বিচিত্র গৃহসজ্জার মূল্যবান্ উপকরণ।

কক্ষের এক পার্শ্বের উচ্চ বেদীর উপর বাদ্যভাণ্ড। তার সাম্নে কক্ষের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নর-নারীর মিলিত যুগ্মনৃত্যের আসর। ছোট-বড় নানা রকম টেবিলের পাশে নানা বয়সী নরনারী ভোজনরত। মধ্যে মধ্যে বাদ্য বেজে উঠছে। মাইকের সাম্নে দাঁড়িয়ে একটি সুকণ্ঠ যুবতী বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে গান ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভোজনের টেবিল ছেড়ে নির্দিষ্ট স্থানে এসে নরনারীরা যুগ্মনৃত্য আরম্ভ করে দিলেন। সুবেশ, সুবেশিনী ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ নরনারীর অভাবনীয় সমাবেশ। মস্কোর এটি নাকি একটি অভিজাত হোটেল। শ্রীযুক্ত ভৌমিক তার কি নাম বলেছিলেন, তা ভুলে গেছি।

যাই হোক, নৃত্যপর নরনারীর মাঝখান দিয়ে কোন রকমে একটি পথ করে নিয়ে আমরা তিনজন একটু এগিয়ে চারদিকে

তাকিয়ে একটি শূন্য এবং নিভৃত টেবিল খুঁজতে লাগ্‌লাম। একজন পরিচারিকা আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে নিজেই আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। যদিও ভোজকক্ষের সেই বিপুল জনতার মাঝখানে কারো দিকে কারো দৃষ্টি দেবার উপায় ছিল না, তবু দেখতে পেলাম, পরিচারিকা আপনা থেকে এসে আমাদের সাহায্য কর্‌তে প্রবৃত্ত হলেন। শ্রী ভৌমিকের সঙ্গেই তাঁর রুশ ভাষায় কথা চল্‌ল। মনে হল, তিনি আমার পরিচয় দিয়ে আমাদের দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে চাইলেন। তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো না। অচিরেই তিনি একটি শূন্য টেবিলের কাছে নিয়ে আমাদের হাজির কর্‌লেন।

এদিকে বাদ্য, নৃত্য ও সঙ্গীত এবং পান-ভোজন তৃপ্ত নরনারীর কলগুঞ্জনে ভোজকক্ষ মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। সুসজ্জিত ভোজ-টেবিলের মাঝখানে নানাজাতীয় ফল পরিপূর্ণ একটি সুবৃহৎ পাত্র সুন্দর শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে সাজান। আমার মনে হলো, এটি দেখ্‌বার জন্য—খাবার জন্য নয়; এখান থেকে একটি ফল তুলে নিলেই তার অখণ্ডতায় আঘাত লাগ্‌বে। এই তুষারময় নিষ্পত্র বৃক্ষলতার দেশে টাট্‌কা সজীব ফলগুলো যেন কেমন বেমানান বলে মনে হচ্ছিল।

পরিচারিকা এসে আমরা কি খাব, না-খাব তার ফর্দ লিখে নিয়ে গেলেন। ননীবাবুই তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তার পর কি পাওয়া যাবে, কি যাবে না, সব শুনে নিয়ে একটা ফর্দ লিখিয়ে দিলেন। আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম, গো-শূকর মাংস আমার চল্‌বে না, তা ছাড়া আর কোন কিছুতেই আপত্তি নেই। তিনি সে রকমই ব্যবস্থা করলেন—আমার জন্য স্বতন্ত্র রকম খাদ্য এল।

এই হোটেলে এসে সোভিয়েত রাশিয়ার ভোগ-জীবনের একটি সমৃদ্ধ রূপ প্রত্যক্ষ করলাম। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি পড়ে মনে হয়েছিল, হয়ত রাশিয়াতে গিয়ে আমাদের মত ভোজন-বিলাসী বাঙ্গালীর একেবারে না খেয়েই থাকৃতে হবে।

কারণ, তিনি তা'তে লিখেছিলেন, 'আহারে, ব্যবহারে, ভ্রমণে এরূপ সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না'। অন্ততঃ এই হোটেলটি দেখে সেকথা মনে হলো না। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সনে রাশিয়া গিয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে রাশিয়া সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। হয়ত সবখানি কাটিয়ে না উঠ্‌লেও যতখানি বাইরে থেকে চোখে পড়ে তার মধ্যে দিয়ে 'নির্ধনতা' আর প্রকট হয়ে উঠতে পারে না। এই ক্রমোন্নতি এদেশে যে কত দ্রুত সাধিত হয়েছে, তা ভাবলেও বিস্মিত হ'তে হয়। অথচ এ কথাও সত্যি যে, তার মাঝখানে আর একটি বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে রাশিয়াকে গুরুতর ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছিল। আজ তারও কোন চিহ্ন বাইরে থেকে লক্ষ্য করা যায় না। সমাজের সাধারণ স্তরে যে অভাব, তা এখনও হয়ত সে দেশে আছে। তবুও আজ পৃথিবীর দু' একটি ভাগ্যবান দেশ ছেড়ে দিলে আর সকল দেশেই অভাব প্রায় সমান।

রবীন্দ্রনাথ মস্কো শহরে 'গ্রাণ্ড হোটেল' নামে যে হোটেলটিতে ছিলেন, সেই হোটেলটির grandeur আরও অনেক বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার সঙ্গে তা আর এখন মেলে না। এখানে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষা করা হয়েছে। রাত্রে হোটেল থেকে ফেরবার পথে শ্রীযুক্ত ভৌমিক আমাকে তা দেখালেন।

তবে এ কথা সত্য, যে-হোটেলের বর্ণনা আমি ওপরে করেছি, তা সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবনের আয়ত্তাধীন হতে পারে না। তবু সেই ভোগ-জীবনের রূপটি সমাজের মধ্যে যে এখন সক্রিয়, তা সমাজের এই সামিত অংশ থেকে বেশ লক্ষ্য করা যায়।

হোটেলে অনেক রুবলের বিল শোধ করে অনেক রাত্রে যে-যার ঘরে ফিরলাম। প্রচণ্ড শীতের রাত্রি, পথ বহুক্ষণ জনশূন্য হয়েছে। ডাক্তার পাল আমাকে নিয়ে মেত্রোতে করে আমার আস্তানায় নিয়ে পৌঁছে দিলেন। যখন বরফের ওপর দিয়ে পায়ে চলার সোজাসুজি হাঁটা পথে ঘরে ফিরলাম, তখন রাত্রি সাড়ে বারোটা। গ্রীষ্মকালেও

এতরাত্রে কোলকাতায় কোনদিন বাড়ী ফিরিনে। অথচ খুব একটা ক্লান্তি ও অবসাদ যে অনুভব করলাম, তা নয়। সেজন্য কেউ যেন একথা মনে না করেন যে, হোটেলে আহারের সঙ্গে আমি কিছু পানও করেছি ; যা পান করেছি, তা 'মিনারেল ওয়াটার' ছাড়া আর কিছুই নয়। তা থেকে প্রত্যক্ষ বুঝতে পারলাম, শীতের দেশের লোক আমাদের গ্রীষ্মের দেশের লোকের চাইতে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে পারে। আমরা যে পরিশ্রমবিমুখ, তা নয়। কিন্তু প্রকৃতি এই বিষয়ে আমাদের বিরোধী।

বিদায় নেবার সময় ডাক্তার পাল বলে গেলেন, আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় কি না বলতে পারিনে। কারণ, কাল সোমবার আটটায় আমি বেরিয়ে যাব। লেবরেটরি থেকে ফিরব রাত্রি এগারটায়। তার আগে আপনার ঘুম ভাঙ্গাতে আসব না। তারপর শিক্ষাদফ্‌তরের লোক এসে নিশ্চয়ই আপনাকে কোন বড় হোটেলে চালান করে দেবে। টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে যাচ্ছি, টেলিফোন করে আপনি কোথায় আছেন জানিয়ে দেবেন। যে ভাবেই হোক সেখানে গিয়েই দেখা করব। বলে তিনি বিদায় নিলেন।

কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম, সবে দরজা পেরিয়ে তিনি বরফে ঢাকা পার্কের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। তারপর পুঞ্জীভূত বরফের ওপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে নিজের হোটেলের দিকে চল্লেন। পথে তখন আর জনমানবের চিহ্ন নেই। এই পরম উপকারী বন্ধুটির সঙ্গে আর হয়তো দেখা হবে না বলেই বুঝি মনটা কেমন করে উঠেছিল।

তারপর কেবল জুতো, টুপী, ওভারকোট ও গরম কোটটা খুলেই লেপ গায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

দেশে থাক্‌তে সকাল ৫টার পর আমি আর কিছুতেই বিছানায় থাকতে পারিনে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যখন আমার সঙ্গে পল্লীসাহিত্য সংগ্রহ করবার জন্যে গ্রামে যায়,

তখন তারা আমার ওপর এই জন্য সব চাইতে বিরক্ত হয়। কিন্তু আমি আমার নিজের অভ্যাস কিছুতেই ছাড়তে পারিনে।

কিন্তু সেদিন আটটা প্রায় বাজে, তখনও বিছানায় শুয়ে এ'পাশ-ও'পাশ করছি। আপাততঃ তিনটা সোয়েটার গায়ে আছে। তার ওপর লেপ ; লেপটা ঠিক আমাদের দেশের লেপের মত আরামপ্রদ নয়। কারণ, তা তুলোর নয় পশমের। তবে বিছানাটির গদী বেশ নরম। কৃত্রিম উপায়ে ঘর সর্বক্ষণ উত্তপ্ত হলেও মনে হলো এস্কিমোদের মত যেন বরফের দেওয়াল দেওয়া ঘরে শুয়ে আছি।

এমন সময় দরজায় ঘা। সহজেই বুঝতে পারলাম, এই ঘা ভারতীয় ঘা,—রুশ কিংবা ঘানার ঘা নয়। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলতেই দেখলাম, অধ্যাপক ভাসানি একেবারে বাইরে যাবার জন্য তৈরী হয়ে এসে হাজির! ডাক্তার পালের সঙ্গে গতকাল কেমন কাট্‌ল জিজ্ঞেস করে তারপর বল্লেন, চলুন আপনাকে প্রাতরাশ করিয়ে নিয়ে আসি। তারপর এসে ঘরে বসে থাকুন, কখন আপনার interpreter আসে! শিক্ষাদপ্তর থেকেও নিশ্চয়ই আজ কেউ এসে আপনার একটা ব্যবস্থা করবে। এখান থেকে অন্য কোথাও চালান করে দেবে।

আমি তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নিতে গেলাম, ফিরে এসে দেখি তিনি নিজেই আমার ঘরটা গুছোচ্ছেন।

জিজ্ঞেস কর্‌লেন, 'ঝাড়ুদারনি' (sweeper) আসেনি?'

আমি বল্লাম, কি জানি? বেরিয়ে ত গেলাম কাল আপনারই সঙ্গে। তারপর ফিরেছি রাত্রি ১২॥ টায়।

বল্লেন, ঘরটা একটু গুছিয়ে দিলাম। হয়ত কেউ একজন পদস্থ লোক আপনার অভ্যর্থনা করতে আসবেন, কিছু মনে কর্‌তে পারেন!

আমি বল্লাম, তাঁদের বাড়ী, তাঁদের ঘর ; তাঁদের মনে করবার কি আছে?—না-না আছে আছে—বলে তিনি নিজেই আরও কিছু গোছগাছ করে, আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আবার জুতো পর্‌তে হলো, টুপী-ওভারকোট চাপাতে হলো।

তিন জোড়া মোজার ওপর জুতো ; তিনখানি সোয়েটারের ওপর গরম কোট, তার ওপর আধমণী ওভারকোট। সুতরাং সারাদিন না খেয়ে ঘরে বসে থাকাও ভাল, তবুও এই সাজ ভাল নয়।

নিরুপায় হয়ে তাই পরে বেরুতে হলো। বরফে ঢাকা পার্ক পার হয়ে বরফে পিছল পথের ওপর দিয়ে সস্তার এক রেস্তারাঁয় গিয়ে প্রাতরাশ সম্পন্ন করা গেল। সস্তার রেস্তোরাঁ বলে খাবার জিনিসের যে অপ্রতুলতা আছে, তা নয়। তবে বৈচিত্র্য নেই।

সেখানে গিয়ে সস্তার রেস্তোরাঁ বা বুফেতে আমার একটি বড় প্রিয় খাদ্যের সন্ধান পেয়েছিলাম, তা দই ; রুশভাষায় তাকে বলে 'কিফির'। হরিণঘাটার দুধের মত শীলমোহর করা বোতলে তা বিক্রি হয়। খাঁটি দুধের তৈরী, দুর্দান্ত শীতের মধ্যেও পরম উপকারী। রাত বারোটার সময়ও সুযোগ পেলে তা খেয়েছি, কোন অনিষ্ট হয় নি। মাখন, রুটি, ডিম, কিফির, কফিতে চমৎকার প্রাতরাশ হয়ে যেত। সেদিনও প্রাতরাশে প্রায় এক সের পরিমাণ 'কিফির' পান করলাম। অধ্যাপক ভাসানিও আমার দধি-প্রীতি দেখে তাজ্জব বনে গেলেন।

বল্লেন, রাশিয়ানরাও ত এত দই খায় না!

আমি বল্লাম—ভারী ভাল জিনিস। সেখানেও অধ্যাপক ভাসানি লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের ও আমার খাবার হাতে করে নিলেন। নিজের পকেট থেকেই দাম দিলেন। এক উঁচু টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনেরই সে খাবার খেতে হলো। কারণ, ঐ রেস্তারোঁতে ঐ ব্যবস্থা।

অধ্যাপক ভাসানিও বিদায় নেবার সময় বল্লেন, নিশ্চয়ই আমি ফিরে এসে আপনাকে এখানে আর পাব না। আমার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর রইল। যেখানেই থাকেন, খবর দেবেন। লেনিনগ্রাদ থেকে ফেরবার পথে নিশ্চয়ই দেখা করবেন।

তিনি বরফের উপর দিয়ে এক কোনাকুনি পথ ধরে মেত্রোর

দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। আমি ঘরে এসে চুপ করে শ্রীমতী রীমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আজ দিনের বেলাতে শীত বেশ তীব্র মনে হচ্ছে। কাল শেষ রাত্রের দিকে কিছু বরফ পড়েছিল। দেখলাম, সাধারণ চলাচলের পথের ওপর থেকে কিছু কিছু বরফ ঝেঁটিয়ে রাস্তার দুধার করে ফেলে রাখা হচ্ছে। ডাক্তার পাল কাল বলেছিলেন, শীগগির আবার ভয়ঙ্কর শীত পড়বে ; তাপমাত্রা শূন্য থেকে কুড়ি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট নীচে নেমে যেতে পারে। তাই খুব আতঙ্কে আতঙ্কে আছি।

দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীমতী রীমা এসে হাজির হলেন। তিনি ব্যস্ততার সঙ্গে ঘরে ঢুকেই জানালেন, সোভিয়েত সরকারের Ministry of Higher Education-এর পক্ষ থেকে একজন পদস্থ কর্মচারী তাঁর দলবল নিয়ে এক্ষুণি আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসছেন।

তিনিও আমার ঘরে বসেই তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। আমিও তাঁদের আসবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রীমা বল্লেন, আপনার খাওয়া হয়েছে ত ?

আমি বল্লাম, হ্যাঁ প্রাতরাশ হয়ে গেছে।

তিনি বল্লেন, ওঁরা আসার পর আপনার মধ্যাহ্ন-ভোজনেরও ব্যবস্থা হবে।

তারপর সময় কাটাবার জন্য তিনি নানা গল্প গুজব করতে লাগলেন।

তিনি বল্লেন, সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে বহু জাতি এবং বহু ভাষা আছে। কিন্তু প্রত্যেক ভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও রুশ ভাষা যাতে কোন দিক থেকে বিকৃত না হতে পারে, বিদ্যালয়গুলোতে গোড়া থেকেই সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চারণ শিক্ষা দেবার জন্য যন্ত্রের সাহায্যও নেওয়া হয়।

তিনি আরো বল্লেন, বিদ্যালয়গুলোর উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত ভাষা শিক্ষার এই ব্যবস্থা আছে। ডন নদীর তীরবর্তী ভাষা কিংবা ইউক্রেনের ভাষা প্রাদেশিক ভাষা। কিন্তু সে অঞ্চলের লোকও যখন রুশ ভাষা শিক্ষা করে, তখন তাদের লেখায় কিংবা উচ্চারণে প্রাদেশিকতার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না। রুশ ভাষার উচ্চারণ-গত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের দ্বারা যাতে বিকৃত না হয়, তার জন্য শিক্ষাবিভাগ সব রকম ব্যবস্থাই করে থাকেন। সাহিত্যের ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করবার জন্য সোভিয়েত দেশ খুব সতর্ক।

বাঙ্গালী যেখানেই যাক, মাছ-দুধের সংবাদটা আগে নেবে। বাঙ্গালীর সংস্কার আমার মধ্যেও এক-একবার বড় সক্রিয় হয়ে উঠে; তাই ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা ছেড়ে রীমাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের দেশের নদ-নদীতে মাছটাছ কেমন পাওয়া যায় ?

তিনি বল্লেন, আমাদের দেশে দুটো নদীই বড়—ডন আর ভল্‌গা। ডন নদী দীর্ঘ, কিন্তু ভল্‌গা নদী খুব গভীর। মস্কোতেও একটা নদী আছে। তার নাম মস্কো নদী। তাতে বিশেষ জল নেই, এখন ত সবই বরফ। সব নদীতেই মাছ কিছু কিছু আছে। তবে কাস্পিয়ান সাগরে মাছ প্রচুর এবং খুব ভালও।

সোভিয়েত দেশে এসে এখনও মাছের স্বাদ পাই নি।

কাস্পিয়ান সাগরের মাছের স্বাদ পাবার আশায় রইলুম। বেলা প্রায় একটা হবে, এমন সময় রুদ্ধ দরজায় মৃদু আঘাত শুন্‌তে পাওয়া গেল। রীমা গিয়ে দরজা খুলেই আমাকে জানালেন, তাঁরা সবাই এসেছেন। আমি এগিয়ে তাঁদের অভিবাদন জানাতে গেলাম।

একজন পুরুষ ঘরে ঢুকেই ইংরেজিতে বল্লেন, 'আমি দোভাষী (interpreter); Ministry of Higher Education-থেকে আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে আমরা এসেছি।'

তারপর একজনের নাম করে বল্লেন, তিনিও এসেছেন। বলতে বলতে এক ব্যক্তি হাস্যমুখে ঘরে ঢুকেই করমর্দনের

জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। চেহারা দেখেই মনে হলো বেশ একজন পদস্থ ব্যক্তিই হবেন। মন্ত্রী না হলেও উপমন্ত্রী শ্রেণীর একজন কেউ। দোভাষী তাঁর নাম এবং পদ দুই-ই বলেছিলেন। কিন্তু দুই-ই এখন আর স্মরণ করতে পাচ্ছিনে। তাঁর প্রশান্ত হাস্যমুখ দেখে আমারও মনটি প্রসন্ন হয়ে গেল। সঙ্গে দোভাষী ছাড়াও তাঁর আরও একজন সহকারী পুরুষ কর্মচারী এসেছেন।

আমরা সবাই আসন গ্রহণ করলাম।

দোভাষীর সাহায্যে তিনি আমাকে প্রথমেই বল্লেন, শনিবার সন্ধ্যায় আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য যে মস্কো বিমান বন্দরে যেতে পারিনি সেজন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা (apologise) কচ্ছি।

আমিও দোভাষীর সহায়তায় বাধা দিয়ে বল্লাম, না-না, সে কি কথা! আপনার প্রেরিত লোক যথা সময়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার সব রকম ব্যবস্থাই তিনি করেছেন, আমার কোন বিষয়েই কোন অসুবিধা হয় নি।

তিনি বল্লেন, তবু আমার কর্তব্য ছিল আমার নিজেরই যাওয়া। সেজন্য আমি খুব দুঃখ বোধ করছি।

তারপর তিনি বল্লেন, লেনিনগ্রাদে আপনার জন্য সবাই অত্যন্ত চিন্তিত (worried)। আজ রাত্রের ট্রেনেই আপনার লেনিনগ্রাদ যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কাল সকাল বেলায়ই আপনি লেনিনগ্রাদ পৌঁছে যাবেন।

তারপর বল্‌তে লাগলেন, লেনিনগ্রাদ বড় সুন্দর শহর। বিদেশ থেকে যাঁরা আসেন, তাঁরা লেনিনগ্রাদ শহরটিকে বেশি পছন্দ করেন, সেখানে গিয়ে আপনার খুব ভাল লাগবে।

আমি বল্লাম, মস্কো শহরে ত আমার বিশেষ কিছুই দেখাশুনা হলো না, আরো কয়েকদিন এখানে থাকতে পারলে মন্দ হতো না।

তিনি বল্লেন, লেনিনগ্রাদে সবাই আপনার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। বার বার টেলিফোন কচ্ছেন। সেখানকার কাজ সেরে ফিরবার

পথে আপনাকে আমরা বাকি সবকিছু দেখাব। আজকে রাত সাড়ে এগারটায় ট্রেন। আজ বাকি দিনটা আপনি মস্কোতে দেখে-শুনে কাটতে পারবেন। একজন দোভাষী আপনার কাছে থাকবে, তারপর রাত্রে এসে আপনাকে একজন লেনিনগ্রাদের গাড়ীতে তুলে দিতে যাবে।

বলে তিনি নিজের গাড়ীতেই আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌তে চাইলেন। যাবার আগে একটা কাগজে সই করিয়ে ত্রিশ রুবল দিলেন। বল্লেন, এগুলো আপনার পথের হাতখরচা। লেনিনগ্রাদ গিয়ে আরও রুবল আপনাকে দেওয়া হবে। আগের পাঁচ রুবল তখনও আমার পকেটেই আছে। শ্রীমতী রীমাকে তা ফিরিয়ে দিলাম। বুঝলাম, তিনি নিজের পকেট থেকেই তা দিয়েছিলেন।

আমি ভাবলাম, ভারতীয় দূতাবাসে একবার গিয়ে, দেখা করে আমার লেনিনগ্রাদ যাবার সংবাদটা জানিয়ে যাই, তা হলে আমার খবর এখানকার বন্ধুরা পেয়ে যাবেন। তাঁর গাড়ীতেই দূতাবাসে এলাম। আমি গাড়ী থেকে নেমে ভিতরে গেলাম; তিনি তাঁর দলবল নিয়ে দূতাবাসের বাইরে পথের ধারে ততক্ষণ গাড়ীতে বসেই আমার অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

দূতাবাসের ভিতরে এসে আগের কথামত শ্রীযুক্ত দাসের খোঁজ করলাম। শুন্‌লাম, তিনি 'লাঞ্চ' কর্‌তে গেছেন।

আমি একজন কর্মচারীকে বল্‌লাম, আমার অপেক্ষা কর্‌বার উপায় নেই। কারণ, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে আমি গাড়ীতে বসিয়ে রেখে এসেছি। বলতে বলতেই দেখলাম, শ্রীযুক্ত দাস এসে হাজির হলেন। তাঁর আপিস ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালেন। তাঁর নথিপত্র অনুসন্ধান কর্‌তে দেরী হতে পারে মনে করে আমিই আমার কাগজপত্র তাঁকে দেখালাম।

তিনি দেখেশুনে বল্লেন, তাইত! আপনি এসে গেছেন দেখছি। আপনি আসবেন সে কথা আমি জান্‌তাম, কিন্তু আপনি যে গত শনিবারেই আস্‌বেন, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ এখনও পাই নি।

আমি আর সেখানে সময় নষ্ট করতে চাইলাম না। বল্লাম, যাক্‌গে, যখন ঠিকমত পৌঁছেই গেছি, তখন আর এসব নিয়ে ভেবে কি হবে! এই বলে আমার লেনিনগ্রাদ যাওয়ার কথা, ত্রিশ রুবল নগদ পাওয়ার কথা তাঁকে জানালাম।

তিনি বল্লেন, এই টাকাটা আপনার লেনিনগ্রাদ যাওয়ার পথে ধূমপান করবার জন্য দেওয়া হয়েছে, হোটেল খরচ আলাদা করে ওরাই শোধ করবেন।

ত্রিশ রুবল, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে দেড়শ টাকায় শুধু ধূমপান কর্‌লে তাতে খাণ্ডবদহনের ধূম উদ্গীরণ হবে। সুতরাং অন্য কিছু পান করার উদ্দেশ্য না থাক্‌লে এতগুলো রুবল্ দেবার কোন অর্থ হয় না। সবগুলো রুবলই আমার পকেটে রয়ে গেল। ভাবলুম লেনিনগ্রাদ পৌঁছেই একটা ভাল দেখে টুপী কিন্‌তে হবে। মস্কোতে হয়ত তার আর সময় পাওয়া যাবে না। ধূমপান অপেক্ষা আমার টুপীর প্রয়োজন অনেক বেশি; এখনও monkey-cap-টাই ভাঁজ করে পরে আছি। এখন তা অনেকটা সয়ে গেছে।

সেখানে আর বেশিক্ষণ দেরী কর্‌লাম না। শ্রীদাসকে বলে এলাম, কেউ আমার খোঁজ কর্‌লে বলবেন, আমি আজ রাত্রেই লেনিনগ্রাদ চলে গেছি। ফেরবার পথে মস্কো হয়ে যেতেই হবে, তখন আবার সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

তাড়াতাড়ি গাড়ীতে এসে বসলাম; কথা হলো শ্রীমতী রীমা আমার সঙ্গে থাক্‌বেন; একটা হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে যতক্ষণ সময় পাই, কয়েকটি মিউজিয়াম দেখাবেন। তারপর সন্ধ্যায় তিনি আমাকে নিয়ে আমি যে জায়গায় উঠেছি, সেখানে পৌঁছে দেবেন। রাত্রে উচ্চশিক্ষা বিভাগের একজন কর্মচারী রেলের টিকিট ও রিজার্ভেসন নিয়ে এসে আমাকে নৈশভোজন শেষ করিয়ে লেনিনগ্রাদের ট্রেণে তুলে দিয়ে আসবেন।

একটি বড় রেস্তোরাঁর সাম্‌নে আমাকে আর রীমাকে নামিয়ে দিয়ে শিক্ষা-বিভাগের প্রতিনিধি আমাকে বিদায় জানালেন, তারপর

তাঁর দলবল নিয়ে গাড়ীতে চলে গেলেন। আমরা রেস্তোরাঁয় ঢুকতে যাচ্ছি, দেখ্‌তে পেলাম, দরজায় লেখা আছে 'রেস্তোরাঁ বন্ধ'। রীমা ঘড়িতে দেখ্‌লেন, দুটো বেজে গেছে, দুটোর পর বড় রেস্তোরাঁ-গুলো বন্ধ হয়ে যায়; সন্ধ্যার আগে আর খোলা হয় না। ক্ষিদেও তখন পেটের মধ্যে প্রচণ্ড অগ্নিদাহ সৃষ্টি করেছে। এখন উপায়? রীমা আর একটা ট্যাক্সি ডাকলেন, তাঁর পরিচিত আর আর একটা বড় রেস্তোরাঁর দ্বারে এসে পৌঁছানো গেল; কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। এই সময়টায় বড় রেস্তোরাঁগুলো সবই বন্ধ হয়ে যায়, কেবল কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন ছোট ছোট বুফেগুলো কখনো কখনো খোলা থাকে, তা'তে সাধারণ খাদ্যই পাওয়া যায়।

অতঃপর শ্রীমতী রীমা আর একটি ট্যাক্সি করে আমাকে নিয়ে একটি মিউজিয়মের দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন। ভাবলেন, মিউজিয়ামের মধ্যে অনেক সময় যে ছোট রেস্তারেঁা বা বুফে থাকে, তা'তেই অগত্যা মধ্যাহ্নভোজন শেষ করবেন। কিন্তু সেদিন সোমবার, মিউজিয়াম বন্ধ। মস্কোর গলিতে গলিতে ছোটবড় অগণিত মিউজিয়ম, সেগুলো সবই একই দিন বন্ধ থাকে না; পরে লেনিনগ্রাদে গিয়েও দেখেছি তাই, সব মিউজিয়ামই যে এক দিন বন্ধ থাকে, তা নয়; সপ্তাহের মধ্যে এক-একদিন এক-একটি বন্ধ থাকে; সেইজন্য আগে থেকে না জেনে বেরুলে অনেক মিউজিয়মই বন্ধ দেখে ফিরে আসতে হয়।

তবে অনেক সময় আগে থেকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিলে যেদিন মিউজিয়ম সাধারণের জন্য বন্ধ থাকে, সেদিনও বিশিষ্ট বিদেশী কোন অতিথি এলে তাঁকে তা দেখানোর সুবিধা করে দেওয়া হয়। পরে আমার সম্পর্কে দু'একবার এম্‌নিই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন আগে থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয় নি বলে মিউজিয়মের দ্বারদেশ থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হোল।

এবার শ্রীমতী রীমা আমাকে নিয়ে আর একটি বড় মিউজিয়মে এসে হাজির হলেন। তা প্রধানতঃ একটি চিত্রসংগ্রহশালা।

নাম Museum of Fine Arts after Puskin (Musee Ponchikine Des Beaux-Arts)। ভিতরে ঢুকে প্রথম কর্তব্য হোল, ওভারকোট ও টুপী জমা রাখা, তারপর অন্য কাজ। এত ভীড় যে ওভারকোট জমা রাখবার জায়গাতেও লাইনে দাঁড়াতে হলো।

এখন দেখে দেখে লাইনে দাঁড়াতে নিজেরও কোন আর সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে না। রীমার সঙ্গে আমিও লাইনে দাঁড়ালাম। ওভারকোট জমা দেওয়ার কাজ হয়ে গেলে শ্রীমতী রীমা তাঁর হাত-ব্যাগ থেকে একটি চিরুণী বার করে চুলগুলো আঁচড়ে ঠিকঠাক করে নিলেন। সাম্‌নেও একটা মস্ত আয়না রয়েছে ; মাথার টুপী খুল্‌লেই চুলগুলো যে উস্কোখুস্কো হয়ে যাচ্ছে, তা আবার আঁচড়ে ঠিক ঠাক করে নেবার জন্যই আয়না রেখে দেওয়া হয়। মেয়েরা সবাই চুল ঠিক করে নেয়।

শ্রীমতী রীমা দেখলাম, তাঁর ব্যাগ থেকে একটি রুজ ও লিপ্‌স্টিক বার করে আমাকে আড়াল দিয়ে সামান্য প্রসাধন কর্মও করে নিলেন। আমি যদিও সবই লক্ষ্য করছিলাম, তবুও এমন ভাব করে দাঁড়িয়ে রইলাম যে, আমি যেন তার কিছুই দেখ্‌তে পাই নি।

রুশ দেশের মেয়েরা যে খুব প্রসাধন-বিলাসিনী তা কোথাও মনে হয় নি ; তার কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ মনে কর্‌তে পারেন যে, প্রসাধন-সামগ্রী সেখানে অত্যন্ত দুর্মূ্ল্য এবং দুষ্প্রাপ্য ; তাই তারা এ পথে বিশেষ এগোয় না ; কিন্তু তা সত্যি নয়। এই বিষয়ে কেমন যেন একটা নিস্পৃহ ভাব তাদের মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি। তবে মাথার টুপী খুলে রাখবার পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ঠিক্‌ঠাক করে নেওয়া কিংবা সামান্য দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, এগুলোকে বিলাসিতা বলা যায় না, তা রুচি। তবু বয়স্কা কিংবা বিবাহিতা মেয়েদের তাও বড় একটা কর্‌তে দেখা যায় না। প্রসাধনের অভ্যাসটা ও-দেশের মেয়েদের মধ্যে আমাদের দেশের চাইতেও যে কম, তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।

একজন পুরুষের সাম্‌নেই যে শ্রীমতী রীমাকে এই সামান্য প্রসাধন-ক্রিয়াটিও করে নিতে হলো, সে জন্যে তিনি যে বেশ সঙ্কুচিত তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম, যেন এই কাজটুকু না কর্‌লেই তাঁর ভাল লাগ্‌তো; এই ভাবটি তার মধ্যে গোপন রইল না।

বিরাট সংগ্রহশালাটির ভিতরে একটি ছোট রেস্তোঁরা ছিল। শ্রীমতী রীমা প্রথমেই আমাকে নিয়ে সেখানে গেলেন। বিশেষ একটা কিছু ভীড় ছিল না, দু'জনেই একরকম করে মধ্যাহ্ন আহার শেষ করে সংগ্রহশালা দেখতে লাগলাম।

ইউরোপের সমস্ত দেশের, বিশেষতঃ ফ্রান্স, ডেনমার্ক, স্পেন, জার্মানি প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রাবলীর তা বিপুল সংগ্রহ; তার সঙ্গে মিশরের পুরাকীর্তির নানা উপকরণ, যেমন মমী ইত্যাদিও ছিল। প্রাচীন গ্রীক্ ভাস্কর্যের বহু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সেখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আমাদের দেশে মিউজিয়মের নাম যাদুঘর বা আজব ঘর; সেইজন্য 'যাদু' বা 'আজব' জিনিস দেখবার প্রত্যাশায় সেখানে দলে দলে সাধারণ নিরক্ষর স্তরের মানুষ, বিশেষতঃ কোলকাতায় নতুন আগত কালীঘাট ও চিড়িয়াখানার যাত্রীরাই ভীড় করে থাকে; কিন্তু সেখানে তা নয়। সেখানে ভীড় যথেষ্ট, কিন্তু সাধারণ স্তরের লোকের ভীড় নয়; প্রধান ভীড় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপয়িত্রীর। এক-একজন শিক্ষক কিংবা শিক্ষয়িত্রী দলে দলে ছাত্রছাত্রী নিয়ে সেখানে এসে হাজির হতেন; তারপর তিনি যে সব জিনিসই দেখে এবং সবাইকে দেখিয়ে বেড়াতেন, তা নয়; মনে হলো, তিনি যে বিশেষ জিনিসটি যখন ক্লাসে পড়াতেন, সেই বিষয়টিই ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ করানোর জন্য সংগ্রহশালায় নিয়ে আস্‌তেন। এক-একটি ছাত্রছাত্রীর দল তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে উদ্দিষ্ট বস্তুটির সাম্‌নে চুপ করে দাঁড়ায়, শিক্ষক কিংবা শিক্ষয়িত্রী জিনিসটি দেখিয়ে দেখিয়ে তা ব্যাখ্যা করতে থাকেন। আগেই বলেছি, এটি চিত্র-

সংগ্রহশালা; বিশেষতঃ চিত্রকলার ছাত্র-ছাত্রীরাই সেখানে এসে থাকে।

আমিও একটি দলের পেছনে চুপ করে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, একজন যুবা বয়স্ক শিক্ষক একটি চিত্র তার ছাত্র-ছাত্রীদের সাম্‌নে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন; শিক্ষক কি বল্‌ছেন, তা আমি শ্রীমতী রীমাকে ইংরাজি করে বুঝিয়ে দিতে বল্লাম। তাঁর কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম, চিত্রবিদ্যার এক দুরূহ আঙ্গিক নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন; বিষয়টি আমার কাছেও সহজবোধ্য বলে মনে হলো না; অথচ কুড়ি বছরের নীচেকার বয়সী ছেলেমেয়েরা চুপ করে দাঁড়িয়ে মনোযোগের সঙ্গে তা শুনে যাচ্ছে। কোন কোন সময় দেখা যায়, কেবলমাত্র একটি বিষয় নিয়েই যে তাদের আলোচনা চলে, তা নয়, একের পর অন্য বিষয় দেখে তারা অগ্রসর হতে থাকে; কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর নির্দেশেই তারা চলে, নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে না।

রীমা খুঁটিনাটি করে সকল দেশের ছবিই আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। দেখে মনে হোল, তিনিও একজন চিত্রশিল্পী এবং এই বিষয়ে তিনি যে কেবলমাত্র তার নিজের মামুলি দায়িত্ব পালন করে চলেছেন, তা নয়—তার এ বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ আছে। আমাকে বল্লেন, তাঁর রিয়ালিস্ট আর্ট ভাল লাগে, আমার লাগে কি না আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বল্লাম—না, আমার রিয়ালিস্ট আর্ট মোটেই ভালো লাগে না। আমাদের দেশে রিয়ালিস্ট আর্টের আদর নেই। যদি বলতাম, আমার রিয়ালিস্ট আর্ট ভাল লাগে, তবে সহজেই রক্ষা পেতাম; কিন্তু আমি কি আর জানি? তিনি আমাকে দীর্ঘ ভূমিকা করে রিয়ালিষ্ট আর্টের মহত্ত্ব বুঝাতে লাগ্‌লেন, তারপর আমাকে নিয়ে রিয়ালিস্ট আর্টের বিশিষ্ট নিদর্শন-গুলো দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। এ ভাবে একতলা থেকে দোতলা, এ-ঘর থেকে ওঘর করে বেড়াতে লাগ্‌লাম। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম; কিন্তু তাঁর ক্লান্তি নেই, প্রত্যেক দেশেরই

রিয়ালিস্ট আর্টের বিশিষ্ট নিদর্শনগুলোর বিশেষত্ব, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের বিবরণ আমাকে না বুঝিয়ে ছাড়বেন না!

আমি চিত্র-রসিক নই. একদিন ছায়াচিত্রের রসিক ছিলাম, আজ সময়াভাবে তারও চর্চা বন্ধ হয়ে গেছে। চিত্রেরও যে এত রকম বিভাগ আছে, রিয়ালিস্ট স্কুলই বা কি, ইম্প্রেসনিস্ট স্কুলই বা কি, তা আমি কোনদিন জানি নে, একটা মুখের কথা হিসেবে বলেছিলাম —রিয়ালিস্ট স্কুল আমার ভাল লাগে না; কিন্তু তা'তে যে এই বিপদ ঘট্‌বে তা কে জান্‌ত?

তিনি এক একটি কক্ষে গিয়ে সেই কক্ষের তত্ত্বাবধায়িকার নিকট আমার পরিচয় দিতেন এবং আমার যে রিয়ালিস্ট আর্ট ভাল লাগে না, তাও বলতেন। তার ফলে সেই তত্ত্বাবধায়িকাও আমাকে রিয়ালিষ্ট আর্ট বোঝাতে চেষ্টা করতেন। কখনও ঘরের বিশেষ কোন আলো জ্বালিয়ে দিয়ে কিংবা বিশেষ কোন আলো নিভিয়ে দিয়ে বিশেষ জায়গা থেকে বিশেষ কোন কোন ছবির আলো-ছায়ার খেলা বিশেষ ভাবে দেখতে বলতেন। এইভাবে ছবির পর ছবি দেখে তাঁর নির্দেশিত পথে সুসজ্জিত চিত্রগৃহটির কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বিরাট চিত্রগুলো দেখবারই মত; কিন্তু তাদের ভিতরে যে এত কথা লুকিয়ে থাকতে পারে তা কোনদিন ভেবেও দেখিনি।

চিত্রশালা বন্ধ হবার প্রায় সময় হয়ে এলো। আমার পা আর চলছিল না। বুঝতে পারলাম, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রীমা আমাকে রিয়ালিস্ট আর্টের মহত্ত্ব বুঝিয়ে তবে ছাড়বেন। নিজে পুরুষ হয়ে আমার চাইতে কম বয়সের একটি মহিলার কাছে নিজের ক্লান্তি ও অবসাদের কথা কিছুই বলতে সাহস পেলাম না, মুখে জোর করে একটা প্রফুল্লতার ভাব টেনে এনে তাঁকে অনুসরণ করে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম; ক্লান্তির মধ্যেও মুখে প্রসন্নতার ভাবটি দূর হয়ে যেতে পারেনি।

এবার বাইরে বেরুবার পালা। টুপী-ওভারকোট ফিরিয়ে নিয়ে

বাইরে এসে দাঁড়ালাম। শীতের সন্ধ্যা আসন্ন হয়ে এসেছে, বরফের উপর দিয়ে কোন রকমে পা টিপে টিপে চলেছি। আমার পিছ্‌লে পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে ভেবে রীমা আমাকে ধরে ধরে নিয়ে চলেছেন; তাঁর নিঃসঙ্কোচ ভাব, কিন্তু আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল। কয়েকবার পিছলে পড়ে পড়ে এ'কথাও বুঝতে পেরেছিলাম, এ ছাড়া আমার উপায়ও নেই।

রীমা আমাকে নিয়ে একটা মেত্রোর স্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন। এ বিষয়ে আগের দিনই কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে; সুতরাং আর নতুন কোন ঔৎসুক্য দেখালাম না। যথারীতি দরজার কাছে নির্দিষ্ট স্থানে পাঁচ কোপেকের একটি মুদ্রা ফেলে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু চলন্ত সিঁড়িতে যেমনি পা দিলাম, অমনি একটা হ্যাচকা টান লেগে পড়বার মত অবস্থা হলো। রীমা শক্ত করে আমার হাত ধরে ফেল্লেন এবং সেই ভাবেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম। এই ভাবে যখন মেত্রোয় উঠে বালটিস্কি লেনের আমার বাসস্থানে এসে পৌঁছুলাম, তখন রাত্রি প্রায় ৮॥ টা। লেনিনগ্রাদ রওয়ানা হতে আর মাত্র দু'ঘণ্টা বাকি।

রীমা বল্লেন, এ'বার আমি আপানার কাছ থেকে বিদায় নেব। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে স্টেসনে পৌঁছে দেবার জন্য লোক আসবে। সেই আপনার রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। খেয়ে দেয়ে ট্রেণে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন, কাল সকালেই লেনিনগ্রাদ পৌঁছে যাবেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে আপনার সঙ্গে কি আর আমার দেখা হবে না?

তিনি বল্লেন, যদি লেনিনগ্রাদ থেকে ফিরবার পথে মস্কোতে এসে আমার খোঁজ করেন, তবে নিশ্চয়ই দেখা হবে। তখন আপনি কোথায় এসে উঠবেন, তা ত' আমি জানতে পারব না।

আমি বল্লাম, আচ্ছা আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যান, যদি সম্ভব হয়, নিশ্চয়ই আমি আপনার খোঁজ করব। বিমান-বন্দর থেকে নিয়ে

আসা অবধি আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি আমায় যে সাহায্য করেছেন, তার কথা আমি কোনদিন ভুলব না।

তিনি বল্লেন, না, এমন আর কি করতে পেরেছি। বলে নিজের ঠিকানাটি আমার নোট বইয়ে লিখে দিলেন। আর কিছু বল্লেন না, বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলাম, তিনি বেরিয়ে যেতেই বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় খট্ খট্ শব্দ। উঠে দরজা খুলে দিতেই একজন সৌম্যদর্শন যুবক ইংরেজিতে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, আমি আপনাকে লেনিনগ্রাদের গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছি। রিজার্ভেসন হয়ে গেছে, আপনার রাত্রের খাওয়া হলেই আমরা স্টেসনে রওয়ানা হতে পারি।

ইংরেজি তিনি যে শুধু মুখেই বলছেন তা নয়, যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে বলতে চাইছেন। কারণ, ইংরেজি জ্ঞান তাঁর নিতান্ত অপরিণত। সেই অভাব তিনি তার অঙ্গ দিয়ে পূর্ণ করতে চান। যাই হোক, তাঁর বক্তব্য আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হলো না।

ঘরে এসে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অঙ্কের একজন ছাত্র। ইংরেজিও শিখ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পড়বার সময় মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু উপার্জন করে। তিনি সম্প্রতি একটি অস্থায়ী চাকুরিতে যোগ দিয়ে কিছু উপার্জন করছেন। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে তিনি একটি অস্থায়ী কেরানীর পদে এখন কাজ কর্চ্ছেন, সেখান থেকেই আমাকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য আদিষ্ট হয়ে এসেছেন। কথাবার্তায় তাঁর একটি প্রফুল্ল ভাব আমাকে সহজেই মুগ্ধ করল।

তিনি বল্লেন, চলুন, রেস্তোরাঁটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, আপনার রাত্রের খাবারটা সেরে নিন, তারপর একেবারে ট্রেণে উঠে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়্বেন।

আবার ওভারকোট-টুপী পর্তে হলো। কারণ, পার্ক পার হয়ে

বাইরের একটা রেস্তোরাঁতে যেতে হবে। যথারীতি বেরিয়ে পড়্লাম। গিয়ে দেখি রেস্তোরাঁ প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে; তবু বেশ ভীড়। তিনি আমাকে একটা চেয়ারে বস্তে বলে নিজেই লাইনে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি দু'রুবল তার হাতে দিতে গেলাম, কিছুতেই তিনি নিতে চাইলেন না। এখানে এই এক বিপদ দেখ্তে পাচ্ছি, কেউ কিছু আমার কাছ থেকে নিতে চাইবে না, মাথার দিব্য দিলেও নয়; এমন কি, এই যে একটি ছাত্র, সেও বিষয়টা গ্রাহ্যের মধ্যেও আন্‌ল না, অথচ আমি রুবলগুলো দিয়ে কি করব, তাও বুঝতে পারলুম না, দেশের বাইরে এগুলো নিয়ে যাবার নিয়মও নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি তিনি দুই হাতে যত খাদ্য ধরে প্লেটে প্লেটে, গ্লাসে গ্লাসে এবং প্যাকেটে প্যাকেটে ভর্তি করে এনে হাস্যমুখে আমার সামনে রাখ্লেন। বল্‌লাম, এ কি কাণ্ড! এত জিনিস খাবে কে?

তিনি বল্লেন, আপনি খাবেন, আমি রাত্রের খাবার শেষ করে এসেছি।

আমি বল্লাম—না, আমি সব পারব না, আপনাকেও খেতে হবে!

তিনি আমাকে প্রত্যেকটি খাদ্যের উপকারিতা সম্পর্কে বোঝাতে লাগ্লেন। রুটি, মাখন, চীজ, ক্রীম, কেক, সিদ্ধ ডিম, আরও কি সব নাম জানিনে। সবাই ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগ্‌ল। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর পরিচারিকারা ঘরে ফিরবে, অথচ আমরা উঠ্ছি না, গল্পে আর খাওয়ায় মসগুল হয়ে আছি; আমাদের দিকে তারা অসহিষ্ণু হয়ে বারবার তাকাচ্ছে, তা বুঝতে পাচ্ছি; কিন্তু মুখে কিছুই বল্ছে না।

ভোজন শেষ করে বেরুবার সময় তিনি আবার কতগুলো বড় বড় কেক্ কিনে নিয়ে নিজের ওভারকোটের পকেটে পুরে রাখ্লেন; ভাবলাম এগুলো উনি নিজেই হয়ত এক সময় খাবেন।

আবার ঘরে ফিরে এ'লাম। জিনিসপত্র আগে থেকেই বাঁধা-ছাদা ছিল, উনি বল্লেন, এ'বার ট্যাক্সি নিয়ে আসি। আমি বল্লাম, নিয়ে আসুন, আমি তৈরীই আছি! তিনি আবার ওভারকোট পরে বাইরে বেরিয়ে গেলেন; একটু পরেই ফিরে এসে বল্লেন— চলুন, ট্যাক্সি এসেছে। বলে নিজেই আমার বিরাট সুটকেস্‌টা টেনে কাঁধে করে নিয়ে চল্লেন।

বাইরের আঙিনায় বরফের স্তূপের মাঝখান দিয়ে সরু একখানি পায়ে চলার পথ, তাও বরফে ঢাকা, তার উপর দিয়ে গিয়ে পার্কের ধারে পথের উপর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। আমি তার পিছু পিছু গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠ্‌লাম। যাবার সময় অধ্যাপক ভাসানির জন্যে একখানি চিঠি দরজার ডাক বাক্সে ফেলে রেখে গেলাম। ভারতীয় বন্ধুদের কারো সঙ্গে দেখা হলো না।

তারপর আমার বিরাট সুটকেসটা ছাত্রটি ট্যাক্সিতে নিয়ে তুল্‌লেন। আমাকে ছুঁতেও দিলেন না। স্টেসন খুব দূরে ছিল না, অল্পক্ষণেই স্টেসনে এসে পৌঁছানো গেল। স্টেসনে 'কুলি' নেই, কোন স্টেসনেই থাকে না, তিনি নিজেই সুটকেসটা টেনে নামালেন, তারপর একরকম কাঁধে করেই নিয়ে বিশ্রামাগারের দিকে চল্‌লেন। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী নেই; সুতরাং একই বিশ্রাম-ঘর। অনেক স্ত্রী-পুরুষ বসে বসে ট্রেণের জন্যে অপেক্ষা কচ্ছেন, প্রায় প্রত্যেকের হাতেই একটা-তুটো বড় ব্যাগ, তাতে নিজেদের জিনিসপত্র নিজেরাই বয়ে নিয়ে চলেছেন। রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা, বাইরে প্রচণ্ড শীত, বিশ্রামাগারের একটি দিক খোলা, সেজন্য সেখানেও শীতের প্রকোপ কিছু কম নয়। তিনি আমাকে বিশ্রামাগারে বসিয়ে রেখে সুটকেসটি সেখানেই রেখে ট্রেণের খোঁজ কর্‌তে গেলেন।

মধ্য রাত্রি আসন্ন, তখনও বিশ্রামাগারে বহু:যাত্রীর ভীড়। তবু সবারই বস্‌বার জায়গা আছে; কয়েকজন মনে হলো রেলকর্মচারী, তাদের 'ইউনিফরম্' পরেই বসে বসে নিদ্রাসুখ উপভোগ কচ্ছেন।

সুবেশ এবং সুদর্শন একজন পুলিশ কর্মচারী বলেই মনে হলো, তিনি এসে সেখানে এদিক-সেদিক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন, তারপর নিদ্রিত রেলকর্মচারী কয়টির সাম্‌নে এসে গভীরভাবে তাদেরে নিরীক্ষণ করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকে কিছু না বলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মাইক্রোফোনে ট্রেণ ছাড়বার সময় ঘোষণা করা হলো, তাই শুনে এক একদল যাত্রী নিজেরাই তাদের জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে ট্রেণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল, লেনিনগ্রাদে যাবার গাড়ীর বিষয়ও ঘোষণা করা হলো, রুশ ভাষার পর ইংরেজি ভাষাতেও ঘোষণাটি প্রচার করা হলো। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে রুশ ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা শুন্‌তে পাইনি।

যুবকটি এসে বল্লেন—চলুন, আপনার ট্রেণ দাঁড়িয়ে আছে। এক নম্বর প্লাটফরম থেকে আপনার ট্রেণ ছাড়বে।

বলে নিজেই আমার স্যুট্‌কেস্‌টি টেনে কাঁধে তুলে নিয়ে প্লাটফরমের দিকে যেতে লাগলেন। আমার আশঙ্কা তখনও দূর হয় না; জিজ্ঞেস করলাম, বার্থ রিজার্ভেসন পেয়েছেন ত? রাত্রে ঘুম না হলে বাঁচ্‌ব না।

কারণ, আমি বুঝেই উঠ্‌তে পারলুম না, এক দিনের মধ্যেই কি করে রিজার্ভেসন পাওয়া যেতে পারে? বুঝি বা একটা বাজে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমার রাত্রের ঘুম মাটি করে দেবে! যুবকটির মুখে হাসি সর্বদা লেগেই ছিল, এতবড় বোঝাটি ঘাড়ে নিয়েও তার মুখের হাসিটি বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছেন।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, এইত এসে গেছি, এখুনি দেখ্‌তে পাবেন। বলে একটা কামরার দরজায় গিয়ে স্যুটকেসটা নামালেন। কামরার দরজায় একজন রেলকর্মচারী দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার হাতে টিকিটটি তুলে দিলেন, তিনি ভিতরে ঢুকবার ইঙ্গিত কল্লেন। বুঝতে পারলুম, ঐ কামরাতেই আমার বার্থ

রিজার্ভেসন হয়েছে। কামরার ভিতরে ঢুকে সাজসজ্জা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। উঠ্‌তেই একটি করিডরের মত, আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর গাড়ীগুলোর মতই অনেকটা, কিন্তু কামরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আগাগোড়া লাল কার্পেটে মোড়া। জানালায় পুরু কাঁচ, কাঁচের ভিতরের দিকে সুন্দর পর্দা, সুপরিচ্ছন্ন বারান্দার এক পাশে এক-একটি কেবিন, তা'তে উপরে নীচে চারটি বার্থ, প্রত্যেক কেবিনের ভিতর কার্পেট মোড়া, কাঁচের জানালায় কুচি দেওয়া পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড়ের পর্দা ঝুলানো। প্রতিটি বার্থে গদি আঁটা বিছানা; তার উপর পরিষ্কার চাদর দিয়ে ঢাকা, একটি চাদর ভাঁজ করা; তারপর লেপ, বালিশ—শিয়রে ছোট টেবিল, তা'তে সুন্দর কাঁচের ঢাকনা দেওয়া টেবিল-আলো, প্রত্যেকটি বার্থের এদিকে-সেদিকে ওভার-কোট ও কোট টাঙ্গানোর হুক্। কৃত্রিম তাপ সৃষ্টি করে শীত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, ভিতরটি বেশ আরামপ্রদ।

যুবকটি আমার ওভারকোটটি খুলে নিয়ে একটা হুকে টানিয়ে দিলেন। নীচের একটি বার্থই পেয়ে গেলাম দেখছি; পাশের বার্থটিতে একজন বয়স্ক ব্যক্তি বাইরের পোশাক ছেড়ে শোবার পোশাক পরে আমার দিক থেকে তার আলোটিকে আড়াল করে নিয়ে শুয়ে শুয়ে রুশ খবরের কাগজ পড়্‌ছিলেন। আমার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝ্‌তে পেরেছেন, আমি বিদেশী এবং আমার সঙ্গে তার ভাষার অনতিক্রম্য ব্যবধান আছে। তিনি নীরবে খবরের কাগজ পড়ে যেতে লাগ্‌লেন, উপরের বার্থ দুটি যারা দখল করে আছেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই তাঁদের শিয়রের আলো নিভিয়ে দিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাঁদের মুখদর্শন হলো না।

যুবকটি বল্লেন, আপনি বসুন, আমি দেখে আসি গাড়ীতে ইংরেজি-জানা কোনো যাত্রী আছে কিনা; ভোর বেলা লেনিনগ্রাদে গাড়ী পৌঁছবে, তার আগে থেকে যাতে আপনাকে নামবার জন্য

তৈরী হতে বল্‌তে পারে। কারণ, এ' ট্রেণ হয়ত লেনিনগ্রাদ ছাড়িয়ে হেলসিঙ্কি পর্যন্ত যেতে পারে।

হেলসিঙ্কি ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী। কিছুক্ষণ পর তিনি এসে বল্লেন, আপনার তিনটে কেবিন পরই দুজন সিংহলী যাত্রী আছে, তারা ইংরেজি জানে, তারা আপনাকে লেনিনগ্রাদ স্টেসনে ডেকে দেবে। আমি উঠে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করে এলাম।

বল্লাম, যদি ঘুমিয়ে পড়ি, একটু ডেকে দেবেন, লেনিনগ্রাদ স্টেসনে লোক থাকবার কথা, কি জানি তারা যদি সময় মত এসে পৌঁছুতে না পারে, তবে একটু সাহায্য কর্‌বেন।

তারা প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু সেই পর্যন্তই; শেষ পর্যন্ত আমারই ঘুম ভেঙ্গে গেল, লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত তাঁদের আর টিকি দেখতে পাওয়া গেল না; বোধ হয়, তাঁদেরই ডেকে দেবার প্রয়োজন হয়েছিল; আমার কোন প্রয়োজন হয় নি।

এই কামরার জন্য একজন Conductor-guard যিনি ছিলেন, যুবকটি বার বার করে তাঁকে আমার পরিচয় দিয়ে আমার কোন অসুবিধা না হয়. তার দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে বল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, আমার অসুবিধা ত ভাষা, তিনি আমার উপকার করবার জন্য কিছু বল্‌তে চাইলেও ত আমি তার কিছুই বুঝতে পারব না। তবু যুবকটি ব্যস্ত হয়ে একে-তাঁকে আমাকে দেখবার জন্য বারবার করে অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন, বুঝতে পারলাম। এ'দেশে ইঞ্জিনের বাঁশী বাজতে শুনিনি, বোধ হয় বাজেনা, পাঁচ মিনিট আগে সতর্কতাসূচক ঘণ্টা, ছাড়বার সময় ঢং ঢং করে তিনটা ঘণ্টা—এ'সব বাজ্‌তেও শুনিনি। রাত্রের ট্রেণে গাড়ী ছাড়বার সময় নির্দেশ করে কেবল একটি সবুজ আলো ইঞ্জিনের কাছে জ্বলতে থাকে, তারপর সময় যখন হয় নিঃশব্দে গাড়ী ছেড়ে যায়।

যুবকটি আমার আরাম ও নিরাপত্তা নিয়ে নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে এত মত্ত হয়ে গেছেন যে গাড়ী ছাড়বার যে কখন সময়

হয়েছে, তা তিনি বুঝতেই পারেন নি। হঠাৎ গাড়ী চল্‌তে শুরু করে দিয়েছে, চকিতে তিনি হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকালেন, তারপর বল্লেন, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, আমি তা হলে চল্লাম!

তারপর ইতিপূর্বে আমার খাবার সময় কয়েকটা কেক কিনে যে নিজের ওভারকোটের পকেটে পুরে রেখেছিলেন, তা হঠাৎ বার করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লেন, নিন রাখুন, রাত্রে ক্ষিদে পেলে খাবেন।

এই বলে ছুটে দরজার কাছে গিয়ে চলন্ত ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণের কামরা থেকে বাইরের প্ল্যাটফর্‌মে লাফিয়ে পড়লেন, আমাকে কিছু বলবার সুযোগ দিলেন না। এমন কি, তাঁর ঠিকানাটি দূরে থাক, নামটা পর্যন্ত আমার জিজ্ঞেস করে রাখা হলো না। কেকের পুটুলিটি হাতের মুঠোতে নিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম; আলোকোজ্জ্বল প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে ট্রেণ গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করল।

সোভিয়েত দেশে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়বার মত অন্যায় আচরণের জন্য কোন শাস্তি দেওয়া হয় কিনা, জানি নে, এই নিয়মভঙ্গ করবার জন্য তিনি কোন শাস্তি কিংবা তিরস্কার লাভ করেছিলেন কিনা, তাও বল্‌তে পারব না; যদি তাঁর ভাগ্যে তা জুটেও থাকে, তবে আমি বিশ্বাস করি, যে হাসিমুখে তিনি আমার মত একজন অপরিচিত বিদেশীর জন্য অভাবনীয় সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করেছেন, সেই হাসিমুখেই তার দণ্ডও তিনি গ্রহণ করেছেন।

ধীরে ধীরে নিজের কেবিনে ফিরে এলাম।

অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে ট্রেণ চলেছে। ট্রেণে একটুও দুলুনি নেই; কিন্তু তার গতি বড় মন্দ। এই গতিমত্ততার দিনে, স্পুট্‌নিকের যুগে পৃথিবীর এই অগ্রসর দেশে ট্রেণের গতি এত মন্দ কেন, তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না; এমন কি, আমাদের দেশেও এক্সপ্রেস গাড়ীর গতি এ'র চাইতে বেশি। আমি এখানকার সব যান-বাহনের গতির সংযম লক্ষ্য করেছি। পথে-ঘাটে

মোটরের গতিও এখানে খুব সাধারণ। ফাঁকা রাস্তার সুযোগ পেয়েও তা নির্দিষ্ট গতিসীমা কদাচ অতিক্রম করে যেতে দেখিনি। আমি ভেবে অবাক হলুম, যারা আকাশে সকলের গতি-সীমা লঙ্ঘন করেছে, তারা মাটির উপর এত হুঁশিয়ার কেন?

বন্ধু মনোজ বসুর সোভিয়েত দেশের কথায় এক জায়গায় পড়েছিলাম, এদেশে ট্রেণ দ্রুত চালিয়ে দুর্ঘটনা করার চাইতে আস্তে চালিয়ে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছানোর উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়; কারণ, মানুষের প্রাণ এদেশে কাছে বড় মূল্যবান্। সেইজন্য গাড়ীর গতিও এখানে বড় মন্দ। হয়ত কথাটা সত্য; কিন্তু তা হলেও আজ যে যুগে গতির রেকর্ড ভঙ্গ করা নিয়েই দেশে দেশে প্রতিযোগিতা চলেছে, সেই যুগে অন্তত এই দেশের পক্ষে এই মন্থর গতির সাধনা যেন আমার কেমন মনে হলো। কারণ, ভারতবর্ষের মত দেশেও আমরা গতিবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি।

আমার যে যাত্রাসহচরটি এতক্ষণ কাঁচের ঘেরা দেওয়া টেবিল-আলোতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, তিনি আলো নিভিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার শিয়রে ছোট্ট টেবিলের উপর একটি মাত্র আলো জ্বলছে। শীতের রাত্রে কৃত্রিম উপায়ে ঈষৎ উত্তপ্ত কেবিনের মধ্যে এই স্নিগ্ধ আলোটুকুর দিকে তাকিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলাম। একবার কুচি দেওয়া সাদা কাপড়ের পর্দা সরিয়ে কাঁচ আঁটা জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট স্টেশনের উপর দিয়ে চলবার সময় তাদের বৈদ্যুতিক আলোকে চকিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সব কিছুই বরফে ঢাকা পড়ে আছে।

ইলেকট্রিক ইঞ্জিনে টানা মস্কো লেনিনগ্রাদ এক্সপ্রেস মন্দগতিতে অবিরাম চলেছে। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, বলতে পারিনে, যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন শেষরাত্রি। গাড়ী তেমনই নিঃশব্দে চলেছে, কেবিনগুলো সব বন্ধ, আমার কেবিনের যাত্রীরা তখনও গভীর

নিদ্রিত। পর্দা একবার একটু সরিয়ে দেখা গেল, অন্ধকারের গাঢ়তা আর নেই, একটু ফিকে হয়ে এসেছে। এখনও আকাশে দু'একটি তারা আছে, ক্রমে বহু দূর পর্যন্ত বরফের বিস্তার দেখতে পাওয়া গেল। বরফ-সমুদ্রের মাঝখানে কোন কোন জায়গায় কাঠের বাড়ীঘরগুলো ছোট ছোট দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা ঝরা-পাতা পাইন গাছের ঘন বন, কোথাও বন বৃক্ষবিরল, তার পাদভূমি বরফে আচ্ছন্ন।

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে এসে ভদ্র পোশাক পরিচ্ছদ পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে জানালার পর্দা অনেকখানি সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ক্রমে ক্রমে একজন-দু'জন করে যাত্রী উঠে হাতমুখ ধুতে গেল। একব্যক্তি সদ্য নিদ্রোত্থিতদের মধ্যে ধাতুনির্মিত বিচিত্র আধারে করে দুধছাড়া চা পরিবেষণ করতে লাগল; এদেশে চায়ে দুধ খাবার রীতি নেই। অবশ্য দুধ আর চিনির লোভেই আমি চা খাই, তবু প্রচণ্ড শীতের শেষরাত্রে এক গ্লাস গরম চা—তা'তে দুধ থাক, আর নাই থাক—পরম লোভনীয় বলে মনে হোল।

আমি ইঙ্গিতে চা পরিবেষণকারীকে একপাত্র চা দিতে বল্লাম, সে হাস্যমুখে রুশ ভাষায় আমাকে অভিবাদন জানিয়ে এক পাত্র চা দিয়ে গেল। আমি কেবল বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে প্রত্যভিবাদন জানালাম। কারণ, ইংরেজি ভাষা তাঁর জানা আছে বলে আমার মনে হলো না।

ক্রমেই চারদিক ফর্সা হয়ে উঠ্‌তে লাগল। যতদূর দেখতে পাওয়া যায়, পথঘাট, নদীনালা, কেবল বরফে সব একাকার হয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে কাঠের বাড়ীঘরগুলো তার ভিতর থেকে মাথা উঁচু করে যেন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরও ছাদে ছাদে বরফ জমে আছে। এখনো জনমানবের কোন চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না; *লোক্যাল স্টেশনগুলো এখনও জনশূন্য। এক্সপ্রেস* গাড়ী একই গতিতে অবিরাম চলেছে, কোথাও দাঁড়াতে দেখিনি।

আরও কয়েকজন যাত্রী নামবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে করিডোরের জানলার পাশে এসে পর্দা সরিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম, লেনিনগ্রাদের আগে আর গাড়ী কোথাও দাঁড়াবে না। যাত্রীদের ব্যস্ততা দেখে মনে হোল, লেনিনগ্রাদও আর বেশি দূরে নেই। ছ' একটি লোক্যাল স্টেশনের আশেপাশে জনবহুল কয়েকটি স্থান ক্রমেই চোখে পড়তে লাগল। আগের রাত্রে পরিচিত সিংহলী যাত্রীদের কোন সন্ধানই নেই। অথচ তাদেরই আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলবার কথা ছিল।

এবার তুষারাচ্ছন্ন গ্রাম থেকে ছ'একটি লোককে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে লোক্যাল স্টেশনের দিকে আসতে দেখা যেতে লাগল। বরফের উপর দিয়ে পায়ে চলার পথ পড়েছে। আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে মুড়ে সেই পথের উপর দিয়ে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষকে হেঁটে আসতে দেখা গেল,—স্টেসনে এসে সকালের কোন লোক্যাল ট্রেণ ধরবে বলে মনে হচ্ছে। দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। কোথাও একটি পশুপাখীর শব্দ মাত্রও নেই, আমাদের দেশে ভোর হবা মাত্র কত পাখী ডেকে ওঠে, শীতে-গ্রীষ্মে তার কোন ব্যতিক্রম নেই ; কিন্তু এখানে নিঃশব্দে রাত্রি প্রভাত হলো। পক্ষীর কূজন, এমন কি, একটা কুকুরের ডাক পর্যন্ত শুন্‌তে পাওয়া গেল না।

এখন বেশ সকাল। ট্রেণ একটা বড় স্টেশনের প্ল্যাটফরমে গিয়ে ঢুকল। যাত্রীদের মধ্যে নামবার জন্য ব্যস্ততা দেখা গেল। বুঝতে পারলাম এই লেনিনগ্রাদ। আমিও নামবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

২

লেনিনগ্রাদ

তখন ঘড়িতে সাড়ে সাতটা হলেও সময় ভোর। এখানে এই সময়ে আটটার আগে (কোলকাতার সময় প্রায় দশটা) সূর্য ওঠে না। আমি ভাবলাম, হয়ত এত ভোরে এই শীতের

মধ্যে আমাকে নেবার জন্য স্টেশনে কেউ আসতে পারবে না। যাক, দরকার হলে স্টেশনেই অপেক্ষা করব। কিন্তু আমাকে বেশি ভাবতে হলো না, একটি ভদ্রমহিলা স্মিতহাস্যে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বল্লেন, নমস্কার, আশুতোষবাবু!

বুঝতে পারলাম, ইনিই শ্রীযুক্তা ভেরা নভিকোভা। প্রথমটা চিন্‌তে পারিনি, প্রথমত প্রচুর শীতের পোশাক তাঁর গায়ে, দ্বিতীয়তঃ পাঁচ ছয় বছর আগে যখন তাঁকে কোলকাতায় দেখেছি, তখন তিনি আরও ক্ষীণকায়া ছিলেন, এখন আরও একটু স্থূল হয়েছেন। তিনি পরে একদিন বলেছিলেন, তিনি বিস্তর মিষ্টি খান, সে জন্যই নাকি একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন।

তাঁকে দেখতে পেয়ে আমার সকল উদ্বেগ দূর হয়ে গেল। কেন জানি মনে হলো, এত দূর পথের প্রান্তে একটি নিশ্চিত আশ্রয় লাভ করেছি। শ্রীযুক্তা নভিকোভার সঙ্গে আর একজন অল্প বয়স্কা মহিলা এসেছেন; তাঁর একটু সঙ্কুচিত এবং সলজ্জ ভাব, তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে সুমিষ্ট স্বরে বাংলায় বল্লেন, 'নমস্কার'!

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বল্লাম, কি আশ্চর্য, আপনিও বাংলা জানেন দেখ্‌ছি!

শ্রীযুক্তা নভিকোভা আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লেন, ইনি আমাদের বিভাগের সেক্রেটারী, নাম লেনা, পুরোনাম ই. ব্রেসোলেনা।

তাঁরা জিজ্ঞেস কল্লেন, আপনার জিনিসপত্র কোথায়?

আমি দেখিয়ে দেওয়া মাত্র শ্রীমতী লেনা নিজের হাতে জিনিসপত্র নিয়ে টানাটানি কর্‌তে লাগলেন। শ্রীযুক্তা নভিকোভার সঙ্গে তাঁর একজন পুরুষ সহকর্মীও এসেছিলেন। তিনি আমার সুট্‌কেসটা টেনে বার করে ট্রেণ থেকে নেমে স্টেশনের বাইরের দিকে চললেন।

আমি শ্রীযুক্তা নভিকোভাকে জিজ্ঞেস করলাম, এত সকালে স্টেশনে আস্‌তে অপনাদের কষ্ট হয়নি ত!

তিনি বল্লেন—না, কষ্ট কিসের? আপনার জন্য আমরা ক'দিন

কত উদ্বেগে কাটিয়েছি। মস্কোতে আপনার কিছু অসুবিধা হয় নি ত?

আমি বল্লাম—না-না, অসুবিধা কিসের; সেখানে আরও কদিন থাকতে পারলে ভালো লাগতো।

শ্রীমতী লেনা লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা শিখেছেন। বাংলায় সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' বইটি অনুবাদ করছেন। একজন সদ্য বাংলা দেশ থেকে আসা খাঁটি বাঙ্গালীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার বাংলা বিদ্যার দৌড় বুঝে নেবার জন্য তিনিও কথার ফাঁকে ফাঁকে বল্লেন, আপনার জন্য কতদিন ধরে আমরা অপেক্ষা করে আছি। কত বিষয় আপনার কাছ থেকে আমরা আদায় করে নেব, দেখবেন, এখানে আমরা আপনাকে একটুও বিশ্রাম দেব না।

আমি তার জবাবে কিছুই বল্লাম না; কেবল আমার বাঁদর-টুপী আঁটা মুখ নিয়ে এই প্রথম পরিচিতা বিদেশিনী মহিলার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ দন্তবিকাশ করে রইলাম।

প্ল্যাটফরম পার হয়ে আমরা সবাই স্টেশনের বাইরে চলে এলাম। কেউ টিকিট চাইল না; রাস্তার ওপারেই বিরাট মস্কো-ভাস্কায়া অর্থাৎ মস্কো হোটেল, বোধ হচ্ছে আটতলা বাড়ী।

শ্রীযুক্তা নভিকোভা হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, এই হোটেলে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

কোন গাড়ীর দরকার ছিল না; কিন্তু তবু শ্রীমতী নভিকোভা যে গাড়ী করে এসেছিলেন, তা'তে নিয়েই মালপত্র তোলা হলো, আমরাও সবাই তাতে গিয়ে উঠে বসলাম।

রাস্তা পার হয়েই গাড়ী হোটেলের দরজায় এসে দাঁড়াল। আবার জিনিসপত্র নামিয়ে ডবল দরজা ঠেলে হোটেলের আপিশ ঘরে গিয়ে ওঠা গেল। শুধু আপিশ ঘরই নয়, সেখানে ছোট্ট একটি স্টোর, একটি পোস্টাপিশ, খবরের কাগজ বিক্রির জায়গা, হোটেলের অধিবাসীদের জন্য একটি 'সার্ভিস বুরো'ও ছিল। প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষের চারদিকে ঘিরে এ'সব ব্যবস্থা—ভিতরে আরামপ্রদ

বস্‌বার আসন। সেখানে গিয়ে আমি বস্‌লাম, শ্রীযুক্তা নভিকোভা ও লেনা ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বল্‌তে গেলেন। আমার পাশপোর্টটি সেখানে দাখিল কর্‌তে হলো।

বিদেশে গেলে পাশপোর্টটি প্রাণের চাইতে মূল্যবান্। এটি হারিয়ে গেলে চোখে সর্ষে ফুল দেখা ছাড়া আর উপায় থাকে না। কিন্তু পাশপোর্টটি যখন কেউ বিনা রসিদে চেয়ে নিয়ে যায়, তখন সেটা ফিরে না আসা পর্যন্ত মনটা খুঁৎখুঁৎ কর্‌তেই থাকে। আমাদের অবিশ্বাসী মন কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পারে না যে, এটা আবার ফিরে পাব। কিন্তু এখানে এসে কতবার পাশপোর্ট কত জায়গায় বিনা রসিদে জমা দিয়েছি, আবার সহজেই ফিরে পেয়েছি। কিন্তু তবু আমাদের সংস্কার কাট্‌তে চায় না। আমারও মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল। শুনলাম, পাসপোর্ট আপাততঃ এখানেই থাকবে। যাক, শ্রীযুক্তা নভিকোভার হাত দিয়ে জমা দিয়েছি, এই সান্ত্বনা নিয়ে চুপ করে রইলাম।

দোতলায় আমার থাকবার জন্য একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঘর নির্দিষ্ট হলো। এবার হোটেলেরই একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী আমার স্যুট্‌কেসটা কাঁধে করে নিয়ে এসে আমার ঘরটি দেখিয়ে দিলে।

২৪৩ সংখ্যক ঘর: ভিতরে ঢুকে ঘরটির সাজসজ্জা ও অন্যান্য ব্যবস্থা দেখে মনটা প্রসন্ন হয়ে গেল। আগাগোড়া কার্পেট মোড়া মেজে। টেলিফোন, রেডিও সেট, সংলগ্ন আধুনিকতম স্নানাগার, গরম ও ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ, কাঁচ-আঁটা দরজার ভিতরের দিকে মোটা রঙিন পরদা, আধুনিকতম সব কাঠের আসবাব পরিপাটি করে সাজানো।

আমাকে স্নান করে নেবার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিয়ে শ্রীযুক্তা নভিকোভা ও লেনা নীচে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন; আমাকে রেস্তোরাঁতে খাইয়ে দাইয়ে না দিলে আমি নিজে গিয়ে জিনিস চেয়ে দাম দিয়ে খেতে পারব না—তাদের এই বিশ্বাস; এ বিশ্বাস যে তাদের অকারণই, তা বল্‌তে পারব না।

আমিও আরামে স্নান করে বাইরে বেরুবার জন্য তৈরী হয়ে পড়লাম। তাঁরা ঠিক ন'টার সময় এসে আমাকে নিয়ে হোটেলের রেস্তোরাঁতে ঢুকলেন। তারপর সেখানে প্রচুর আহারের সঙ্গে সঙ্গে আহার্য বস্তুর রুশ নামগুলো তাঁরা আমাকে শেখাতে লাগলেন, যাতে দরকার হলে আমি একাই রেস্তোরাঁতে এসে খেতে পারি। সব সময় তাঁরা কিংবা কোনো দোভাষী আমার সঙ্গে থাকবে, এমন কখনো সম্ভব হতে পারে না। তবে একা বসে না খাওয়ার একটা সুবিধা ছিল যে, দামটা আমাকে কোনদিনই দিতে হতো না। সেজন্য ওপথে একলা কমই চলেছি।

খেতে বসে সব চাইতে তৃপ্তির সঙ্গে যা খেলাম, তা দই। মস্কোর মত এখানেও দইয়ের প্রাচুর্য আছে, এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে সবাইকেই দেখতে পেলাম, এই বস্তুটি পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করছেন। অনেক প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তিরও দেখ্‌লাম, প্রাতরাশের প্রথম খাদ্যই দই। এই খাদ্য বস্তুটির রুশ নাম আমি অতি সহজেই শিখে গিয়েছিলাম।

খাওয়া শেষ হবার পর আমরা সবাই মিলে আমার হোটেলের ঘরে ফিরে এলাম। শ্রীযুক্তা নভিকোভা এবার কাজের কথা তুল্লেন। কি কি বিষয় নিয়ে আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে, কোন্ কোন্ তারিখেই বা বক্তৃতা হবে, এই সব বিষয় স্থির করা হলো। তারপর লেনিনগ্রাদ ও তার চারিদিককার কোন্ কোন্ জায়গা আমি কবে দেখ্‌তে যাব, তারও একটা মোটামুটি তালিকা তৈরী হোল। সেদিনকার মত স্থির হলো যে, এখনই শ্রীমতী লেনার সঙ্গে আমি জারের শীতকালীন আবাস (Winter Palace) বা 'হারমিটেজে' যে বিরাট সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত আছে, তা দেখতে যাব। কিন্তু তার বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনা করবার স্থানাভাব বলে স্বতন্ত্র পুস্তকে তা প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল। লেনিনগ্রাদের সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করে আমার এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে। এখানে বক্তৃতাগুলো এবং মাত্র দু'একটি বিষয় মাত্র উল্লেখ করব।

বক্তৃতার বিষয় স্থির করতে গিয়ে নভিকোভা বল্লেন, বাংলার লোক-শ্রুতি এবং বাংলা নাটক এই ছুটি বিষয়ই আপনার কাছে আমরা শুনতে চাই। লোক-শ্রুতির মধ্যে এই কয়টি বিষয় বিশেষ করে বল্লে আমাদের ও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের উপকার হবে—যাত্রা, লৌকিক দেবদেবী ও মঙ্গল কাব্য এবং নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাটক ছাড়া বাংলা নাটকের আর যে কোন বিষয়! রবীন্দ্রনাথের বিষয় আমাদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, তাই তার আর প্রয়োজন নেই। বক্তৃতাগুলো ইংরেজিতে দিতে হবে।

বক্তৃতাগুলো যে ইংরেজি ভাষায় দিতে হবে, তা আমি এই প্রথম শুন্‌লাম। বক্তৃতার ভাষা বিষয়ে আমাকে আগে কিছুই জানান হয় নি। আমি আগে মনে করেছিলাম, রুশবাসীদের মধ্যে অনেকেই বাংলা শিখেছেন, সুতরাং আমি বক্তৃতাগুলো বাংলাতেই দেব, তা' তাঁরা রুশ ভাষায় অনুবাদ করে নেবেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে বুঝ্‌তে পারলাম, বাংলা বক্তৃতা শুনে সেই মুহূর্তেই রুশ ভাষায় অনুবাদ করবার মত বাংলা শিক্ষা এখনও তাঁদের হয় নি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-অধ্যাপক অনেকের কাছেই ইংরেজি ভাষা পরিচিত। সুতরাং ইংরেজি ভাষাতেই বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁরা আমাকে অনুরোধ জানালেন। সেইজন্য লেনিনগ্রাদে থাকা কালীনই রাত জেগে হোটেলে বসে বক্তৃতাগুলো আমাকে ইংরেজিতে লিখ্‌তে হয়েছিল।

একদিন মাত্র একটি বক্তৃতা আমাকে বাংলায় দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল; তার একটি বিশেষ কারণ ছিল. সে কথা বলি।

একদিন এক বক্তৃতার শেষে শ্রীযুক্তা নভিকোভা বল্লেন, আমাদের তিনটি চীনা ছাত্র আছে, তারা ইংরেজি বুঝ্‌তে পারে না; কিন্তু বাংলা খুব ভাল বল্‌তে না পারলেও খুব ভাল বুঝ্‌তে পারে। বিশেষ করে তাদের জন্যই একদিন আপনাকে বাংলায় বক্তৃতা দিতে হবে।

আমি শুনে বিস্মিত হয়ে বল্লাম, চীনা ছাত্র? আপনার কাছে বাংলা পড়্ছে?

তিনি বল্লেন, তারা এখানে রুশ ও বাংলা ভাষা শিখতে এসেছে। আপনার ইংরেজি বক্তৃতা তারা বুঝতে পারে না। অথচ তারা আপনার বক্তৃতা শুন্বার জন্য খুব ব্যগ্র, কারণ, বাংলা তাদের বিষয়।

আমি বল্লাম, বেশ আপনার ইচ্ছে হলে তাদের জন্য একদিন বাংলাতেই বক্তৃতা দেব।

শ্রীযুক্তা নভিকোভা চীনা ছাত্র তিনটিকে আমার কাছে ডাক্লেন, তারা আমার কাছে এসে হাত তুলে প্রত্যেকে নমস্কার জানাল। তিনজনেরই বয়েস প্রায় এক, কুড়ি একুশ হবে, দেখতেও একই রকম।

আমি বিস্মিত হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা বাংলা শিখতে এতদূর এসেছ?

একজন বল্ল, আমরা রুশ আর বাংলা দুটোই এক সঙ্গে শিখব বলে এসেছি। আমরা আপনার বই এখন বেশ তাড়াতাড়ি পড়তে পাচ্ছি।

এই বলে হাতের একখানি বই আমার দিকে এগিয়ে দেখাল।

দেখি আমার সম্পাদিত 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকে'র আমার লিখিত ভূমিকাটির একখানি 'ফটোষ্টেট্ কপি'; আমি উল্টে পাল্টে দেখ্তে লাগ্লাম। সুদীর্ঘ ভূমিকাটিরই 'ফটোষ্টেট্ কপি' করা।

আমি নভিকোভাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ' কি ব্যাপার?

তিনি বল্লেন, বইখানি এখানে পাঠ্য, ভূমিকাটি এদের পক্ষে বড় উপযোগী; কিন্তু বই এখানে ছেলেমেয়েরা পায় না, তাই প্রত্যেককে ফটোষ্টেট্ কপি করেই পড়তে দেওয়া হয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, ফটোষ্টেট্ কপিতে বোধ হয় কপিরাইট আইনও ভঙ্গ করা হয় না।

একটি চীনা ছাত্র বাংলায় আমাকে বল্লে, যদি আপনি একদিন শুধু আমাদের জন্য বাংলায় বক্তৃতা দেন, তা হলে আমাদের বড় উপকার হতো।

শ্রী নভিকোভার সঙ্গে স্থির হলো, মঙ্গল কাব্য বিষয়টির উপর একদিন শুধু তাদের জন্য বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া হবে। তবে সে বক্তৃতায় লেনিনগ্রাদের আরও বাংলা জানা শ্রোতা ও শ্রোত্রী উপস্থিত ছিলেন।

এখানে পাঠকদের নিকট একটি বিষয় নিবেদন করতে চাই। লেনিনগ্রাদে আমার অভিজ্ঞতা যেমন বিস্তৃত, তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। সেজন্য আগেই বলেছি, সেখানকার বৃত্তান্ত নিয়ে আর একটি স্বতন্ত্র বই লেখবার প্রয়োজন হবে। তবে বর্তমান গ্রন্থে তাদের দু' তিনটি বিবরণ উল্লেখ করতে চাই মাত্র। তাদের মধ্যে লেনিনগ্রাদের যে সকল শিক্ষা ও গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রণ লাভ করে তাদের পরিদর্শন করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাদের কয়েকটির কথা মাত্র এখানে ক্রমে উল্লেখ করব।

পুস্কিন ভবন

২৩শে মার্চ ১৯৬৪; আমার দ্বিতীয় বক্তৃতার দিন। সেদিন Serpent Lore of Bengal নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কথা। ইতিপূর্বেই সেদিন পুস্কিন ভবনে রুশ সাহিত্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Institute of Russian Literature) পরিদর্শন করবার জন্য আমন্ত্রণ লাভ করেছিলাম। স্থির হলো তিনটার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যাবার আগেই সেদিন পুস্কিন ভবনে উক্ত প্রতিষ্ঠান দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যাবে। এই প্রতিষ্ঠানটি রাশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র; তার তিনটি প্রধান বিভাগ —প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য। প্রত্যেকটি বিভাগের সংলগ্ন এক একটি সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম। যদিও মুখ্যতঃ লোক-সাহিত্য বিভাগটিই আমার পরিদর্শন করবার কথা, তথাপি যথাসম্ভব অন্যান্য বিভাগগুলোও আমি এই সময়ের মধ্যেই দেখে নেব, স্থির করেছি।

বেলা দশটার সময় আমি স্নান ও প্রাতরাশ শেষ করে সেদিনের বক্তৃতার লেখা সবে মাত্র শেষ করেছি, এমন সময় একজন দোভাষী এসে উপস্থিত হলেন, শ্রীযুক্তা নভিকভা আমাকে পুস্কিন ভবনে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছেন। তাঁর হাতে একটা ক্যামেরা।

তিনি বল্লেন, আপনার কয়েকটা ছবিও তুল্‌ব।

বয়স অল্প, সামান্য ইংরেজি জানেন, প্রফুল্ল মুখ; শুন্‌লাম তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবনের একজন ছাত্র। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম; সেখান থেকেই বক্তৃতা দিতে যেতে হবে, সে জন্য লিখিত বক্তৃতাটি সঙ্গে করে নিলাম; আমার সঙ্গে বাংলা দেশের পল্লীগানের যে টেপ রেকর্ডগুলো এনেছিলাম, তাও সঙ্গে নিলাম, ভাবলাম এগুলো পুস্কিন ভবনের রুশ সাহিত্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য বিভাগে উপহার দেব।

নেভা নদী পার হয়ে এক চৌরাস্তার পাশে এক বিস্তৃত পার্ক—বরফে আগাগোড়া আচ্ছন্ন, নিস্পত্র কয়েকটি গাছ আগুনে পোড়ার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রলি বাস থেকে আমরা সেখানে নেমে পড়লাম।

যুবক দোভাষী পার্কটি দেখিয়ে বললেন, চলুন ওখানে, ছবি তুল্‌ব।

আমি পার্কের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম, জুতো বরফের মধ্যে বসে যেতে লাগল। সেই অবস্থায় গোটা কয়েক ছবি তোলা হলো। একটি বিজয়স্তম্ভের নীচে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ফটো তোলা হ'লো। এমন সময় দেখতে পাওয়া গেল, শ্রীযুক্তা ভেরা নভিকোভা যেন আমাদের খুঁজতে খুঁজতেই সেখানে এসে হাজির হয়েছেন।

তিনি কাছে এসে বললেন, পুস্কিন ভবনে সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে, এখানকার কাজ শেষ করে লাঞ্চ খেয়ে তারপর আপনার বক্তৃতা শুরু হবে। শীগ্‌গীর চলে আসুন।

অপরাধীর মত তাঁকে অনুসরণ করে নিকটেই এক বিরাট বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পৌঁছুলাম। শ্রীযুক্ত নিকলাই নভিকোভ আগে থেকেই নীচে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যথারীতি ওভারকোট ও টুপী জমা রেখে নভিকভা আমাকে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে চললেন।

বিস্তৃত একটি কক্ষে অধ্যক্ষের বসবার স্থান, চারদিকের আলমারিতে চাবি বন্ধ করা নানা জরুরী দলিলপত্র। তিনি ইংরেজী জানেন না; নভিকোভার মধ্যস্থতায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ চল্‌তে লাগল। ভারতবর্ষ থেকে এসেছি জেনে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন এবং এই খুশী যে আন্তরিক, কেবলমাত্র মৌখিক নয়, তা বুঝতে পারলাম। তাঁর এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এবং তার কার্যধারা সম্পর্কে তিনি আমাকে কিছু বুঝিয়ে বল্‌লেন। তারপর কি ভাবে প্রাচীন দলিলপত্র এবং পাণ্ডুলিপিগুলো এখানে রক্ষিত (preserved) হয়, তা প্রত্যক্ষ বুঝিয়ে দেবার জন্য আমাকে নিয়ে

উনবিংশ শতাব্দীর রুশ লেখক পুস্কিনের পাণ্ডুলিপিগুলো এখানে কি ভাবে রক্ষা করা হয়েছে, তা দেখাতে চললেন। দেখলাম নিজের হাতে চাবির পর চাবি খুলে তিনি একটা কক্ষে ঢুকলেন, তারপর সেখান থেকে একটা লোহার আলমারি খুলে তার ভিতরে রাখা এক একটি মোটা বোর্ডের বাক্স থেকে পুস্কিনের নিজের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো একটি একটি করে আমার সামনে খুলে খুলে দেখাতে লাগলেন। তাঁর আচরণের মধ্যে জাতির এই পরম সম্পদ রক্ষা করবার জন্য সুগভীর নিষ্ঠার যে ভাব প্রকাশ পেল, তা আমাকে অভিভূত করল।

আমি ভাবলাম, আমাদের দেশেও ত কত বড় বড় সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে। এক রবীন্দ্রনাথের ছাড়া আর কারুর পাণ্ডুলিপিগুলো কি এমনি যত্ন করে কোন প্রতিষ্ঠান রক্ষা করেছে? মধুসূদন কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি বাংলা দেশ থেকে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল? এগুলো রক্ষা করবার যে আমাদের একটি জাতীয় দায়িত্ব ছিল, তা কি আমরা কখনও স্মরণ করি? এমন কি, রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে আমাদের দেশে কত টাকাই ত খরচ হয়েছে; সভা-সমিতি, নৃত্য-গীতের কত অনুষ্ঠানই হয়েছে। তাদের কারুর মধ্যে এমন কি, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতেও ত এমন কোন প্রদর্শনী দেখতে পাওয়া যায় নি, যাতে তাঁর সব কয়খানি বইয়ের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখানো হয়েছে! রবীন্দ্রনাথের সবগুলো বইয়েরই পাণ্ডুলিপি যে বর্তমান আছে, তাও মনে করবার কোন কারণ নেই। আর আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথেরই যদি এই দশা হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য লেখকদের অবস্থা যে কি, তা ত' স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়।

এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পুস্কিনের নাম জড়িত থাকবার জন্য পুস্কিনের সকল বইয়েরই পাণ্ডুলিপি এখানে আছে, গোর্কির পাণ্ডুলিপি মস্কোর গোর্কির নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে আছে, তলস্তয়েরও তাই। এমনি ভাবে দেশ জুড়ে সকল লেখকেরই

স্মৃতিরক্ষা করে জাতির অবিচল শ্রদ্ধা তাঁদের প্রতি নিবেদন করা হয়ে থাকে।

নিজের হাতে লোহার আলমারিটি বন্ধ করে চাবিটি নিয়ে অধ্যক্ষ আমাকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তারপর একজন দোভাষিণীকে ডেকে আমাকে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সকল বিভাগগুলো ঘুরিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে বললেন। দোভাষিণী নিতান্ত তরুণী, ইংরেজিতে বিশেষ দক্ষতা আছে। শ্রীযুক্তা নভিকোভাকে সঙ্গে নিয়ে দোভাষিণীর সহায়তায় এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কক্ষগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগ্‌লাম।

যত রুশ সাহিত্যিক ছিলেন, তাদের জীবিত কালের ব্যবহার্য যত উপকরণ দোয়াত কলম, পোশাক পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে অনেক ক্ষেত্রে দেহাবশেষ পর্যন্ত নানা ধাঁচের আধারে রক্ষা করা হয়েছে।

এমনি ভাবে পুস্কিন যে কলমে লিখ্‌তেন, যে ডেস্কে বসতেন, তা সাজিয়ে রাখা হয়েছে; তার জীবনের বহু আলোকচিত্র, বৃহদাকৃতি তৈলচিত্র, কোথাও আবক্ষ কিংবা পূর্ণ-দেহ প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় কেবলমাত্র বইয়ের ভিতর পড়া ছাড়াও চোখে দেখ্‌লে যাতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, তার সকল আয়োজনই সার্থক এবং সুন্দর করে রাখা হয়েছে। পুস্কিনের ব্যক্তিগত জীবন কিংবা তাঁর সাহিত্যে সাধনা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না, একদিনেই চোখে দেখে তাঁর সম্পর্কে অনেকখানি বিষয় জান্‌তে পারলাম। এবার তাঁর রচিত কয়েকখানি বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ পড়্‌লেই তাঁর সম্পর্কে আমার জান্‌বার আর কিছুই বাকি থাকবে না।

এমন কি, গোর্কি এবং অন্যান্য ছোট বড় সকল রুশ সাহিত্যিকেরই এমনই বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে।

একজন কবি মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই আত্মহত্যা করে পরলোক গমন করেছিলেন। তাঁর মাথার চুল পর্যন্ত একটি কাচের পাত্রে

রেখে দেওয়া হয়েছে। তাঁর নামটা এই মুহূর্তে স্মরণ কর্‌তে পাচ্ছিনে। যে বিস্তৃত কক্ষে তার তৈলচিত্র এবং জীবনের ব্যবহৃত নানা উপকরণ রক্ষিত হয়েছে, তা'তে তাঁর মা এবং ভগিনীরও তৈল এবং আলোকচিত্র সংরক্ষিত আছে। চারদিকে তাকিয়ে আমি তাঁর পত্নীর কোন চিত্র দেখতে পেলাম না। আমার মনে হলো, তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

দোভাষিণীকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি অবিবাহিত ছিলেন? তার মা, বোন এঁদের চিত্র দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাঁর পত্নীর চিত্র দেখ্‌ছি না কেন?

দোভাষিণী চুপ করে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তার কি স্ত্রী ছিলেন না? দোভাষিণী সলজ্জভাবে একটু ব্যঙ্গের সুরে জবাব দিলেন, অনেক স্ত্রী ছিল!

কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোন অবাঞ্ছিত কথা যেন তিনি গোপন করতে চাইলেন।

নভিকোভা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠ্‌লেন, সেই জন্যই ত তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল!

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চুপ করে গেলাম।

এর পাণ্ডুলিপি বিভাগ একটি স্বতন্ত্র বিভাগ, তার জন্য একজন স্বতন্ত্র বিভাগীয় অধ্যক্ষ আছেন। যে সকল পাণ্ডুলিপি পুরানো গির্জা কিংবা monastery থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তা থেকে আরম্ভ করে বহু জায়গা থেকে অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহও সেখানে এনে সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে। পুস্কিনের প্রত্যেকটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি এই বিভাগেরই অন্তর্গত। আগেই বলেছি, তলস্তয় এবং গোর্কির পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ মস্কোতে যথাক্রমে তলস্তয় ও লেনিন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

তারপর লোক-সাহিত্য বিভাগে গিয়ে প্রবেশ করলাম। সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন প্রদেশে যদিও আঞ্চলিক লোক-সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র আছে, তথাপি পুস্কিন ভবনের অন্তর্গত এই

বিভাগটিই রুশ দেশের লোক-সাহিত্য গবেষণা বিষয়ে বৃহত্তম বিভাগ। *যতদূর মনে হয়, ১৮৯৪ সন থেকে নিয়মিত এখানে পল্লী-*সঙ্গীতের সংগ্রহ phonogram-এ রেকর্ড করে রাখা হচ্ছে। এখন ফনোগ্রামের রেকর্ডগুলো ক্রমে অব্যবহার্য হয়ে পড়ছে বলে তা এবার tape রেকর্ডে পরিবর্তিত করে নিয়ে সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থা চল্‌ছে। এভাবে রুশ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার গানের সংগ্রহ প্রতি বছরই টেপ রেকর্ড করে এখানে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এরও তিনটি বিভাগ—গবেষণা বিভাগ, রেকর্ড বিভাগ ও সংরক্ষণ (preservation) বিভাগ।

সাধারণতঃ গ্রীষ্মের কয়েক মাস প্রতি বৎসর গবেষণা বিভাগের কর্মীরা লোক-শ্রুতির উপাদান সংগ্রহ করবার জন্য অভিযান (folklore-expedition)-এ বের হন। সেখান থেকে tape রেকর্ড যোগে গান, রূপকথা, উপকথা, ছড়া, ধাঁধা—এসব সংগ্রহ করেন। রেকর্ডে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তা লিখেও নেন। বিভাগের এই বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত গবেষকগণ সাধারণতঃ এই সকল কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। সংগৃহীত উপাদানগুলো পরিষদের গবেষণা গৃহে নিয়ে আসা হয়, তারপর পরিছন্ন করে টাইপ করে বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে রাখা হয়। তাদের যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়, তা' দেখে গবেষক-গণ তাঁদের অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করেন, তা নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের সেই আলোচনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়; *Russian Folklore* নামক সুবৃহৎ গবেষণা-গ্রন্থ এই বিভাগেরই বাৎসরিক মুখপত্র। প্রতি বছর সংগ্রহ অভিযান থেকে যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হয়, তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সেই বছরের এই মুখপত্রে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়ে থাকে। এই বছর এই বিভাগ থেকে *Folksongs of the last Patriotic War* নামে একখানি বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই বিভাগে আমার 'আগমন উপলক্ষ্যে' সাতজন গবেষণাকর্মী স্বাক্ষর করে একখানি সেই বই

আমাকে উপহার দিলেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে সেই উপহার গ্রহণ করলাম।

এই বিভাগের একজন প্রধান গবেষণা-কর্মীর সঙ্গে সাম্প্রতিক লোক-সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণার বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা হলো। শ্রীযুক্তা ভেরা নভিকোভা এক্ষেত্রে দোভাষিণীর কাজ করলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের দেশে যে ভাবে দ্রুত শিল্প ও বিজ্ঞানের বিস্তার হচ্ছে, তাতে লোক-সাহিত্যে ভাব, বিষয় এবং রূপ ইতিমধ্যেই কতদূর পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে করেন?

তিনি বল্লেন, এ কথা সত্য, এই অবস্থায় আমাদের দেশে অনেকে এমনও মনে করেন যে ভবিষ্যতে লোকসাহিত্যের কোন অস্তিত্বই থাক্‌বে না এবং তার লক্ষণও দেখা দিয়েছে; অবশ্য আর এক শ্রেণীর গবেষক আছেন, তাঁরা এ কথা মনে করেন না।

আমি বল্লাম, আমিও তা মনে করিনে। সমাজ যে ভাবেই পরিবর্তিত হোক না কেন, তার একটা সংহত রূপ থাকবেই এবং সেই অনুযায়ী তার লোকসাহিত্যেরও পরিবর্তন হবে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, লোকসাহিত্যের উপকরণ আপনারা আপনাদের দেশে এখন সমাজ-জীবনের কোনখান থেকে সংগ্রহ করেন, শ্রমিকদের মধ্য থেকে তার কি কিছু নিদর্শন পান?

তিনি বল্লেন, আমরা সাধারণতঃ উত্তর প্রদেশের পল্লী অঞ্চলের মৎস্যজীবী, পশুচারণকারী জাতি এদের মধ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করি। গ্রাম-জীবনের মধ্যেও তার সন্ধান পাই।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, শ্রমিক-জীবনের মধ্যে তার কি কোন অস্তিত্বের সন্ধান কর্‌তে পারেন?

তিনি সে বিষয়ের কোন জবাব না দিয়ে আমাকেই জিজ্ঞেস কর্‌লেন, শ্রমিক জীবন সম্পর্কে আপনি জান্‌তে চাইছেন কেন?

আমি বল্লাম, আমাদের দেশেও আপনাদের দেশেরই মত দ্রুত

শিল্প জীবনের প্রসার হচ্ছে, কলকারখানা ও শ্রমিক-মজুরের সংখ্যা বাড়ছে। আপনাদের দেশের অবস্থার কথা জানতে পারলে একই অবস্থায় আমাদের দেশেরও লোকসাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, তার একটা আভাস পেতে পারি।

তিনি বল্লেন, লোক-সাহিত্যের দিক থেকে এই বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ বহু আলোচনা করেছেন এবং এখনও করছেন।

আমি আর বিশেষ কিছু এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম না। গবেষণা বিভাগ থেকে phonogram বিভাগে গেলাম। যখন থেকে গ্রামোফন রেকর্ডের আবিষ্কার হয়েছে, প্রায় সেই সময় থেকেই সেই বিভাগে রুশ দেশের লোক-সঙ্গীত phonogram এ রেকর্ড করে রাখা হচ্ছিল। যতদূর মনে হচ্ছে ১৮৯৪ সন থেকেই সেখানে phonogram-এ রুশ লোক-সঙ্গীতের রেকর্ড সংরক্ষিত হয়েছে। আমার মনে হলো, সেই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথও বাংলার লোক-সাহিত্যের ছড়া ও গ্রাম্যগীতি নিয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে সে সময়কার বাংলার কোন লোক-সঙ্গীত তিনি রেকর্ডে তুলে রাখতে পারেন নি।

Phonogram বিভাগ থেকে tape রেকর্ড বিভাগে গেলাম। প্রত্যেকটি বিভাগই উপকরণ দিয়ে সমৃদ্ধ এবং বহু কর্মীর কর্ম চাঞ্চল্যে মুখর। টেপ রেকর্ড বিভাগে পুরানো বিনষ্টপ্রায় phonogram রেকর্ডগুলোকে নতুন করে tape রেকর্ডে তুলে নেওয়া একটি প্রধান কাজ। তা ছাড়া নতুন সংগৃহীত উপকরণগুলোকে তালিকাবদ্ধ ও শ্রেণী বিভাগ করে রাখবারও দায়িত্ব আছে। সেখানে তাঁরা আমাকে রুশ লোক-সঙ্গীতের কয়েকটি টেপ বাজিয়ে শোনালেন। বাংলাদেশ থেকে আমি কতকগুলো লোক-সঙ্গীত আমার নিজের ট্রানজিসটার টেপ রেকর্ডারে তুলে নিয়েছিলাম। তা তাঁদের সেখানে উপহার দিলাম। তাঁদের টেপে তাঁরা তা

তুলে রাখ্‌বেন বল্লেন এবং আমাকেও রুশ পল্লীসঙ্গীতের একটি সংগ্রহ টেপে তুলে উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

শ্রীযুক্তা ভেরা নভিকোভার স্বামী শ্রীযুক্ত নিকলাই নভিকোভের সঙ্গে আমার আগেই আলাপ হয়েছিল। তিনি আমার আস্‌বার প্রতীক্ষায় আগে থেকেই দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। আগেই বলেছি, লোক-সাহিত্যের মধ্যে তিনি লোক-কথা (folk-tale) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ফ্যাসিস্ত সৈন্যদলের সঙ্গে বিগত যুদ্ধে তিনি চার বৎসর একেবারে সৈন্যদলের পুরোভাগে (front) ছিলেন, সেখানেও সুযোগ পেলে লোক-কথা সংগ্রহ করতেন। কৌতুক প্রিয় সদা হাস্যমুখ সৌম্যদর্শন পুরুষটির সঙ্গে আগেই আমার আন্তরিক প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে নীরবে আমাদের প্রীতির বিনিময় করা ছাড়া উপায় ছিল না। মুখের ভাষায় কেউ কোউকে বুঝ্‌তে পারিনে। এত বড় একজন ভাষাভিজ্ঞা বিদুষী পত্নীর স্বামী হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষা তিনি বিন্দুবিসর্গও জানেন না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর অন্তরের পরিচয়টি উদ্ধার করে নিতে আমার কঠিন হতো না।

আমি সেদিনকার মত তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য চলে এলাম। তার আগে পুস্কিন ভবনের রেস্তোরাঁতে শ্রীযুক্তা নভিকোভা আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত কর্‌লেন। 'ভোজনে নৃত্যন্তি বিপ্রাঃ'; সুতরাং ভোজনের পরিতৃপ্তি আমার আর সকল পরিতৃপ্তিকে সর্বদাই ছাপিয়ে উঠেছে। এবার প্রসন্ন চিত্তে বক্তৃতা দেবার জন্য রওনা হওয়া গেল।

২রা এপ্রিল তারিখে আবার পুস্কিন ভবনে যাবার জন্য আমন্ত্রণ এলো। শ্রীযুক্তা নভিকোভা বল্লেন, আপনাকে আজ কতকগুলো রুশ লোক-সঙ্গীতের টেপ রেকর্ড উপহার দেওয়া হবে; আর সেদিন বাংলার লোক-সঙ্গীতের যে রেকর্ডগুলো আপনি তাঁদের উপহার দিয়ে এসেছেন, তা আপনি তাঁদের বুঝিয়ে দেবেন,

তাঁরা তা তাঁদের কাগজপত্রে লিখে তারপর একেবারে রেকর্ড করে রাখবে।

সেদিন আমার পঞ্চম বক্তৃতার দিন। বক্তৃতার সময় চারটা। সাড়ে এগারটার সময়ই শ্রীমতী লেনা এসে হাজির হলেন। তিনিই আমাকে পুস্কিন ভবনে নিয়ে যাবেন। আমিও তখুনি তার সঙ্গে রওনা হয়ে পড়লাম।

সেখানে গিয়ে দেখি, বাংলা লোক-সঙ্গীতের যে রেকর্ড করা টেপগুলো আমি দিয়েছিলাম, তা তাঁরা নিজেদের টেপে তুলে নিয়েছেন, আমার টেপগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। নিজেদের রেকর্ড করা টেপ্‌গুলো এখন আমাকে বাজিয়ে সোনাতে লাগ্‌লেন এবং প্রত্যেকটি গানের আমি ব্যাখ্যা করে দিতে লাগ্‌লাম।

আমি যে গানগুলো তাঁদের উপহার দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী যতীন দাস বাউলের কয়েকটি নৃত্যবাদ্য-সম্বলিত বাউল গান, পুরুলিয়ার একটি কৃষ্ণলীলা ঝুমুর, মৈমনসিংহের একটি পঞ্চকল্যাণী পটের গান, একটি বারমাসী, একটি সম্পূর্ণ ব্রতকথা এবং একটি চট্‌কা গান; তাদের সঙ্গে কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতও ছিল।

প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে তাঁদের কতকগুলো নির্দিষ্ট জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন ছিল; যেমন, গায়কের নাম, বয়স, স্ত্রী কিংবা পুরুষ, সমবেত, দ্বৈত কিংবা একক, কোথা থেকে সংগৃহীত—শুধু জেলার নাম বল্‌লেই চল্‌বে না, গ্রামের নামও চাই, ব্যবসায়ী (professional) গায়ক কিংবা শৌখীন (ameteur) গায়ক, কি কি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রত্যেকটি গানেরই বাদ্যযন্ত্র থাক্‌লে বাদ্যযন্ত্রগুলোর বিস্তৃত বর্ণনা, তারপর বিষয়-বস্তু কি এবং তার ব্যাখ্যা কি ?

এক-একটি গান বাজিয়ে শোনানোর পরই আমাকে সেই গানটি সম্পর্কে এই প্রশ্নগুলো করা হয়েছে, আমি ইংরেজী এবং বাংলায় শ্রীমতী লেনাকে বুঝিয়ে দেবার পর তিনি তা তাঁদের রুশ ভাষায় বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। এইভাবে আমার দেওয়া কুড়িটি গান

একটির পর একটি তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম, তাঁরা আমার সব কথাই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লিখে নিলেন, প্রত্যেকটি গায়কের নাম-ধাম কিছুই পরিত্যাগ করলেন না, গানগুলো তাঁদের সংগ্রহশালায় যত্নের সঙ্গে সংগৃহীত হয়ে থাকবে। যদি কেউ কখনও লেনিনগ্রাদ যাবার সুযোগ পান, তবে তিনি পুস্কিন ভবনের লোক-সাহিত্যের রেকর্ড বিভাগে গেলে তা শুনতে পাবেন, তাঁরা সে ব্যবস্থা করবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন।

আমাকে উপহার দেবার জন্য তাঁরা রুশ লোক-সঙ্গীতের একটি বেশ বড় রীল ইতিমধ্যেই রেকর্ড করে রেখেছিলেন, এবার তা আমাকে বাজিয়ে একটি-একটি করে বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

প্রথম যে গানটি শোনালেন তার নাম রুশ ভাষায় 'অভ্‌সিয়ন্‌'। গানটি কুইভশিয়েভ প্রদেশের বাগাতভ জেলায় কিছুদিন আগে রচিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস।' আগে এই শ্রেণীর গান সভিয়াতকা অর্থাৎ খৃষ্টের জন্ম থেকে ব্যাপটিজ্‌মের দিনগুলো উপলক্ষ্যে যে উৎসব হতো, তাতে গাওয়া হ'তো। এখন সমাজে সেই উৎসব নেই, কিন্তু ঐ গান রয়েছে, এখন নববর্ষ উপলক্ষে তা গাওয়া হয়। গানের শেষে আছে জাতির প্রতি শুভেচ্ছা, শুভ নববর্ষে যাতে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম এবং প্রচুর খাদ্য পাওয়া যায়, তার কামনার প্রকাশ। এই গান গেয়ে গেয়ে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী যায়। সেখানে গৃহস্থের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে, আর গৃহস্বামী তাদের এই উপলক্ষ্যে খাদ্য এবং অন্যান্য জিনিস উপহার দিয়ে থাকেন।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বাংলার পল্লীতেও প্রায় অনুরূপ লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। তাও পোষ মাস অর্থাৎ প্রায় ইংরেজি নববর্ষের সমসাময়িক কালেই গাওয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশে তা ফসল ঘরে আনবার পর (post-hervest) অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলায় তাকে 'বাঘাইর বয়াৎ' বলে। তাতেও পল্লীর ছেলেরা (অবশ্য রুশ দেশের মত মেয়েরাও নয়) দলবেঁধে

গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী যায়, তাদের সমৃদ্ধি কামনা করে, তাদেরকে সাধ্যমত খাদ্য ও ভোজ্য দিয়ে গৃহস্থ আপ্যায়িত করে। বাংলাদেশেও তা কোন ধর্মাচারের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এই শ্রেণীর একটি গান আমার লেখা 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ১ম খণ্ডের ১৯০-৯১ পৃষ্ঠায় এবং আরও অনেকগুলো গান দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৬১ পৃষ্ঠা থেকে ৫৮৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে। সমাজের বৃত্তি অনুযায়ী তার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সেইজন্য পৃথিবীব্যাপী কৃষিভিত্তিক সমাজের সাংস্কৃতিকরূপ অভিন্ন। এখানেও দুই-ই কৃষিভিত্তিক সমাজ বলে তাদের লোক-সংস্কৃতির রূপেও এই ঐক্য দেখা যায়।

দ্বিতীয় গানটির নাম 'ভিয়েস্‌নিয়ান্‌কা'। মস্কো 'কন্‌সারভেটরি'র অভিযানের সময় ব্রিন্সকি প্রদেশে সংগৃহীত। সোভিয়েত রাষ্ট্রের আকাশবাণীতে এ সঙ্গীত পরিবেষিত হয়। আগে এই গান গেয়ে বসন্তকে আহ্বান করা হতো; সাধারণতঃ অল্পবয়স্কা এবং অবিবাহিতা মেয়েরাই এ গান গাইত। আজকের দিনেও মধ্য রাশিয়ায় এই গানের সমাদর আছে।

তারপর; পর পর তিনটি গানই বিয়ের গান। দুটি গান মেয়েদের গাওয়া, আর একটি গান পুরুষ এবং মেয়েদের মিলিত কণ্ঠে গাওয়া। এদের মধ্যে প্রথম গানটি বাংলায় কন্যা বিদায়ের গান বলা যায়, ইংরাজিতে তাকে bridal farewell song বলা হয়। রুশ ভাষায় তার অর্থ কান্নার গান, বা wailing song। গানের মধ্যে কান্নার ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, বিয়ের সময় কনের বাড়ীতে কনের আত্মীয়েরা এই গান গায়। কনের বান্ধবীরাও তার সঙ্গে যোগ দেয়।

তারপরের গানটি কন্যাবিদায়ের গান। বাল্‌টিক তীরবর্তী দেশগুলোতে কন্যাবিদায়ের গান লোক-সঙ্গীতের বিশিষ্ট অংশ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলেও এই শ্রেণীর গান প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে ওড়িয়া বধূর বিদায়-সঙ্গীত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাংলা ও উড়িষ্যায় প্রচলিত এই শ্রেণীর কয়েকটি গান আমার 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ১ম খণ্ডের (তৃতীয় সংস্করণ) পরিশিষ্ট 'খ'

৬৮৮ থেকে ৬৯১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। অনুভূতির গভীরতা এবং বেদনাবোধের তীব্রতায় এই শ্রেণীর রুশ ও ভারতীয় সঙ্গীতে কোন পার্থক্য নেই।

এরপরে নবদম্পতির সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিয়ের আসরে উপস্থিত প্রবীণ ও প্রবীণারা সমবেতভাবে যে গান গেয়ে থাকেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। এই গানের অর্থ নূতন সংসারে নবদম্পতির সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করা, তার মধ্যে বিচ্ছেদের কোনো স্পর্শ নেই। বিয়েতে যারা উপস্থিত থাকেন, তাঁরা নবদম্পতির, তাঁদের বাপ-মা, অতিথি সকলেরই গানের মধ্য দিয়ে প্রশংসা করেন। সুতরাং বিয়ের গানের তিনটি সুস্পষ্ট ভাগ দেখা গেল :—প্রথমতঃ কান্নার গান, তা'তে পরিবারস্থ সকলের কান্নাই প্রকাশ পায়, দ্বিতীয়তঃ কনের বিদায় কালীন কান্নার গান, তৃতীয়তঃ নিমন্ত্রিত প্রবীণদের আশীর্বাদসূচক গান।

তারপর যে গানটি দেওয়া হয়েছে, তার বিষয় তাতার আক্রমণ। ম্যাক্সিম গ্রেগরিয়েভিচ অ্যানথনভের মহাকাব্য থেকে বিষয়টি নেওয়া হয়েছে। এই মহাকাব্যে রাশিয়ার সঙ্গে তাতারদের সংঘর্ষের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনার ভঙ্গিতে প্রাচীনত্বের লক্ষণ।

পরবর্তী গানটি রুশ এপিক 'ইলিয়া, মুরমিয়েৎস ও সলোভিয়েই রাজভইনিক' ওলোনিয়েৎস্কোর বিখ্যাত গায়ক এফিমা গ্রিগরিয়েভিচ রিয়াবিনিন থেকে নেওয়া। লেনিনগ্রাদ স্টেটের Philharmonic Societyর শিল্পী ইয়েফ্রেম বরিসভিচ্ ফ্লাস্ক এর গায়ক। পৌরাণিক বীর ইলি মুরোমিয়েৎস্, তিনি মাতৃভূমিকে তার শত্রু সলভ্ রাজ বইনিকের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তাঁর বীরত্বপূর্ণ কাহিনী এই মহাকাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

এর পরের যে গানটি, তা হলো, এফিমা গ্রেগরিয়েভিচের পুত্র ইভান এফি-মেভিচ্ রিয়াবিনিন-এর লেখা মহাকাব্যের 'ভোলগা ও মিকুলা' অংশটি। ইয়েফ্রিয়েম বরিসভিচ্ ফ্লাক্স এর গায়ক। এই মহাকাব্যের মধ্যে ম্যাজিসিয়ান ভিউক ভোলগা

সভিয়াতোস্লাভো-ভিচের দলের সঙ্গে কৃষক মিকুলা সোলিয়ানিনো-ভিচের সংগ্রামও জয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আগের রেকর্ডটির মতন এইটিও আনিয়েস্ক অঞ্চলের এপিক, জাতীয় ঐতিহ্যমূলক কাহিনীর মধ্যে পড়ে।

পরের গানটি 'দবরিন ও জমিয়েঅ্যা' মহাকাব্য ডন-এর কসাক্‌রা গেয়ে থাকে। এটা কনস্‌তানতিনভক্স-রাসতোভস্ক অঞ্চলের শ্রমিক (workman's) বস্তীর পারিবারিক সমবেত সঙ্গীত (chorus)। রেকর্ডটি ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের। বীর দবরিন কি ভাবে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে রাশিয়াকে তার শত্রু জমিয়েয়্যার হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন, এখানে সেই কথাই বলা হয়েছে। শত্রু রুশদেশের লোকদের বন্দী করে রেখে তাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছিল। তার জীবন্ত বর্ণনা এতে পাওয়া যায়।

এর পরের গানটি ইয়েরমাক এর বিষয় গান, কনসতানমিনভক্স-রাসতোভক্স অঞ্চলের ডন-কসাক শ্রমিকশ্রেণীর সমবেত পারিবারিক সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে। ১৬শ শতকের এই সঙ্গীতের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক। রেকর্ডগুলো থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে, 'দরবিন ও জমিয়েঅ্যা' ও 'ইয়েরমাকে'র বিষয়ে গানের সুর কসাক অঞ্চলে প্রচলিত মহাকাব্যের সুর। এগুলো ঐতিহাসিক সঙ্গীতের খুব কাছাকাছি যায়। এগুলোর মধ্যে গীতিধর্ম প্রবল। এদের সুর গীতি-লক্ষণাক্রান্ত মহাকাব্যের সুর।

তারপরের স্তেপান রাজন্‌ বিষয়ক গানগুলো 'লাল সূর্য ওঠো ওঠো' ভল্গার তীরবর্তী লোকেদের লোক-সঙ্গীত। বীর স্তেপান রাজন্‌-এর প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা এর বিষয়বস্তু।

তারপর উরাল অঞ্চলের লোক-সঙ্গীত 'তুবরভুসকা' পুরুষরা গেয়ে থাকে। পুস্কিনের 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে' উপন্যাসে এই গান নায়ক পুগাচোভের খুব প্রিয় গান হিসেবে দেওয়া আছে। এর বিচিত্র সুরের জন্য পুরুষদের এই lyrical গান খুবই জনপ্রিয় এবং এতে গলার কাজও খুব বেশি (rich with vocal ornamentation) হয়ে থাকে।

পরেরটি মেয়েদের 'লিরিকাল' গান উষার আহ্বান—'Oh you Dawn, Dawn' ; সংস্কৃতি ভবনে ameteur vocal essemble-এ লেনিনগ্রাদ শহরের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গাওয়া হয়। এ গান ধীরগতির গানের একটি উদাহরণ।

পরের গানটি রুশ লোকসঙ্গীত 'দয়ালু ক্যানারী পাখী' ওমস অঞ্চলের মেয়েদের সমবেত লোকসঙ্গীত। গায়িকা একাতেরিনা আলেকসিয়েভনা করভিনা এই গানের দলের পরিচালনা করেছেন। এইটি শহর-জীবনেব রোমান্সের ওপর কৃষকদের লেখা গান।

তারপর গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে গান 'প্রভাতে ও সকালে' (In the dawn in the morning) আরখাংগেলস্ক অঞ্চলের সালাকুজ গ্রাম-সোভিয়েতের সমবেত সঙ্গীত। এই ধরনের একসঙ্গে গোল হয়ে গান (singing in a circle) বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। এগুলো ধীরে ধীরে হতে পারে, আবার দ্রুত তালেও হয়। এর সঙ্গে অভিনয়ও থাকে, আবার অভিনয় ছাড়াও হয়। গানের সুরের সঙ্গে মেয়েরা হাত ধরে গোল হয়ে একটি বৃত্ত রচনা করে আসে। এই নাচের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর মসৃণ পদক্ষেপ দেখান। (Fundamental meaning of the dance is to show smooth and beautiful stepping)। মঞ্চের ওপর একদল আরেক দলের উদ্দেশ্যে নাচে ; তার মধ্য দিয়ে যেমন বহুমুখী অঙ্গচালনা হয়, তেমনি একটা ঐকতানেরও সৃষ্টি হয় (To exhibit harmony versatility of movements.)।

একসঙ্গে গোল হয়ে নাচা ও গান করা 'আমাদের এখানে ঘাসের ওপরে' (In our place along the grass) কালাস্কা অঞ্চলের যৌথ খামারের কৃষকদের সমবেত সঙ্গীত। এটি দ্রুত তালের সমবেত সঙ্গীতের একটি উদাহরণ। গানের বিষয়, একটি যুবক কি ভাবে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে বা পার্টিতে একটি যুবতীর দ্বারা অবহেলিত হয়েছিল।

তারপর নাচের সঙ্গে গান 'আমরা সব গান গেয়েছিলাম'।

কুইভসিয়েভ অঞ্চলের উতেবস্ক্ জেলার দমাস্ক গ্রামের যৌথ খামারের কৃষকদের সমবেত অনুষ্ঠানে গাওয়া। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের রেকর্ড। ছোট ছোট মশাদের নিয়ে মজা করে চমৎকার গান বেঁধে গাওয়া হচ্ছে। নাচের তালের মধ্যেই হাস্যরস জমাট হয়ে আছে (The Joke mostly embodied in dancing tune)। এই রেকর্ডের মধ্যে নাচিয়ে গায়কদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তারপর চাস্তুস্কা ; কৌতুকপূর্ণ লোকসঙ্গীত বরনিয়েৎস্ অঞ্চলের 'স্ত্রাদানি'র উদাহরণ। চাস্তুস্কার মধ্যে সঙ্গীত এবং কাব্য দুই-ই আছে। এগুলো নানা রকমের হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে ছোট পংক্তি। প্রত্যেক পংক্তি চার লাইনে শেষ হয়। একটি পংক্তির ভাবের সঙ্গে অন্য একটি পংক্তির ভাবের কোন রকম মিল থাকবে না। এগুলো স্ত্রাদানির মতন ধীরগতিরও হয়, আবার চাস্তুস্কার মতন দ্রুতগতিতেও গাওয়া হয়।

তারপর পস্ক্ভস্ক অঞ্চলের চাস্তুস্কা কণ্ঠসঙ্গীত। এই গানটি খুব উঁচু গলায় গাওয়া। আস্তে আস্তে বালালাইকায়ও গানটি হচ্ছে (বালালাইকা এক জাতীয় রুশ তারের যন্ত্র, হাতে বাজান হয়ে থাকে)। পাস্কভস্ক অঞ্চলে এ ভাবে চাস্তুস্কা গাওয়াকে মুখে গাওয়া বা under the tongue বলে। চাস্তুস্কার সুর বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে

চাস্তুস্কা যে সুর সকলের কাছেই বেশ পরিচিত, তার বাইরেও এক রকম আঞ্চলিক সুর আছে। বিভিন্ন ধরনের লোকসঙ্গীতের মধ্যে কাব্যগুণের জন্য চাস্তুস্কার স্থান সকলের উপরে। তা ছাড়া সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করে চাস্তুস্কা রচনা করা হয় বলেও লোক-সঙ্গীতের মধ্যে চাস্তুস্কা সকলের আগে আগে চলে। অন্যান্য যন্ত্র ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অ্যাকর্ডিয়ান, বালালাইকা ও গুসিয়েল সহযোগেও চাস্তুস্কা গাওয়া হয়ে থাকে। এই সকল যন্ত্রের সঙ্গে গান ছাড়া কাঠে তৈরী বাঁশী জাতীয় (wind instrument) যেমন হর্ণ, ক্লারিওনেট যন্ত্রের সঙ্গেও সুরসৃষ্টি করা হয়। চাস্তুস্করা

পরেরটি মেয়েদের 'লিরিকাল' গান উষার আহ্বান—'Oh you Dawn, Dawn' ; সংস্কৃতি ভবনে ameteur vocal essemble-এ লেনিনগ্রাদ শহরের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গাওয়া হয়। এ গান ধীরগতির গানের একটি উদাহরণ।

পরের গানটি রুশ লোকসঙ্গীত 'দয়ালু ক্যানারী পাখী' ওমস অঞ্চলের মেয়েদের সমবেত লোকসঙ্গীত। গায়িকা একাতেরিনা আলেকসিয়েভনা করভিনা এই গানের দলের পরিচালনা করেছেন। এইটি শহর-জীবনের রোমান্সের ওপর কৃষকদের লেখা গান।

তারপর গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে গান 'প্রভাতে ও সকালে' (In the dawn in the morning) আরখাংগেলস্ক অঞ্চলের সালাকুজ গ্রাম-সোভিয়েতের সমবেত সঙ্গীত। এই ধরনের একসঙ্গে গোল হয়ে গান (singing in a circle) বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। এগুলো ধীরে ধীরে হতে পারে, আবার দ্রুত তালেও হয়। এর সঙ্গে অভিনয়ও থাকে, আবার অভিনয় ছাড়াও হয়। গানের সুরের সঙ্গে মেয়েরা হাত ধরে গোল হয়ে একটি বৃত্ত রচনা করে আসে। এই নাচের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর মসৃণ পদক্ষেপ দেখান। (Fundamental meaning of the dance is to show smooth and beautiful stepping)। মঞ্চের ওপর একদল আরেক দলের উদ্দেশ্যে নাচে ; তার মধ্য দিয়ে যেমন বহুমুখী অঙ্গচালনা হয়, তেমনি একটা ঐকতানেরও সৃষ্টি হয় (To exhibit harmony versatility of movements.)।

একসঙ্গে গোল হয়ে নাচা ও গান করা 'আমাদের এখানে ঘাসের ওপরে' (In our place along the grass) কালাস্কা অঞ্চলের যৌথ খামারের কৃষকদের সমবেত সঙ্গীত। এটি দ্রুত তালের সমবেত সঙ্গীতের একটি উদাহরণ। গানের বিষয়, একটি যুবক কি ভাবে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে বা পার্টিতে একটি যুবতীর দ্বারা অবহেলিত হয়েছিল।

তারপর নাচের সঙ্গে গান 'আমরা সব গান গেয়েছিলাম'।

কুইভসিয়েভ অঞ্চলের উতেবস্ক্ জেলার দমাস্ক গ্রামের যৌথ খামারের কৃষকদের সমবেত অনুষ্ঠানে গাওয়া। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের রেকর্ড। ছোট ছোট মশাদের নিয়ে মজা করে চমৎকার গান বেঁধে গাওয়া হচ্ছে। নাচের তালের মধ্যেই হাস্যরস জমাট হয়ে আছে (The Joke mostly embodied in dancing tune)। এই রেকর্ডের মধ্যে নাচিয়ে গায়কদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তারপর চাস্তুস্কা ; কৌতুকপূর্ণ লোকসঙ্গীত বরনিয়েৎস্ অঞ্চলের 'স্ত্রাদানি'র উদাহরণ। চাস্তুস্কার মধ্যে সঙ্গীত এবং কাব্য দুই-ই আছে। এগুলো নানা রকমের হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে ছোট পংক্তি। প্রত্যেক পংক্তি চার লাইনে শেষ হয়। একটি পংক্তির ভাবের সঙ্গে অন্য একটি পংক্তির ভাবের কোন রকম মিল থাকবে না। এগুলো স্ত্রাদানির মতন ধীরগতিরও হয়, আবার চাস্তুস্কার মতন দ্রুতগতিতেও গাওয়া হয়।

তারপর পস্ক্ভস্ক অঞ্চলের চাস্তুস্কা কণ্ঠসঙ্গীত। এই গানটি খুব উঁচু গলায় গাওয়া। আস্তে আস্তে বালালাইকায়ও গানটি হচ্ছে (বালালাইকা এক জাতীয় রুশ তারের যন্ত্র, হাতে বাজান হয়ে থাকে)। পাস্কভস্ক অঞ্চলে এ ভাবে চাস্তুস্কা গাওয়াকে মুখে গাওয়া বা under the tongue বলে। চাস্তুস্কার সুর বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে

চাস্তুস্কা : যে সুর সকলের কাছেই বেশ পরিচিত, তার বাইরেও এক রকম আঞ্চলিক সুর আছে। বিভিন্ন ধরনের লোকসঙ্গীতের মধ্যে কাব্যগুণের জন্য চাস্তুস্কার স্থান সকলের উপরে। তা ছাড়া সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করে চাস্তুস্কা রচনা করা হয় বলেও লোক-সঙ্গীতের মধ্যে চাস্তুস্কা সকলের আগে আগে চলে। অন্যান্য যন্ত্র ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অ্যাকর্ডিয়ান, বালালাইকা ও গুসিয়েল সহযোগেও চাস্তুস্কা গাওয়া হয়ে থাকে। এই সকল যন্ত্রের সঙ্গে গান ছাড়া কাঠে তৈরী বাঁশী জাতীয় (wind instrument) যেমন হর্ণ, ক্লারিওনেট যন্ত্রের সঙ্গেও সুরসৃষ্টি করা হয়। চাস্তুস্করা

সুর নাচের মধ্যেও তোলা যায়, সমবেত নৃত্যেও চাস্তুস্কার স্থান আছে।

মোট এই চৌদ্দ রকমের গান টেপ রেকর্ডের মাধ্যমে আমাকে উপহার দেওয়া হলো।

উপরের জিনিসগুলো সংগ্রহ করে বর্ণনা তৈরী করেছেন বে. এম. দভরভলস্কি। এগুলোকে শব্দযন্ত্রে ধরেছেন দে. ভে. সামছুরভ। সবগুলোই পুস্কিন ভবনের রুশ সাহিত্য পরিষদের লোক-সাহিত্য বিভাগের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত; ৩১শে মার্চ তারিখে আমাকে উপহার দেবার উদ্দেশ্যে লেনিনগ্রাদ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকর্ড করা হয়েছে।

(খ)

প্রাচ্য বিদ্যাভবন

আজ ১লা এপ্রিল। সকাল থেকেই আকাশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন। বেলা ১০টা থেকেই বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে। প্রাতরাশ শেষ করে আগামী বক্তৃতাটা লিখছিলাম, হঠাৎ কাচের জানালার ভিতর দিয়ে যখন দেখতে পেলাম, গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়্তে আরম্ভ হয়েছে, তখন আর কিছুতেই লেখায় মন বসাতে পারলাম না। ওভারকোট টুপী পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ব এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠ্ল। শ্রীমতী ইরা টেলিফোন করে জানালেন, তিনি দেড়টার সময় এসে আমাকে Oriental Institute বা প্রাচ্যবিদ্যা ভবনে নিয়ে যাবেন।

প্রাচ্য বিদ্যাভবনের ভারতীয় বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কলিয়ানভ প্রতিদিনই আমার বক্তৃতায় উপস্থিত থাকেন। একদিন তিনি প্রাচ্য বিদ্যাভবন পরিদর্শন করবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আজ অর্থাৎ ১লা এপ্রিল তারিখই সেখানে যাবার জন্য স্থির হয়েছে, সেজন্য দুপুরে আর কোথাও বেরুনো হলো না। শ্রীমতী ইরা প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের ভারতীয় বিভাগেরই গবেষণা-কর্মী, তাঁরই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার কথা, তাই তাঁর বারোটার সময়ই হোটেলে আসবার কথা ছিল। টেলিফোন করে তাঁর আস্‌বার সময় তিনি আরও দেড় ঘণ্টা পিছিয়ে নিলেন।

তাঁর টেলিফোন পেয়ে ভাবলাম, যাক, তাঁর আস্‌বার এখনও ত অনেক দেরী, একটু সাম্‌নের পার্কটা থেকে ঘুরে আসি। আজ কয়েকদিন পর আবার বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে; সুতরাং ঐ দিনটা কেবল ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসে বক্তৃতা লিখেই কাটাতে পারি নে।

বেরিয়ে পড়লাম। এ কয়দিন বরফ না পড়ায় রাস্তাঘাট একটু পরিষ্কার হয়েছিল। কিন্তু পার্কে কিংবা অন্যত্র সব জায়গাতেই বরফের

স্তূপ রাশীকৃত হয়ে পড়েছিল। তবু চলাচলের পথঘাটটা পরিষ্কার থাকলে বিশেষ বিরক্তিকর বলে মনে হয় না। আবার পথের উপর ফুটপাতে বরফ জমতে লাগল।

রাস্তাটা পার হয়ে মস্কোভাস্কির উল্টোদিকেই একটা পার্ক। সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। পার্কে কোন জনমানব নেই, একটা বেঞ্চির ওপর থেকে খানিকটা বরফ ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানে চুপ করে বসে রইলাম। নিরবচ্ছিন্ন তুষার পাতের মধ্যেই নীরবে যানবাহন ও নরনারী চলেছে লাগল। আমারও মাথার টুপীর উপর গায়ের ওভারকোটে বরফের কণা জম্‌তে লাগ্‌ল। এক একবার উঠে গা ঝাড়া দিয়ে তা ফেলে দিতে লাগ্‌লাম।

অনেকক্ষণ এইভাবে ছিলাম; হঠাৎ মনে হলো, শ্রীমতী ইরা আসবার আগেই মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিই; নয় তো তিনি এসে গেলে খাবার সময় পেরিয়ে যাবে।

ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে ঘরের ভেতর ঢুক্‌তেই দেখি শ্রীমতী ইরা এসে প্রবেশ করলেন।

তিনি বল্লেন, চলুন, বেরিয়ে পড়ি, আমরা দেড়টায় পৌঁছব বলেই অধ্যক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি, তিনি অপেক্ষা করবেন।

আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। অবিরাম তুষারপাতের মধ্যেই আবার বেরিয়ে পড়লাম।

ট্রলী বাসে করে খানিকটা পথ গিয়েই হাঁটা পথ ধর্‌তে হলো। ফুটপাতের উপর পাতলা বরফের স্তর জমেছে, আমার জুতোর নতুনত্ব তখনও কাটেনি, প্রতি মুহূর্তেই পিছলে পড়বার আশঙ্কা; শ্রীমতী ইরা বুঝ্‌তে পেরে আমাকে নিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে পথ চলতে লাগলেন। পথ প্রায় জনহীন, বড় পথ থেকে একটা গলির মত পথে পড়লাম! আকাশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তার উপর অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে; জনহীন পিচ্ছল পথের উপর দিয়ে এক বিদেশিনীর উপর একান্ত নির্ভর করে এক অপরিচিত মহানগরের পথে চলেছি। ভয় এবং শঙ্কা অনেক আগেই দূর হয়েছে।

শ্রীমতী ইরা বল্লেন, একটা সোজা পথ দিয়ে আপনাকে নিয়ে এলাম। বড় রাস্তায় গেলে অনেকখানি ঘুরতে হতো।

আমি বল্লাম, না, না, পথ চল্‌তে আমার বেশ ভালই লাগছে। এমন বরফ পড়ার মধ্যে পথ চল্‌বার সুযোগ আর কোথায় পাব ?

দেড়টায় এসে প্রাচ্য বিদ্যাভবনের দ্বারে এসে পৌঁছলাম। নেভা নদীর তীরে, অপর তীরবর্তী পিটার পাওয়েল দুর্গের প্রায় মুখোমুখী কোন জারের এক ভ্রাতার এক বিশাল পরিত্যক্ত প্রাসাদে প্রাচ্য বিদ্যাভবন বা Oriental Institute এখন স্থাপিত। ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লেনিনগ্রাদে এলে এখানে আসেন। ভারত বিদ্যা বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে কি ভাবে গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়, তা সকলেই প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পান।

দুটি দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট স্থানে টুপী ওভারকোট রেখে সাম্‌নের দিকে এগুতেই দেখা গেল অধ্যক্ষ কলিয়ানোভ আমার জন্য অধীর আগ্রহে সেখানে পায়চারী করছেন। আমাকে দেখা মাত্র দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠ্‌লেন, 'সুস্বাগতম্।' ইতিপূর্ব্বে আমার বক্তৃতা সভায় তাঁর সঙ্গে যে আলাপ হয়েছে, তা'তে তিনি ইংরাজিতেই আলাপ করেছেন, আমি তখনও জান্‌তাম না যে তিনি সংস্কৃতেও কথা বল্‌তে পারেন, সে দিনেই তা প্রথম জান্‌তে পেলাম।

তাঁর কথা শুনে আমি প্রথমটায় চম্‌কে উঠ্‌লাম। আমার পক্ষে তাঁর এই উক্তির সংস্কৃতেই যে একটা জবাব দেওয়া প্রয়োজন, তা বুঝ্‌তে পারলাম। কিন্তু এ'রকম অভ্যর্থনার উত্তরে সংস্কৃত ভাষায় যে কি বল্‌তে হয়, তা আমি জানিনে, চুপ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, আমার চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে বেরুতে লাগল।

তিনি আমাকে হাত বাড়িয়ে এক রকম বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি নির্লজ্জের মত ইংরেজি ভাষায় তাঁকে বল্‌লাম, আপনি বেশ সংস্কৃত বল্‌তে পারেন ত।

তিনি বিনীতভাবে সংস্কৃতেই আবার যা বল্লেন, তার অর্থ এই যে, না খুব ভাল বলতে পারি না, অল্পই পারি, ভারতীয় কেউ এলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে শিখ্‌বার চেষ্টা করি।

শুনে আমার মাথা লজ্জায় মাটির সঙ্গে নুয়ে পড়্‌ল! সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার আমার কোনদিন অভ্যাস নেই; যদি এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে বলে আগে জান্‌তে পারতাম, তবে যেমন করে হোক, কিছু না হয় অভ্যাস করে আসতাম।

নিজেই যেন নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি এখানে কি নিয়ে এসেছি? না বল্‌তে পার্‌ছি সোভিয়েতের রুশ ভাষা, না বল্‌তে পারছি ভারতের সংস্কৃত ভাষা, বিশেষতঃ এম. এ তে সংস্কৃত আমার বিষয় ছিল, ভট্টাচায্যি বামুনের সন্তান, বাড়ীতে পূর্ব পুরুষের টোল ছিল, আজকে এই বিদেশীর সংস্কৃত প্রশ্নের জবাবে আমাকে ইংরেজি ভাষায় তার জবাব দিতে হলো। একবার ভাবলাম, সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা অভ্যাস না করে আমার এখানে না আসাই ভাল ছিল।

অধ্যক্ষ কলিয়ানোভ আমাকে নিয়ে ভারতীয় বিভাগের গবেষক-দের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে চাইলেন। প্রায় সর্বক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে চল্লেন। তাঁর উচ্চারণ স্পষ্ট, ভাষা সহজ; বুঝ্‌তে আমার কিছুই কষ্ট হয় না। কিন্তু এই বিষয়ে কোনদিন কোন অভ্যাস করিনি বলে, সংস্কৃত ভাষায় তাঁর কোন কথারই আগাগোড়া জবাব দিতে পাচ্ছিনে; এক একবার এক একটা বাক্য বল্‌তে আরম্ভ করি, বেশ অনেকখানি বলেও ফেলি, তিনিও প্রসন্ন মুখে আমার দিকে তাকান, শেষ পর্যন্ত গিয়ে বাক্যটি অনেক সময় সংস্কৃত শব্দ দিয়ে শেষ করতে পারি নে। এই অক্ষমতা আমাকে অন্তরে অন্তরে কি তীব্র আঘাত করতে লাগল, তা বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না।

প্রাচ্য বিদ্যাভবনে বিভিন্ন বিভাগ—আরবি, পারসি, ইরানী, ইন্দোনেসিয়, চীনা, জাপানী, মধ্যএসিয়া ইত্যাদি। বিরাট রাজ-প্রাসাদের বিভিন্ন বিস্তৃত অংশ এদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র গবেষণাগার গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি রাখ্‌বার স্থান। সর্বত্র নীরবে কর্মীরা

তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন। অধ্যক্ষ কলিয়ানোভ বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ-অধ্যক্ষাদের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিলেন। অবশেষে ভারতীয় বিভাগে গিয়ে পৌঁছানো গেল।

সংস্কৃত মহাভারতের তু'খণ্ড রুশ অনুবাদ ইতিমধ্যেই এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তার কাজ আরও অগ্রসর হচ্ছে দেখ্‌তে পেলাম। নানা বিষয়ের সংস্কৃত পুথির পাণ্ডুলিপি সেখানে রক্ষিত আছে। তাদের মধ্যে সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের পুঁথিটির সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। অনেকদিন থেকেই এই পুঁথিটি নিয়ে জার্মান ও রুশ দেশীয় পণ্ডিতগণ বহু মূল্যবান্ গবেষণা করে আসছেন।

ভারতীয় বিভাগের সকল বয়সের গবেষকদের সঙ্গেই আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। তাঁদের মধ্যে কেউ হিন্দী, কেউ মারাঠি, কেউ তামিল, কেউ বাংলা নিয়ে গবেষণা করছেন; ঐ সব ভাষায় তাঁরা ইতিমধ্যেই অধিকার লাভ করে মূল গ্রন্থাদিও পাঠ করবার শিক্ষা লাভ করেছেন।

একজন মারাঠি ভাষা বিষয়ক তরুণ গবেষক আমাকে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে, তিনি প্রমাণ করবেন, মারাঠি ভাষা দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্ভুক্ত, ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদিও আমি ভাষাতত্ত্ববিদ্ নই, তবু এ সম্পর্কে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, তা নিয়ে বুঝ্‌তে পারলাম, এ দাবী নিতান্তই উদ্ভট।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা' আপনি কি করে প্রমাণ করবেন?

তিনি ইংরেজিতে বল্লেন, দেখ্‌বেন, আমি করব; আমার অকাট্য যুক্তি আছে।

আমি তাঁর কথায় কিছু মাত্র গুরুত্ব আরোপ না করে বল্লাম, আচ্ছা বেশ তো।

এই বিভাগের সবাই ইংরেজি বই পড়্‌তে পারেন, অনেকে ইংরেজি বল্‌তেও পারেন। সবাই ইংরেজিতেই আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলেন।

আমার আজকের দোভাষিণী শ্রীমতী ইরা স্বয়ং এই বিভাগে বাংলা বিষয়ের গবেষক। তিনি ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' রুশ ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। 'যোগাযোগ' বইখানিও অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছেন। এই বিষয়ে তিনি যে আমার কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করেছেন, সে কথা আগেই বলেছি।

এই বিভাগের গবেষকগণ আমাকে তাঁদের প্রকাশিত কয়েকখানি মুল্যবান বই উপহার দিলেন। তাদের মধ্যে ভারতীয় রূপকথার একটি রুশ অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জি. জোগ্রাফ (G. Zograf) এবং বি. রুসনেৎশভ (B. Rusnetsav) এই দুই জন গবেষক তাঁদের নিজেদের নাম স্বাক্ষর করে বইখানি আমার হাতে দিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রূপকথা রুশ ভাষায় অনুবাদ করে একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রুশ ভাষা না জেনেও তার রেখাচিত্রগুলো দেখে মনে হলো, গল্পগুলো আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের নিতান্ত পরিচিত, রুশ শিল্পীর আঁকা চিত্রগুলো যেন জীবন্ত। একটি বিস্তৃত ভূমিকায় ভারতীয় রূপকথার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ভাবে সম্পাদিত হয়ে ভারতীয় রূপকথার কোন বই ভারতীয় ভাষায় আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

কিন্তু এ'র উপহার দাতাদের একজন অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে আমাকে বল্‌লেন, এ'তে বাংলার কোন রূপকথা দেওয়া হয় নি এবং কেন দেওয়া হয় নি তারও একটা কি কারণ বল্লেন।

·আমি একটু বিস্মিত হলাম ; ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলার রূপকথার বইই বোধ হয় বিদেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তা' রেভাঃ লালবিহারী দের *'Folktales of Bengal'*। পৃথিবীর বিভিন্ন লোক-কথা রসিকগণ তা' তাঁদের গবেষণা মূলক আলোচনায় নানা ভাবে ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও বাংলার কোন রূপকথা তার মধ্যে স্থান লাভ করেনি কেন, তা বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না।

আমি তার জবাবে বিশেষ কিছু না বলে কেবল বল্লাম, আশা করি ভবিষ্যতে বাংলার রূপকথাও এর মধ্যে স্থান পাবে।

তবে একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করলাম। লালবিহারী দে সঙ্কলিত রূপকথাগুলো যথার্থই রূপকথা এবং সে জন্যই আকারে এক একটি অত্যন্ত দীর্ঘ। কিন্তু এই সঙ্কলনের প্রতিটি কথাই সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ প্রকৃত রূপকথার ধর্ম বিবর্জিত উপকথা মাত্র। বিদেশী ভাষায় বাংলা উপকথার কোন সংগ্রহ নেই এবং বাংলাতেও যে তার সংগ্রহ খুব প্রচুর আছে, তা মনে করার কোন কারণ নেই। সেই জন্যেই সম্ভবতঃ বিদেশী অনুবাদকের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হতে পারে নি। আমরা আমাদের নিজের জিনিসগুলোর প্রতি যদি আমাদের কর্তব্য পালন না করি, তবে সেজন্য বিদেশী গবেষকদের দোষ দিয়ে কিছু লাভ নেই। আমি ইতিপূর্বে শ্রীযুক্তা নভিকোভাকে দু খণ্ড বাংলার রূপকথা—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র সঙ্কলিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও ঠাকুরদাদার ঝোলা' উপহার দিয়েছিলাম, তিনি তাদের অনুবাদ করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এ'বার ভারতীয় বিভাগের পাণ্ডুলিপিগুলো যেখানে সংগৃহীত আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। অধ্যক্ষ কলিয়ানোভ এবং কয়েকজন গবেষকও আমার সঙ্গে সেখানে এলেন। রুশ সমাট্ জারের ভ্রাতার প্রাসাদের মধ্যে এই কক্ষটিই নৃত্যকক্ষ (Ballet Hall) রূপে একদিন ব্যবহৃত হোত। প্রায় সমগ্র দেয়াল জুড়ে বিরাট এক একটি আয়না চারদিকে কারুকার্য মণ্ডিত সোনালি ফ্রেমে বাঁধা, বাইবেলের কাহিনী অবলম্বন করে উপরে ছাদের গায়ে চিত্রিত রঙিন সুন্দর চিত্র। চমকপ্রদ কারুকার্য খচিত মূল্যবান কাঠের দরজা ও জানালার চৌকাঠ; নাচবার সুবিধের জন্য মূল্যবান কাঠে আগাগোড়া মোড়া মেজে। তার মাঝখানে সারি সারি পাণ্ডুলিপি ভর্তি আধুনিক কাঠের আলমারি; প্রাচীন রাজৈশ্বর্য পূর্ণ কক্ষ-সজ্জার মধ্যে এ'গুলো নিতান্ত বেমানান বলে মনে হতে লাগল। চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, মনে মনে ভাবলাম্ এখানে পাণ্ডুলিপি-

গুলোকে সাজিয়ে রেখে জারের যুগের রাজৈশ্বর্যকে যেন লাঞ্ছিত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে ; জীর্ণ সভ্যতার কঙ্কালগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অতীত যুগের ঐশ্বর্য যেন এখনও বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌ছে।

অধ্যক্ষ কলিয়ানোভ বল্লেন, আমাদের কিছু বাংলা পুঁথির সংগ্রহ আছে ; কিন্তু সেগুলো যে কোন বিষয়ে কে কবে লিখেছেন, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি নি। আপনি দয়া করে যদি একটু কষ্ট স্বীকার করেন, তবে এগুলোর পরিচয় উদ্ধার করা যেতে পারে।

ভাগ্যে বাংলা পুরানো পুঁথি (manuscript) পড়বার অভ্যাস ছিল, সেজন্য এবার বেঁচে গেলাম ; বিশেষতঃ যখন বুঝতে পারলাম, এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের আমিও কোন কাজে লাগ্‌তে পারি বলে তাঁরা আমাকে মনে করেছেন, তখন যেন মনটা একটু প্রসন্ন হয়ে উঠল।

আমি খুব বিজ্ঞের মত বল্লাম, আনুন, দেখি।

এক একটি করে পুঁথি আমার সাম্‌নে নিয়ে এসে রাখা হতে লাগ্‌লো। পুঁথিগুলো পরম যত্নে রক্ষা করা হয়েছে। কি ভাবে কবে যে এইবাংলা পুরাণো পুঁথিগুলো এত দূর বিদেশের প্রাচীন গ্রন্থশালায় এসে স্থান লাভ করল, তা বুঝে উঠতে পারলাম না ; এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করাও সমীচীন বোধ করলাম না।

প্রথমেই একটি বেশ বড় রকমের একখানি পুঁথি খুলে দেখতে গেলাম। দেখলাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রাচীন সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা বাংলা পুঁথি। কোথাও পোকায় কাটা নেই, কোথাও ছেঁড়া কিংবা ময়লা দাগ নেই, তুলোট কাগজে লেখা সুন্দর পুঁথি ; ওরকম পুঁথি আমাদের দেশে দেখতে পাই না। একটু পড়েই বুঝতে পারলাম, রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী'র পুঁথি। পুঁথিখানি বড় মূল্যবান্। কারণ, রঘুনাথ পণ্ডিত চৈতন্যদেবের সমসাময়িক একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। এ'খানি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম থেকে নবম স্কন্দ পর্যন্ত বাংলা পদ্যানুবাদ। চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগববতের মাত্র দশম ও একাদশ স্কন্দ দুটির

অনুবাদ করেছিলেন; তার পূর্ববর্তী স্কন্দগুলো অনূদিত হয়নি। পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ এই নয়টি স্কন্দের অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, তা মুদ্রিত হয়েও আমাদের দেশেও প্রকাশিত হয়েছে।

লেনিনগ্রাদের এই পুঁথিখানি বেশ প্রাচীন বলে মনে হলো। অধ্যক্ষ কালিয়ানোভ বল্লেন, আপনাদের গ্রীষ্মের দেশে পাণ্ডুলিপি-গুলো সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এ'দেশে তা হয় না। পোকায় কাটা পাণ্ডুলিপি দেখলেই আমরা বুঝতে পারি, তা ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। অনেকদিন ধরেই এই পাণ্ডুলিপিখানি এদেশে আছে বলে তার কোনো ক্ষতি হয় নি।

আমার মনে হলো, সম্ভবতঃ পাণ্ডুলিপিখানি লেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে চলে এসেছিল, নতুবা ভারতীয় জলবায়ুর ক্ষতচিহ্ন থেকে তা মুক্ত থাকৃতে পারত না। অক্ষর দেখে মনে হলো, পাণ্ডুলিপিখানি সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল। রঘুনাথ পণ্ডিত ষোড়শ শতাব্দীর লোক এবং চৈতন্যদেবের প্রায় সমবয়সী ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর চৈতন্যদেব একবার পুরী থেকে বাংলায় এসেছিলেন। তখন কোলকাতার অনতিদূরে বরানগরে তিনি রঘুনাথ পণ্ডিতের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন: সেইখানে রঘুনাথ তাঁকে ভাগবত পাঠ করে শোনান। তাঁর ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দেন। সেই অবধি তিনি এই নামেই পরিচিত। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলে অর্থাৎ ষোড়শশতাব্দীতে অনূদিত এই ভাগবতের অনুবাদখানির সেইজন্যই একটি বিশেষ মূল্য আছে।

আমি পুঁথিটি ও তার লেখকের পরিচয় বলে দিলাম, তাঁরা তা লিখে নিলেন। এমনই ভাবে আর কয়েকটি, মোট সাত আটটি পুঁথি খুলে দেখা গেল। তাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র একটি অংশ, নরহরি দাসের পদাবলীর একটি খণ্ডিত সংগ্রহ, 'পদসমুদ্র' নামক বৈষ্ণব পদসঙ্কলনের একটি সম্পূর্ণ

পুঁথি—এমনই আরও কয়েকটি পুঁথি ছিল। বাংলা অক্ষরে লেখা অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথিও এদের সঙ্গে মিশানো ছিল। তাদের মধ্যে একখানি বাংলাদেশের স্মৃতির খণ্ডিত পুঁথি ও কয়েকখানি ক্রিয়াকর্মের পুঁথিও ছিল।

পুঁথিগুলো দেখছি, এমন সময় একজন অল্প বয়স্কা মহিলা এসে আমার সাম্‌নের একটা চেয়ারে বস্‌লেন। শ্রীমতী ইরা আমাকে তাঁর সঙ্গে এই বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে তিনি আমারগল্পের বই 'বনতুলসী'র একটি গল্প রুশ ভাষার অনুবাদ করেছেন।

আমি বাংলাতে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বাংলা জানেন বুঝি।

তিনি চুপ করে বসে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না।

আমি একটু বিস্মিত হলাম, এ' কি ব্যাপার? ইরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, উনি আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না কেন?

ইরা বল্লেন, তিনি বাংলা পড়্‌তে পারেন, পড়্‌লে বুঝতেও পারেন, কিন্তু বাংলা বল্‌তে পারেন না।

তারপর ইংরেজিতেই তাঁকে দুএকটি কথা জিজ্ঞেস করলাম। তারও কোন জবাব দিলেন না, চুপ করে বসে রইলেন। মুখে এক একবার চাপা হাসি লুকোতে চাইছেন। আমি বুঝ্‌তে পারলাম, তিনি ইংরেজিও জানেন না। অন্ততঃ জান্‌লেও বল্‌তে পারেন না। আমার গল্পের বিদেশী ভাষায় প্রথম অনুবাদকারিণীকে চোখের সাম্‌নে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেয়েও কোন বাক্য বিনিময় কর্‌তে পারলাম না ভেবে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ল। তবু নিজেই বলে গেলাম, আমার গল্প অনুবাদ করবার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নিরুত্তরেই তিনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করলেন।

এ'বার বিদায়ের পালা। অধ্যক্ষ কলিয়ানোভ একটি বিরাট খাতা বার করে বল্লেন, এ'তে নাম সই করুন। পাতা উল্টে দেখি ভারতের পরলোকগত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের হিন্দী স্বাক্ষর।

কলিয়ানোভ বল্লেন, ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা লেনিনগ্রাদে আসেন, তাঁরা এখানেই প্রথম আসেন, এই খতায় তাঁদের স্বাক্ষর থাকে। দেখলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর এন্. কে. সিংহ ইংরেজীতে স্বাক্ষর দিয়ে গেছেন। আমিও বিশেষ কিছু না ভেবে ইংরাজিতেই একটি স্বাক্ষর করে দিলাম।

ইরা বল্লেন, আপনার স্বাক্ষরটি বাংলায় হলেই ভালো হতো।

শুনে লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়্ল।

অধ্যক্ষ কলিয়ানোভ ও গবেষকগণ আমাকে দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন।

অধ্যক্ষ কলিয়ানোভ আশীর্বচনের সুরে বল্লেন, 'শিবাস্তু সন্তু পন্থানঃ' এবং আমাদের দেশের যাত্রাকালীন শুভেচ্ছাসূচক বাণী 'পুনরাগমনায় চ' কথাটি পর্যন্ত উচ্চারণ করে বিদায় দিলেন।

আবার টুপী-ওভারকোট পরে দরজা ঠেলে আমি শ্রীমতী ইরাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে পথে এসে দাঁড়িয়েছি, ততক্ষণে বরফ পড়ার বিরাম হয়েছে।

ভূমিকা (গ)

জাতিতত্ত্ব-সংগ্রহশালা

জাতিতত্ত্ব গবেষণাগার ও সংগ্রহশালার ভারতীয় বিদ্যাবিভাগের গবেষক শ্রীযুক্ত এম. কে. কেদ্রিয়াভৎসেভ প্রত্যহ আমার বক্তৃতায় উপস্থিত থাকেন দেখ্‌তে পাই। তিনি প্রথমদিনই আমার বক্তৃতা শেষ হয়ে যাবার পর আমার সঙ্গে আলাপ করে তাঁর প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কর্‌তে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি খুব ভাল ইংরেজি বল্‌তে পারেন। ভারতীয় বিষয় নিয়ে লেখা বই তাঁকে এবং তাঁর সহকর্মীদের সর্বদাই পড়্‌তে হয় বলে তাঁদের ইংরেজি জানা বিশেষ দরকার; সেজন্য তাঁর বিভাগের সবাই ইংরেজি ভাষায় বেশ দক্ষ।

স্থির হলো, ২৭শে মার্চ বেলা এগারটার সময় এই প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন কর্‌তে যাওয়া হবে। সেই মত সে দিন সকাল ১০ টার সময়ই শ্রীমতী লেনা এসে হাজির হলেন, তিনিই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন। আমি আগে থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, শ্রীমতী লেনা আসবামাত্রই দেরী না করে বেরিয়ে পড়্‌লাম। এগারটার মধ্যেই সেখানে পৌঁছুলাম।

নেভা নদীর বাঁধের ধারে প্রশস্ত রাজপথের উপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী এক বিরাট প্রাসাদোপম গৃহে জাতিতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব-সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত। তার দ্বারদেশে পৌঁছুতেই সহকারী অধ্যক্ষ আমাকে অভ্যর্থনা করে তাঁর ঘরে নিয়ে বসালেন। তারপর দোভাষীর সাহায্যে আমি যে সংগ্রহশালা দেখ্‌বার জন্য এসেছি সেজন্য সন্তোষ প্রকাশ করলেন। শ্রীযুক্ত কেদ্রিয়াভৎসেভ্‌ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সহকারী অধ্যক্ষ তাঁর উপরই আমাকে সংগ্রহশালার সব বিভাগগুলো ঘুরিয়ে দেখাবার ভার দিলেন।

শ্রীকেদ্রিয়াভৎসেভ প্রথমেই আমাকে নিয়ে নিজের বিভাগে এসে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো, তিনি শ্রীমতী ভোলৎশক বার্থা। তিনি আন্দামানের ওঙ্গী নামক আদিবাসী নিয়ে গবেষণা কচ্ছেন। আমি যখন ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব সমীক্ষার সহকারী নৃতত্ত্ববিদ্ ছিলাম, তখন যে একবার আন্দামান গিয়ে ওঙ্গী জাতির জীবন প্রত্যক্ষ করে এসেছি, সে কথা শুন্‌তে পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং আমাকে এই বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ বিবেচনা করে, খুঁটিনাটি করে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর্‌তে লাগ্‌লেন। দেখ্‌লাম, তিনি আমাদের দেশের পরলোকগত নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহের প্রবন্ধ যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছেন; এমন কি, ভারতীয় নৃতত্ত্ব সমীক্ষার কোন কোন গবেষক আন্দামান নিয়ে কি লেখা কোথায় কখন প্রকাশ করেছিলেন, তার সকল সংবাদই নিয়েছেন। আমি এ' বিষয়ে আরও কতকগুলো নতুন প্রবন্ধের সংবাদ তাঁকে দিলাম এবং যাতে তিনি সেগুলো ভারতবর্ষ থেকে সহজেই পেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করে দিতে স্বীকৃত হলাম, তিনি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়্‌লেন বলে মনে হলো। তিনি বেশ ভালো ইংরেজি বল্‌তে পারেন।

একজন গবেষকের হাতে ভারতের সুপরিচিত নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর ভেরিয়র এলউইনের নাগা জাতি সম্পর্কে সদ্য প্রকাশিত একখানি বই দেখতে পেলাম। তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গে বইখানি পড়্‌ছিলেন। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলে আমার ও শ্রীমতী বার্থার সঙ্গে যে কথাবার্তা হচ্ছিল, তা' শুন্‌ছিলেন।

আমি কাছে গিয়ে তাঁর হাতে এলউইনের বইখানি দেখেই বল্লাম, আপনারা হয়ত জানেন, এই বইয়ের লেখক ডক্টর এলউইন মাত্র ছ'মাস আগে হঠাৎ পরলোকগমন করেছেন।

শুনে সেখানকার উপস্থিত সকলেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁরা এলউইনের নাম শুধু জানেন না, অন্তরে অন্তরে তাঁকে

সকলেই গভীর শ্রদ্ধা করে থাকেন ; তাঁর মৃত্যু কেবলমাত্র ভারতের নয়, আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ; অথচ আজ দু'মাসের বেশি হয়ে গেল, এ'দেশে সে সংবাদ এখনও এসে পৌঁছোয় নি।

শ্রীমতী বার্থা দুঃখ প্রকাশ করে বল্লেন, আগামী আগষ্ট মাসে আমরা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ২৫০ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন কর্‌ব, সেজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নৃতত্ত্ববিদ্‌দের নিকট আমন্ত্রণ লিপি পাঠানো হয়েছে, ডঃ এলউইনকেও আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

আমি বল্লাম, সে আমন্ত্রণ লিপি তাঁর হাতে পৌঁছোয় নি।

আমি ভারতীয় নৃতত্ত্ব সমীক্ষায় (Anthropological Survey of India) যখন কাজ করি, তখন ডক্টর ভেরিয়র এলউইন তার সহকারী অধ্যক্ষ (Deputy Director) ছিলেন। আমি তাঁর গবেষণা সহযোগী ছিলাম, তখন তাঁর সঙ্গে ভারতের নানা আদিবাসী অঞ্চল ভ্রমণ করে বিভিন্ন জাতির লোক-সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহ করেছি ; সে সময় তাঁর মধ্যে যে কর্মপ্রেরণা তথ্য নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পেয়েছিলাম, সে কথা সেখানে বসে ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগ্‌লাম। সবাই আকস্মিক আঘাতে বিমূঢ় হয়ে স্তব্ধভাবে সে কথা শুন্‌তে লাগ্‌লেন। কথা বল্‌বার শক্তিও যেন তাঁদের লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

আমি জানতাম, ডক্টর এলউইন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রবাদকে পছন্দ কর্‌তেন না। রাজনৈতিক দিক থেকে সোভিয়েতের মতবাদকে তিনি সমর্থন করতেন না ; রুশভাষা তিনি জান্‌তেন না এবং রুশ দেশীয় বই-এর ইংরেজি অনুবাদও যে তিনি পড়তেন, তাও নয়। তাঁর বিরাট ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের মধ্য কোন রুশ বই ছিল বলে আমি স্মরণ করতে পাচ্ছিনে। যখন আমরা দুজন আদিবাসী অঞ্চলে গিয়ে শিবির জীবন যাপন করতাম, তখন অবসর সময় দেশ বিদেশের রাজনীতি নিয়েও আলোচনা হতো। তার মধ্যে কোন কোন দিন

যখন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রবাদের কথা উঠত, তখন তার সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মন্তব্য শুনতাম। যদিও আমি রাজনীতি বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিনে, তবু শুনে শুনে আমারও তাঁরই মত বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আজ সোভিয়েত দেশে এসে সোভিয়েত গবেষকদের মধ্যে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত দুঃসংবাদের প্রতিক্রিয়া দেখ্‌তে পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম! পণ্ডিত গবেষকদের যে কোন রাজনীতি নেই, তাঁদের যে কোন জাত নেই, তাঁরা যে সবাই এক জাতের লোক, তা' এমন গভীর ভাবে আর কোনদিন কোথাও বুঝ্‌তে পারিনি।

অনেকক্ষণ ধরে সেখানে বসে বসে সকলেই ডঃ এলউইনের নানা বইয়ের নানা গুণাবলী নিয়ে আলোচনা কর্‌তে লাগ্‌লেন; এলউইনের সব বই-ই ভারতীয় উপজাতির লোকসংস্কৃতি বিষয় নিয়ে লেখা। তাঁরা যে ভাবে এলউইনের বইগুলো নিয়ে আলোচনা করলেন তাতে আমার মনে হলো, এদেশের গবেষকগণ ভারতীয় তথ্য নিয়ে গভীর অনুশীলন করছেন। আমাদের দেশের গবেষকদের মধ্যে এলউইনের সম্পর্কে এত বিস্তৃত জ্ঞানের পরিচয় খুব সুলভ নয়।

শ্রীমতী বার্থা আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জাতির গ্যালারিগুলো দেখাতে নিয়ে চল্লেন, শ্রীযুক্ত কেভ্রিয়াভৎসেভও সঙ্গী হলেন। আমার আজকের দোভাষিণী শ্রীমতী লেনা ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করছেন, কিন্তু এখানে সবাই ইংরেজি জানেন বলে তাঁর ব্যাখ্যা করে আমাকে কিছু বোঝাবার প্রয়োজন হচ্ছে না, তিনি মুখ বুজে আছেন।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে যখন পিটার দি গ্রেট্ রাশিয়ার সম্রাট্ তখন তিনিই এই সংগ্রহশালা প্রথম স্থাপন করেছিলেন। এই বছর তার আড়াই শো বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে; আগেই বলেছি, সেজন্য এক বিরাট আন্তর্জাতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ভারতের প্রতিনিধি ও তা'তে এসে যোগদান করবেন। এলউইন ব্যতীতও অনেকের কাছেই আমন্ত্রণ লিপি পাঠানো হয়েছে।

শ্রীমতী বার্থা প্রথমেই জিজ্ঞেস কর্‌লেন, আপনি কি শুধু ভারতীয় বিভাগটি দেখতে চান, না সবটাই দেখ্‌বেন।

আমি বল্লাম, আমি সবটাই দেখব।

তিনি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে নিম্ন সুরে বল্‌তে লাগ্‌লেন, আমাদের ভারতীয় বিভাগটি দেখবার মত কিছু নয়, আপনার কি রকম লাগবে, তা বল্‌তে পারিনে।

এই বলে তিনি আমাদের নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গ্যালারির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, আমরা জনকয়েক তাঁর অনুসরণ করলাম।

প্রথমেই তিনি পিটার দি গ্রেটের নিজস্ব সংগ্রহশালার দিকে আমাদের নিয়ে গেলেন। পিটার দি গ্রেট্ যখন এই সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন থেকেই এ'র সংগ্রহ কার্য আরম্ভ হয়েছিল। শুধু সেই সংগ্রহগুলো দিয়েই তাঁর বিভাগটি পূর্ণ করা হয়েছে তা' নয়, তাঁর নিজের জীবনেরও বহু উপকরণ তার মধ্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পিটার স্বয়ং একজন দন্ত-চিকিৎসকও নাকি ছিলেন। তাঁর কোন পার্ষদ যদি বল্‌তেন, তাঁর দাঁতের কোন অসুখ হয়েছে, পিটার তৎক্ষণাৎ সাঁড়াশি লাগিয়ে টেনে তাঁর দাঁত উপড়ে দিতেন, তাঁর নিজের হাতে টেনে তোলা সেই শত শত দাঁত তাঁর সংগ্রহ বিভাগে এখনও সংরক্ষিত আছে; সাঁড়াশীর মত যে সব যন্ত্র দিয়ে দাঁতগুলো উপড়ে তোলা হতো, তাও একটি কাঁচের বাক্সে সেখানে দেখতে পেলাম। শ্রীমতী বার্থা আমাদের জিনিসগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিতে লাগলেন, তাঁর বোঝানোর ভঙ্গিতে বিষয়টি সরস এবং চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে লাগ্‌ল।

পিটার স্বয়ং প্রায় সাত ফুট্ লম্বা ছিলেন; সেইজন্য সর্বদাই তিনি লম্বা লোক খুব পছন্দ করতেন। তাঁর একজন ফরাসী অনুচর ছিল, সেও ছিল তাঁর মতই দীর্ঘকায়, তাঁর পুরো কঙ্কালটি সেখানে রক্ষা করা হয়েছে। কঙ্কালটিকে দেখে এখনও সে যে

প্রকৃতই কতখানি দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিল, তা অনুমান করা যায়। মনে হয় যেন, এক দৈত্যের কঙ্কাল।

কঙ্কালের মুণ্ডুটি দেখিয়ে শ্রীমতী বার্থা বললেন, এটি কিন্তু এই কঙ্কালের আসল মুণ্ডু নয়। আসল মুণ্ডুটি কোন কারণে হারিয়ে যাওয়ার পর অন্য একটি কঙ্কাল থেকে আর একটি মুণ্ডু নিয়ে এসে এর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য কঙ্কালের এত বড় দেহটির তুলনায় তার মুণ্ডুটি একটু ছোট বলে মনে হচ্ছে না কি ?

হয়ত হচ্ছে। আমি গভীর ভাবে তা বিচার করে দেখতে যাই নি। আমার কেবল মনে হলো, এই রকম জীবিত ব্যক্তির একজনের মুণ্ডু যদি আর একজনের মুণ্ডের উপর এনে নিয়ে স্থাপন করা যেত, তাহলে সংসারে অনেক বিড়ম্বনা থেকে হয়ত রক্ষা পাওয়া যেত। আবার মনে হলো, হয় ত তা'তে বিড়ম্বনা বাড়্তেও পারত, যাক্ সেসব কথা।

সংগ্রশালার প্রতি পিটার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। রুশ দেশের জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সংগ্রহশালা বা Museum যে এক ব্যাপক স্থান অধিকার করেছে, তার মূলে পিটার দি গ্রেটের অনেকখানি দান আছে বলে আমার সহজেই মনে হলো। কারণ, তিনি আধুনিক ধারায় উপকরণ সংগ্রহ এবং তার সংরক্ষণ কার্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সন্ধান জানতেন।

পিটার সর্বত্র ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, যদি তাঁর রাজ্য মধ্যে কোথাও কোন অস্বাভাবিক শিশুর জন্ম (unnatural birth) হয়, তবে সেই শিশুর দেহ এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করবার জন্যে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে তাঁর রাজ্যের সকল অঞ্চল থেকে নানা অদ্ভুত আকৃতির শিশুর দেহ এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বড় বড় কাঁচের আধারে সেগুলোকে আজ পর্যন্ত রক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে 'ত্রিনয়ন' 'চতুর্ভুজ', 'চতুষ্পদ', 'দ্বি-মুখ' 'চতুর্মুখ' এই প্রকার অদ্ভুত শিশুর দেহ রক্ষা করা হয়েছে। পিটার স্বয়ং এই বিচিত্র আকৃতির শিশু

দেহের এই সংগ্রহটি করে গেছেন, তা' থেকেই এই সংগ্রহশালার জন্ম হয়েছে। এই বিভাগটি পিটারের আমলের সংগ্রহ দিয়েই ভরে রাখা হয়েছে।

এইভাবে এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে যেতে লাগলাম। শ্রীমতী বার্থা সবগুলো বিষয় সুন্দর ইংরেজি করে আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। অস্ট্রেলিয়ায় আদিম অধিবাসী, উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান, এস্কিমো ইত্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জীবনের বিচিত্র উপকরণ দিয়ে প্রত্যেকটি জাতিকে যেন কক্ষগুলোতে জীবন্ত করে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি মডেল পূর্ণ আকৃতির (full-size) অর্থাৎ এস্কিমোরা যতখানি উঁচু বরফের ঘরের মধ্যে বাস করে, কৃত্রিম তুষার দিয়ে সেই ঘর ঠিক ততখানি উঁচু করেই তৈরী করে পূর্ণাকৃতি এস্কিমোদেরে তার মধ্যে বসে এবং শুয়ে থাকতে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটি উপকরণ প্রত্যেক জাতির নিজস্ব দেশ থেকে সংগ্রহ করে সেই দেশের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক এক একটি কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করে তার মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। সেইজন্য প্রত্যেকটি দেশ এবং তার জাতির জীবন তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে বলে মনে হলো।

এইভাবে চীন, জাপান, ইন্দোনেসিয়া, ইথোপিয়া ইত্যাদি নানা দেশের নানা জাতির জীবনোপকরণের বিপুল সংগ্রহ দেখতে দেখতে ভারতীয় সংগ্রহ বিভাগের দ্বার-দেশে এসে পৌঁছলাম।

শ্রীমতী বার্থা ইতিপূর্বেই ভারতীয় বিভাগের দৈন্য সম্পর্কে সঙ্কোচ প্রকাশ করেছিলেন, সে কথা আগে উল্লেখ করেছি; কিন্তু সে দৈন্য যে এই পর্যায়ের, তা আমি তখনও বুঝতে পারি নি। ভারতের মত একটি দেশ যার ভিতর দিয়ে হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা আজও অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে, বিচিত্র জাতির বিচিত্রতর জীবনোপরণে যে দেশ সমৃদ্ধ, তা এই সংগ্রহ শালায় সর্বাপেক্ষা বেশি করে দেখানোই উচিত ছিল;

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় নি—এই সংগ্রহশালা ভারতের কোন পরিচয়ই প্রকাশ কর্‌তে পারেনি।

ভারতীয় বিভাগে যে কয়টি উপকরণের প্রদর্শনী করা হয়েছে, তারও অধিকাংশ কেবল কোলকাতার আশপাশ থেকে সংগৃহীত। যেমন, একটি মৃন্ময়ী কালীপ্রতিমা, সেটিও খুব উচ্চাঙ্গের শিল্প-গুণান্বিত নয়; একটি বৃষকাষ্ঠ, তার সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। একটি মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্ত নির্মিত জগদ্ধাত্রী মূর্তি ও একটি ময়ূরপঙ্খী নৌকা, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, একটি নিম্নবঙ্গের বারা ঠাকুর বা মাটির তৈরী দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডু কয়েকটি কাঁসা পিতলের জিনিস। একটি স্ত্রীমূর্তির মডেল; তা দক্ষিণ ভারতের এক কৃষ্ণাঙ্গিনী নারীর আকৃতি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের স্ত্রী-পুরুষের আকৃতি বিভিন্ন। এমন কি পোশাক পরিচ্ছদ পরবার মধ্যেও যে বহু পার্থক্য আছে, তা কেবল দক্ষিণ-ভারতের স্ত্রী-মূর্তিটি থেকে বোঝবার কোন উপায় নেই।

শ্রীমতী বার্থা বারেবারেই নৈরাশ্য প্রকাশ করে দুঃখ করতে লাগলেন।

বললেন, এর বেশি আর কিছু আমাদের সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। আমাদের ইচ্ছা এই বিভাগটিকে আমরা যথাযথভাবে পূর্ণ করে রাখি; কিন্তু এর বেশি আর কিছু পাইনি।

আমার মনে হলো, এ বিষয়ে আমাদের দেশেরও যথাযথ কর্তব্য আছে। ইংরাজ রাজত্বকালে রুশদেশের সঙ্গে ইংরেজের যে সম্পর্ক ছিল, তার কথা চিন্তা করলে তাদের এ বিষয়ে কোন সহযোগিতা যে লাভ করা সম্ভব ছিল না, তা সত্যি। তারপর ভারত স্বাধীন হবার পরও প্রথম অবস্থায় ভারতের সঙ্গে সোভিয়েতের সম্পর্ক খুব নিবিড় হয়ে উঠতে পারেনি। বর্তমানকালে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে তাও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যত গভীর, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এখনও তত গভীর হয়ে উঠ্‌তে পারেনি। সেইজন্যই ভারতীয় বিভাগের এই দৈন্য এখনও দূর হয়নি। তবে এ বিষয়ে আমি

ইতিমধ্যে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, তাঁরা যদি তৎপর হন, তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ত্রুটি দূর হতে পারে।

সম্প্রতি ভারতীয় বিভিন্ন জাতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে রুশভাষায় সোভিয়েত দেশের এই বিভাগ থেকেই একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থখানি তথ্যের দিক দিয়ে যেমন সমৃদ্ধ; বিষয়ের দিক দিয়ে তেমনই বিস্তৃত; বিশেষতঃ তার রচনায় ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রীমতী বার্থা ও শ্রীযুক্ত কেন্দ্রিয়াভৎসভ্ দুজনে নাম স্বাক্ষর করে একখানি বই আমাকে সেদিন উপহার দিয়েছিলেন। এই বইখানির বিষয়গত বিস্তারের সঙ্গে এখানকার ভারতীয় সংগ্রহ যে নিতান্ত নগণ্য, এ কথা তাঁরাও অনুভব করেছেন। সুতরাং দেখা যায়, ভারতের সাংস্কৃতিক ও ব্যাবহারিক জীবন সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের অভাব নেই, কেবল সংগ্রহশালায় রাখবার মত তার উপকরণের অভাব আছে। উভয় দেশের পারস্পরিক সহযোগিতায় সে অভাবও অচিরেই দূর হতে পারে।

শ্রীমতী বার্থা কালীঠাকুরটি দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস কর্লেন, এইটি কি?

আমি বুঝতে পারলাম, যে-কয়টিমাত্র জিনিস তাঁরা এখানে সংগ্রহ করে রেখেছেন, তাদেরও কোনো পরিচয় তাঁরা জানেন না। সুতরাং এই সংগ্রহের কোন অর্থ হয় না।

আমি বিস্তৃত করে বাঙ্গালীর শক্তি-সাধনা ও কালীপূজার তাৎপর্য তাঁকে বুঝিয়ে বল্লাম। কালী প্রতিমার ব্যাখ্যা কল্লাম। একটি উলঙ্গ নারীমূর্তি সম্পর্কে তাঁদের যে ধারণা হতে পারে, তা মনে রেখে তার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিতে লাগলাম। গভীর আগ্রহ নিয়ে তাঁরা আমার কথাগুলো শুন্লেন।

কালীর পায়ের নীচে ভূলুণ্ঠিত শিবঠাকুরের মূর্তিটি দেখিয়ে একজন আমাকে জিজ্ঞেস বল্লেন, এটি কে? ঐ রকম ভাবে আছে কেন?

সে কথাও যথাসাধ্য বুঝিয়ে বল্লাম। যাঁরা নিজেদের জীবন থেকে পৌত্তলিকতা ত দূরের কথা, আনুষ্ঠানিক ধর্মচিন্তাকেই সকল দিক থেকে বিসর্জন দিয়েছে, তাঁরা ঠিক আমার শক্তিবাদের তত্ত্বব্যাখ্যা কতটুকু বুঝতে পারলেন, বলতে পারব না; তবে একথা সত্য, শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে তাঁরা আমার ব্যাখ্যা শুনলেন।

এইভাবে দক্ষিণরায়, জগদ্ধাত্রী, বৃষকাষ্ঠ সবগুলো বিষয়ই তাঁরা আমাকে বুঝিয়ে দিতে বল্লেন। আমিও অনেকক্ষণ ধরে সেগুলো তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম। কিছু কিছু আমার কাছ থেকে শুনে তাঁরা লিখেও নিলেন। মনে হলো, সংগ্রহশালার যে বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাতে হয়তো তা বিশেষ কোন প্রয়োজনে আস্‌তে পারে।

ভারতীয় বিভাগ যত ক্ষুদ্রই হোক, এখানেই আমার সব চাইতে বেশি সময় কাট্‌ল। কারণ, এখানে আমি দর্শক নই এবং তাঁরা আমার ব্যাখ্যাকর্তা বা ব্যাখ্যাকর্ত্রী নন, বরং এখানে আমিই ব্যাখ্যা কর্তা এবং তাঁরাই দর্শক। এখানে আমাদের ভাবের আদান-প্রদানের পক্ষে একটা বড় সুবিধা হয়েছিল এই যে, আমরা দুই পক্ষই এখানে ইংরেজি জানি। সুতরাং আমাদের কোন দোভাষীর এখানে প্রয়োজন হয়নি। আমার আজকের দোভাষিণী শ্রীমতী লেনা আজ নীরব হয়ে আছেন, কেবল ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করে চলেছেন। অনেক সময় তাঁর অস্তিত্বও আমি ভুলে যেতাম। কখনো কখনো দেখতাম, গভীর আগ্রহ নিয়ে আমার কথাগুলো তিনিও শুন্‌ছেন।

জাতিতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের দিক থেকে ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জাতি আন্দামানের আদিম অধিবাসী। তারা পৃথিবীর প্রাচীনতম মানব-গোষ্ঠীর বংশধর, সেই সূত্রে জগতের নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। আন্দামানের কোন:সংগ্রহ সেখানে দেখতে পেলাম না। শ্রীমতী বার্থা স্বয়ং আন্দামানের আদিবাসী ওঙ্গী জাতি নিয়ে গবেষণা করছেন; সুতরাং আশা করা যায়, এবার সেখানকারও

কিছু সংগ্রহ এখানে স্থান পাবে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত কিছুই সম্ভব নয়।

ভারতীয় বিভাগে অনেকক্ষণ কাটিয়ে অবশিষ্ট অন্যান্য দেশ এবং অন্যান্য জাতির গ্যালারিগুলোও দেখা হলো। বিশেষ দেশ ও জাতি ছাড়াও ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী সাধারণভাবে মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন রূপগুলো পর্বে পর্বে ভাগ করে নানা মডেলের মধ্য দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। বই পড়া ছাড়া চোখে দেখার ভিতর দিয়েও যে জ্ঞান কত স্পষ্ট হতে পারে, সেখানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সুবৃহৎ কক্ষটিতে মনীষী ডারউইনের একটি সুবৃহৎ প্রস্তর প্রতিমূর্তি রক্ষিত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে মানুষের কোন জাতি নেই, মানুষের কোন বিশেষ ধর্ম নেই, সকল দেশের মানুষই এক। যেখানে অজ্ঞানতা, সেখানেই মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি।

সবকিছু দেখে শুনে যখন আবার সংগ্রহশালার আপিস ঘরে ফিরে এলাম, তখন মনে হলো যেন সব পৃথিবীটি ঘুরে এলাম। যা ছিল কল্পনায়, তা যেন বাস্তবের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠল। সংগ্রহশালার এর চাইতে বড় সার্থকতা আর কিছুই নেই।

ফিরে আসবার পর শ্রীমতী বার্থা ও শ্রীযুক্ত কেদ্রিয়াভৎসেভ্ তাঁদের রচিত কয়েকখানি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ (reprint) আমাকে উপহার দিলেন। সেগুলো রুশ ভাষাতেই লেখা। তবু একদিন রুশভাষা শিখে এগুলোর পাঠোদ্ধার করতে পারব ভেবে আগ্রহের সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে তা আমি গ্রহণ করলাম।

শ্রীমতী বার্থা বল্লেন, ভারতের মানুষ (People of India) বইখানি আপনাকে উপহার দেবার আমাদের খুব ইচ্ছে। এই বৃহৎ বইখানি মাত্র তিন হাজার সংখ্যা ছাপানোর সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গেছে ; কারণ, সোভিয়েত দেশের প্রত্যেক পাঠাগারেই বইখানি রাখা চাই কি না! আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে দু একখানি বই আমাদের কাছে রেখেছি ; তার মধ্য থেকেই একখানি বই আমরা আপনাকে উপহার দেব।

বইখানি দেখে অবধিই একখানি পাবার জন্যে মনে বড়ই লোভ হচ্ছিল। সুবৃহৎ গ্রন্থ, ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবন বহু চিত্র দ্বারা রূপায়িত, উত্তম কাগজে সুন্দর মুদ্রণ, চমৎকার বাঁধাই। ভাষা জানি আর নাই জানি, সুন্দর বই সাজিয়ে রাখবার সুযোগ পেলেও বড় আনন্দ পাই। এক একবার আশঙ্কা হতে লাগল, হয়ত বইটি অবশিষ্ট নেই বলে আমাকে জানিয়ে দিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেই বিদায় দেওয়া হবে।

কিন্তু আমাকে নিরাশ হতে হোল না। শ্রীমতী বার্থা এই বিষয় নিয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন বলে মনে হলো। তারপর তাঁর নিজের ও শ্রীযুক্ত কেদ্রিয়াভৎসেভের স্বাক্ষর সহ আমার জাতিতত্ত্ব-সংগ্রহশালা পরিদর্শন উপলক্ষে বইখানি প্রসন্নমুখে আমার হাতে উপহার স্বরূপ তুলে দিলেন।

বইখানি হাতের মধ্যে পেয়ে সুবৃহৎ প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করবার ক্লান্তি যেন মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। পাতা উল্টে দেখতে পেলাম, বালগঙ্গাধর তিলক, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এঁদের চিত্র; বাংলা দেশের কালীঘাটের পটুয়ার আঁকা রাম-রাবণের একটি যুদ্ধের ছবিও চোখে পড়ল। বইখানি হাতে নিয়ে শ্রীমতী বার্থার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম।

শ্রীকেদ্রিয়াভৎসেভ্ বল্লেন, আমার শীগ্‌গিরই একবার ভারতবর্ষে যাবার কথা আছে।

বাঙ্গালী নৃতত্ত্ববিদ্ বিরজাশঙ্কর গুহ, ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার তাঁদের নাম ও গবেষণার সঙ্গে এখানকার সবারই পরিচয় আছে। এঁদের প্রত্যেকের নাম তাঁরা উল্লেখ করলেন; কিন্তু এঁরা সবাই এখন পরলোকে। কোলকাতার এখনকার সবাই তাদের অপরিচিত। তাই আমি বল্লাম, কোলকাতায় গেলে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করবেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় দিলেন।

হোটেলে আমাকে পৌঁছে দিয়ে শ্রীমতী লেনা যেন একটু অভিমানের সুরেই বল্লেন, আজ লেনার কিছু দরকার হলো না।

অর্থাৎ আজ তাঁর দোভাষিণীর কাজ করবার যে কোন প্রয়োজন হলো না, সে কথাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। মনে হলো, আজ সর্বক্ষণ ইংরেজি-জানা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার জন্যে, তাঁর যে আমাকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেবার কিছু প্রয়োজন হয়নি, সেজন্য যেন তিনি ব্যথিত হয়েছেন। সারাক্ষণ আমাকে বুঝিয়ে বলবার কাজটি করে যেতে পারলেই যেন তিনি সুখী হন।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় নৃতত্ত্ব সমীক্ষার অধ্যক্ষ আমাকে প্রথমতঃ টেলিফোন করে এবং পরে পত্র দিয়ে জানালেন শ্রীযুক্ত কেৎদ্রিয়াভৎসেভ ও আর একজন রুশদেশীয় নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর চেবোকসরোভ কোলকাতায় আস্‌ছেন এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করছেন। পরের দিনই গ্রাণ্ড হোটেলে এক ভোজসভায় তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ প্রাচ্য বিদ্যাবিভাগ

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করিবার জন্য আমন্ত্রণ লাভ করেছিলাম ; কিন্তু সময়ের অভাবে কিছুতেই সেখানে যাওয়া হয়ে উঠ্‌ছিল না। ইতিমধ্যে 'পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়' এবং সোভিয়েত দেশের বৃহত্তম গ্রন্থাগার লেনিনগ্রাদ সাধারণ পাঠাগারটি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তার বিষয় এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত করে লিখ্‌ব ; কারণ, তা' বিস্তৃত করেই লিখ্‌বার মত। সেই গ্রন্থাগারটি দেখ্‌বার পর আর নতুন কোন গ্রন্থাগার দেখবার উৎসাহ ছিল না। তবু শ্রীযুক্তা নভিকোভা বারবার করেই তা দেখ্‌বার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ কর্‌তে লাগলেন। অবশেষে স্থির হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শেষ বক্তৃতার দিন একটু আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে প্রথমে গ্রন্থাগারটি দেখে নেব। শ্রীযুক্তা নভিকোভা ক'দিন ধরে কেবলই আমাকে বল্‌ছেন, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম স্বাক্ষরিত তাঁর দু'খানি উপন্যাস রক্ষিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরের 'ফটোষ্টেট্' কপি দেখেছি ; কিন্তু মূল স্বাক্ষর আমাদের দেশে কোথাও দেখি নি ; সে জন্য গ্রন্থাগারটি দেখ্‌বার জন্য আমার একটু কৌতূহল হলো।

সে দিন ৩রা এপ্রিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শেষ বক্তৃতার দিন। শ্রীমতী ইরা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাবার জন্য বেলা একটার সময় এসেই হাজির হয়েছিলেন। তাঁর নিজের একটু প্রয়োজন ছিল ; আগেই বলেছি, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি রুশ ভাষায় অনুবাদ করছিলেন এবং যতদিন আমি লেলিনগ্রাদে ছিলাম, ততদিন যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন, তখনই তিনি আমার সাহায্য নিয়েছেন ; আমিও আমার স্বল্প অবসরের মধ্যেও তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। আমার লেনিনগ্রাদ

ত্যাগ করবার সময় আসন্ন হয়ে এসেছে দেখে তিনি শেষ বারের মত তাঁর কতগুলো জিজ্ঞাস্য আমার কাছে জেনে নেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। সে জন্য তিনি একটু আগে থেকে এসেই তাঁর 'যোগাযোগ' বইখানির পাতা আমার সাম্‌নে খুলে ধরলেন। আমি আমার সে'দিনকার বক্তৃতাটি লিখ্‌ছিলাম, অগত্যা তাঁকে সাহায্য কর্‌তে প্রবৃত্ত হলাম। প্রায় দু ঘণ্টা ধ'রে তাঁকে সাহায্য দান চল্‌ল।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী ইরা বলে উঠলেন, না, আর দেরী করা যায় না, আজ আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি দেখবার কথা, সেখানে সবাই অপেক্ষা করে আছেন।

আর দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেই দেখতে পেলাম, শ্রীযুক্তা নভিকোভা ব্যস্তভাবে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। কাল বিলম্ব না করে তিনি আমাকে নিয়ে গ্রন্থাগারের দিকে চল্‌লেন। সেখানেও গবেষক এবং গ্রন্থাগারিকগণ আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজি জানেন, সুতরাং দোভাষীর সাহায্য ছাড়াই তাদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে লাগল।

শ্রীযুক্তা নভিকোভার নির্দেশ মত তাঁরা এ'বার বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত তাঁরই লেখা দু'টি উপন্যাস আমাকে দেখতে দিলেন, একখানি 'দুর্গেশনন্দিনী', ১৮৮১ সনে ছাপা, আর একখানি 'রাধারাণী', সম্ভবতঃ প্রথম সংস্করণ। প্রত্যেকটি বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে ইংরেজিতে নিজের নাম স্বাক্ষর করেছেন, কোনো তারিখ দেন নি; কিংবা কা'কে যে উপহার স্বরূপ বই দুখানি দিয়েছিলেন, তাও উল্লেখ করেন নি।

কিন্তু এ' বিষয়ে জান্‌তে পারা যায়, রুশদেশে ভারত-বিদ্যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ইভান মিনায়েফ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং কোলকাতায় এসে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে তাঁর

স্বরচিত কয়েকখানি বই উপহার দেন ; এই দু'খানি বই তাঁর কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়ে এখানে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালেই একজন বাঙ্গালী ছাত্র লেনিনগ্রাদ (তখন তার নাম সেণ্ট্ পিটার্সবার্গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যে ডক্টরেট উপাধির জন্য গবেষণা করবার উদ্দেশে এসেছিলেন, তাঁর নাম নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। বিংশতি শতাব্দীর গোড়ার দিকেও একজন বাঙ্গালী বিপ্লবী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কর্তেন, তাঁর নাম প্রমথনাথ দত্ত। এঁদের মাধ্যমেও বঙ্কিমচন্দ্রের নাম এদেশে প্রচার লাভ করেছিল। সাম্প্রতিক কালে শ্রীযুক্তা নভিকোভা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা রুশ ভাষায় অনুবাদ করবার দায়িত্ব নেওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর ঔৎসুক্য কিছুমাত্র শিথিল হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের নাম গোড়া থেকেই পরিচিত হয়ে এসেছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রুশ দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আজও কোন কারণেই শিথিল হয়ে পড়ে নি। সেইজন্য পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত গ্রন্থ দু'খানি রক্ষা করেছেন এবং তাদের গ্রন্থাগারের এ দু'টি পরম সম্পদ বলে তাঁরা বিবেচনা করেন।

আমি আগেই বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের মূল স্বাক্ষর আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও রক্ষিত হয় নি, রক্ষিত হবার কোন ব্যবস্থাও নেই। তবে অন্যত্র তাঁর কিছু চিঠি পত্র আছে তা সত্য ; তাও যে আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখি, কিংবা শ্রদ্ধাভরে রক্ষা করি, তা বল্‌বার উপায় নেই।

তারপর সংস্কৃত পুঁথি বিভাগে গেলাম। বহু ভারতীয় পুঁথি এখানেও সংগৃহীত আছে আগেই বলেছি। সেখানে প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল। তাই আপনা থেকেই পুঁথিগুলোর অবস্থা ভাল থাকে, তার উপর পুঁথিগুলোর উপর যে রকম যত্ন নেওয়া হয়, তাতে তাদের কোন রকম ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে না। তুলোট কাগজ, তাল পাতা,

ভূর্জপাতা, প্রাচীন কালে পুঁথি লিখবার প্রচলিত নানা উপকরণের উপরই লিখিত পুঁথি, তারপর ভারতীয় হিন্দু বণিকেরা মধ্য এশিয়ায় এসে নতুন মিশ্র ভঙ্গিতে যে সব পুঁথি লিখেছিলেন তাদেরও কতকগুলো এখানে রক্ষিত আছে। পুঁথির মধ্যে সংস্কৃত মহাভারত ও পঞ্চতন্ত্রের পুঁথির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

পুঁথি বিভাগের সংলগ্নই পুঁথি-সংরক্ষণ (preservation) বিভাগ। সেখানে আধুনিকতম বিজ্ঞান-সম্মত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীর্ণ অব্যবহার্য পুঁথির পুনরুদ্ধার (restoration) করা হয়। একটি সুবৃহৎ 'লেবরেটারি' বা রাসায়নিক গবেষণাগারে বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক দিয়ে এই কাজটি অতি নিপুণ ভাবে এখানে নিষ্পন্ন করা হয়। কয়েকটি জীর্ণ এবং পরিত্যক্ত পুঁথি যে এখানে কি ভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, তা তাঁরা আমাকে দেখালেন। নানা বিচিত্র কাচের আধারে রক্ষিত রাসায়নিক দ্রব্যের গন্ধে কক্ষটি ভরে আছে, বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াবার উপায় নেই; কিন্তু তারই মধ্যে পরম ধৈর্য এবং অধ্যবসায় নিয়ে বিশ্বের বহু বিলুপ্ত তথ্যের সন্ধানে এখানে নিরলস সাধনা চলছে।

গ্রন্থাগারের ভারতীয় বিভাগটি একটি স্বতন্ত্র বিভাগ; তাতে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ব্যতীতও ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থেরও এক বিপুল সংগ্রহ আছে। বাংলা বিভাগে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের সংখ্যাই সর্বাধিক বলে মনে হলো।

এই গ্রন্থাগার থেকে নিয়মিত গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কর্তৃপক্ষ তাদের প্রকাশিত ভারতবর্ষ বিষয়ক কয়েক খানি মূল্যবান্ গ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন। আমি আমার লিখিত দু'খানি বাংলা বই সেখানে উপহার দিয়ে এলাম।

বাংলার লোকশ্রুতি পরিক্রমা

১

ভূমিকা

লোক-শ্রুতি, লোক-যান বা ইংরেজি folklore কথাটি দিয়ে আমরা বিশেষ কোন সংহত সমাজের ঐতিহ্যের সূত্রে প্রাপ্ত যে জীবন-ধারা বা way of life আছে, তাই বুঝে থাকি। এই জীবন-ধারার লিখিত কোন বিধি বা স্মৃতিশাস্ত্র নেই, তথাপি তা নিয়মের সূত্রে-গাঁথা, সমাজের প্রত্যক্ষ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তা বিকাশ লাভ করে; সমাজের সংহতি যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিন তার বিনাশ হয় না; কিন্তু নানা কারণে সমাজ-জীবন বিশ্লিষ্ট এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাকে বিনাশের হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। মানুষের ধর্মই হচ্ছে সমাজ গঠন করা, সমাজকে বিনাশ করা নয়; সেই সূত্রে সে যখন আবার নতুন সমাজ-জীবনের মধ্যে নতুন করে সংহতি সৃষ্টি করে, তখন তার মধ্যে তার নিজস্ব লোক-শ্রুতি আবার নতুন করে গড়ে উঠে।

লোক-শ্রুতির উপকরণের মধ্যে দেশে দেশান্তরে ঐক্য থাক্‌লেও যখন তার প্রত্যেকটি বিষয় আমরা খুঁটিনাটি করে দেখতে যাই, তখন প্রত্যেক জাতির উপকরণের মধ্যেই কিছু কিছু বিশেষত্ব দেখ্‌তে পাই। সেইজন্য বাংলা দেশের সমাজের পক্ষে যা সত্য, বাংলা দেশের বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের পক্ষে তা পুরোপুরি সত্য নয়; তবে মানুষে মানুষে যে এক মৌলিক ঐক্য আছে, তারই ফলে তার মৌলিক কতকগুলো বিষয়ে কোথাও কোন অনৈক্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সেইজন্যে কেবলমাত্র বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ নয়, বিশেষতঃ ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে লোক-সংস্কৃতিগত এক অখণ্ড ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ঐক্যের অনুভূতি যতই প্রত্যক্ষ

এবং গভীর হয়, মানুষে মানুষে আঞ্চলিক পার্থক্যবোধ ততই দূর হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশ যদিও আজ রাজনৈতিক কারণে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, তথাপি তার সংলগ্ন সমগ্র বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলই এক অখণ্ড লোক-সংস্কৃতিগত ঐক্যের সূত্রে গাঁথা। এমন কি, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বলে পূর্ব বাংলার যে অংশ আজ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত, তার সঙ্গেও পশ্চিম বাংলা কিংবা আসাম এবং বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলের লোকশ্রুতির কোনও পার্থক্য নেই। সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ়তর করবার প্রধানতম উপায়ই ভাষা। সুতরাং রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক বিভাগ নিরপেক্ষ পূর্ব ভারতের যে বিস্তৃত অংশে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়, তার বিস্তৃত অংশের মধ্যেই লোক-সংস্কৃতিগত একটি অখণ্ড ঐক্য আছে। তাই আমি যখন বাংলা লোকশ্রুতির বিষয় উল্লেখ করব, তখন কেবল মাত্র ১৯৪৭ সালের পরবর্তী কালে ভারত বিভাগের ফলে গঠিত বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের কথাই মনে কর্ব না, বরং তার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান সহ আসাম এবং বিহারেরও সমস্ত বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলের কথা বল্ব।

লোকশ্রুতি, লোক-যান বা folklore বল্‌তে আমরা জাতীয় সংস্কৃতির কোন্ কোন্ উপকরণের কথা মনে করে থাকি, তা আগে স্পষ্ট করে বলে নেওয়া আবশ্যক। লোক-শ্রুতি বা folklore বল্‌তে আমরা সর্বত্রই বিশিষ্ট একটি জাতি কিংবা গোষ্ঠীর (community) লৌকিক ধর্ম, লোক-সাহিত্য, লোক-সঙ্গীত, লোক-নাট্য, লোক-নৃত্য, লোকাচার, লোক-শিল্প ইত্যাদি বুঝে থাকি।

সমাজে সাংস্কৃতিক জীবনের দু'টি ধারার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়; একটি শাস্ত্রীয়, আর একটি মৌখিক। যা শাস্ত্রীয়, তা লিখিত হয়ে সমাজের সাম্‌নে একটি অবিচল (rigid) আদর্শ স্থাপন করে; কিন্তু যা মৌখিক, তা কোন অবিচল আদর্শ সৃষ্টি করতে পারে না বলে সমাজ-জীবনের ক্রমবিবর্তনের

ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা ক্রমাগত বিকাশ লাভ কর্‌তে থাকে; প্রথমোক্ত বিষয়টি নির্জীব, দ্বিতীয়টি সজীব। যা নির্জীব, তা সমাজ-জীবনের প্রাণধারার সঙ্গে কোন যোগ রক্ষা করতে পারে না; সেইজন্য তা প্রাণহীন, কিন্তু যা সজীব, সমাজ-জীবনের প্রাণশক্তিতে তা পুষ্ট হয়ে জীবনের সঙ্গে সর্বদা যোগ রক্ষা করে অগ্রসর হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠ্‌তে দেখা যায়; সেইজন্যে প্রত্যেক উচ্চতর সমাজের মধ্যেও ধর্মজীবনের দু'টি রূপ আছে—একটি শাস্ত্রীয়, আর একটি লোকায়ত। এই দু'টির মধ্যে সমাজ-জীবনে কোন্‌টির শক্তির বেশি, তা এখানে আলোচ্য নয়, কেবলমাত্র বাংলা দেশের মধ্যে তার যে রূপটি লোকায়ত বা লৌকিক, তাই প্রথমে সংক্ষিপ্ত ভাবে আমাদের আলোচ্য। শাস্ত্রীয় ধর্মমতও প্রথমতঃ লোকায়ত ধর্ম থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে, তারপর কোন কারণে তা বিধিবদ্ধ (codified) হয়ে যাবার ফলে সমাজের সামনে তা এক অবিচল আদর্শ গড়ে তুলে। ক্রমে তা জীবনী-শক্তিহীন হয়ে অর্থহীন সামাজিক আচারে পরিণত হয়। ভারতীয় উচ্চতর ধর্মসংস্কৃতির ভিত্তি বেদ, বৈদিক যুগ থেকেই এ'দেশের সমাজ-জীবনে তা ঘটে এসেছে।

বৈদিক সংস্কৃতিকেই ভারতীয় উচ্চতর সংস্কৃতির মূল বলে ধরে নিলে দেখ্‌তে পাই যে, লোক-সংস্কৃতির ভিত্তির উপরই বৈদিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেদ মূলতঃ ছিল পশুচারণকারী (herder) ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির একটি শাখার লোক-সঙ্গীত; কিন্তু কালক্রমে নানা কারণে তা বিধিবদ্ধ (codified) হ'য়ে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষী জাতির সমাজ ও ধর্মজীবনের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়েছিল। তখন থেকেই তার লোক-সঙ্গীতের প্রধান যে ধর্ম, অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীলতা, তা থেকে তা বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তখন থেকে সহস্র বছর ধরে তার একটি অবিচল রূপ ভারতীয় সমাজের সামনে স্থির হয়ে আছে—লোক-সাহিত্যের স্বাভাবিক ধারায় তা বিকাশ লাভ করতে পারে নি।

চতুর্বেদের মধ্যে অথর্ব বেদ অন্যতম। অনেকে মনে করেন, তার কোন কোন অংশ ঋগ্‌বেদ থেকেও প্রাচীন। এ'-কথা সত্য বলে মনে করবার অনেক কারণ আছে। অথর্ববেদ কেবলমাত্র আর্যভাষী জাতির সমাজের পরিচয়ই বহন করে নি, তার মধ্যে তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত আর্যেতর জাতিরও সামাজিক পরিচয়ের বিচিত্র উপকরণ প্রকাশ করেছে। সমাজে এই সকল উপকরণের একটি বিশেষ শক্তি ছিল বলেই আর্যভাষী রচিত বৈদিক সংহিতায় তা স্থান লাভ করেছিল। তা উপেক্ষণীয় হলে সমাজের দৃষ্টি থেকে সহজেই সে'দিনই তা পরিত্যক্ত হয়ে যেত। ঋগ বেদ এবং অথর্ববেদের মধ্যে যে আদর্শগত ঐক্য নেই, তা বলতে পারা যায় না। ঐন্দ্রজালিক উপায়ে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত দেবদেবীকে প্রসন্ন করা যেমন ঋগ্‌বেদের, তেমনই অথর্ববেদেরও উদ্দেশ্য। তবে ঋগ্‌বেদে অন্তরীক্ষ ও আকাশস্থ দেবতাদের প্রাধান্য এবং অথর্ববেদে ভৌতিক দেবতাদের প্রাধান্য। ঋগ্‌বেদেও যে ভৌতিক দেবতাদের প্রসন্ন করবার কথা নেই, তা নয়—তবে তা তত উল্লেখযোগ্য নয়। ঋগ্‌বেদে সুবৃষ্টির জন্য যেমন মণ্ডুক বা ভেকের উদ্দেশ্যেও সূক্ত রচনা করা হয়েছে, অথর্ববেদেও তেমনই সর্পকে প্রসন্ন করবার জন্য সূক্ত রচনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে লক্ষ্যগত কোন পার্থক্য নেই। ঋগ্‌বেদে সর্পপূজার ইঙ্গিত থাকলেও তার বিস্তৃত পরিচয় নেই; কিন্তু অথর্ববেদে সর্পপূজার বিস্তৃত পরিচয় আছে এবং এই পথেই তা পরবর্তী যুগে গৃহ্যসূত্র পর্যন্ত গিয়ে স্থান অধিকার করেছে। সর্প বিষয়ক সংস্কার ভারতীয় নিজস্ব একটি সংস্কার। আদিকাল থেকেই ভারতের মত অরণ্য ও গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে অগণিত সর্পের বাস। সুতরাং তাকে আশ্রয় করে বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই জাতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণা বিকাশ লাভ করেছিল। আর্যভাষা-ভাষী জাতি তাদের নিজেদের ভারতীয় জীবন-যাত্রার সূত্রপাতেই তা নিজস্ব আচারের অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছিল। ঋগ্‌বেদের মধ্য দিয়ে তার প্রথম পরিচয় প্রকাশ

পেলেও তা ক্রমে অথর্ববেদ, গৃহ্যসূত্র, মহাভারত, পুরাণ ও সংস্কৃত ধর্ম-সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরেই বিকাশ লাভ করেছে দেখা যায়। লোক সংস্কৃতির সাধারণ স্তর থেকে সর্পপূজোর উপকরণ যে সে'যুগেই বৈদিক সাহিত্যে গিয়ে প্রবেশ করেছিল, তা বুঝতে পারা যায়।

সর্প, ভেক প্রভৃতি ছাড়াও কোন কোন বৃক্ষলতা সম্পর্কেও বৈদিক সমাজের একটি বিশেষ শ্রদ্ধাভাব প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের জলবায়ুতেই এই সকল বৃক্ষলতার জন্ম বলে এ'কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আর্যভাষাভাষী জাতি এখানকার জনসাধারণের জীবন থেকে এ'দের সম্পর্কে নানা জ্ঞানলাভ করে, তারপর থেকেই তাদের সংস্কৃতির মধ্যে তা স্বাঙ্গীকৃত হতে আরম্ভ করে। ঋগ্‌বেদে জল, নদী, পর্বত, আকাশ, পৃথিবী এ'দের উপলক্ষ করে সূক্ত রচিত হয়েছে এবং তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যানী ও ওষধি বৃক্ষের নানা গুণ বর্ণনা করেও সূক্ত রচিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট উপকরণ সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ লোক-সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট গুণ। তা'তে দেবতা অলৌকিক হয়ে না উঠে বরং নিতান্ত লৌকিক হয়ে থাকেন এবং তাতে দেবতার দেবত্বও কিছু অনুভূত হয় না। ঋগ্‌বেদে অরণ্যানী কিংবা ওষধি-বৃক্ষ সম্পর্কে যে সূক্ত রচিত হয়েছে, তা তাদের কোন অপ্রত্যক্ষ শক্তির উপর অযথা লক্ষ্য স্থাপন করে নয়, বরং একান্ত প্রত্যক্ষ গুণের উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে। আমরা এখনও বাংলা-দেশে পোষমাস সম্পর্কে এবং ভাদ্রমাসের ভাদুপূজো সম্পর্কে যেমন প্রকৃতির বর্ণনা করে ছড়া ও গান রচনা করে থাকি, এ যেন তাই। অরণ্যানী সম্পর্কে ঋগ্‌বেদে যে সূক্তটি আছে, তার অনুরূপ বহু লোক-সঙ্গীত বাংলার নানা অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। সুতরাং ঋগ্‌বেদের এই সকল সূক্ত লোক-সাহিত্য রচনার প্রেরণা থেকেই এ'সেছে, কোন অলৌকিক ধর্মবোধ থেকে আসে নি।

আমরা রূপকথায় যে রাক্ষস-খোক্কসের গল্প করে থাকি, তার আদি রূপ ঋগ্‌বেদের মধ্যেই পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদেই সর্বপ্রথম রক্ষ ও

রাক্ষস কথা দু'টি পাওয়া যায় ; তারপর অসুর, দাস, দস্যু ইত্যাদির কথাও তাতে আছে। ঋগ্‌বেদে রাক্ষসদের প্রধানতঃ দু'টি ভাগ —প্রথম ভাগে রাক্ষসেরা অন্তরীক্ষের অধিবাসী। তারা সর্বদাই দেবতাদের সঙ্গে শত্রুতা সাধন করে থাকে। তাদের সাধারণ নাম অসুর এবং পণি। পণিরা ইন্দ্রের শত্রু এবং ইন্দ্রের যজ্ঞ সর্বদা বিনাশ করে থাকে। দ্বিতীয় ভাগের রাক্ষসেরা পৃথিবীর অধিবাসী। পার্থিব রাক্ষসদিগের সাধারণ নাম দাস, দস্যু ; তারা কৃষ্ণকায় খর্বাকৃতি এবং গৌরবর্ণ আর্যদিগের শত্রু। বেদের অসুর, পণি, রক্ষ, রাক্ষস, দাস দস্যু ইত্যাদিই ভারতব্যাপী প্রচলিত রূপকথার রাক্ষস-খোক্কসের আদিরূপ। ঋগ্‌বেদ রচনার যুগে তাদের পরিচয় প্রত্যক্ষ ছিল, সেইজন্য তা'তে তাদের বর্ণনাও স্পষ্ট ; কিন্তু কালক্রমে তাদের মৌলিক পরিচয় অপ্রত্যক্ষ হবার ফলে তাদের পরিচয় অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে ; কিন্তু তারা যে বৈদিক সাহিত্যের মৌলিক ধারার ক্রম-বিকাশের সূত্র ধরেই অগ্রসর হয়েছে, তা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই। ভারতের তৎকালীন জন-জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আর্য-ভাষাভাষী জাতি সেদিন যদি বৈদিক সাহিত্য রচনা করত, তবে তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের গভীরতা প্রকাশ পেলেও তা জনচিত্ত অধিকার কর্‌তে পার্‌ত না। এই ভাবে প্রতিবেশীর জীবন ও তার বিচিত্র উপকরণের বিবরণে বৈদিক সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে ; সেই বিবরণ শ্রদ্ধা-প্রসূত রচনা না হতে পারে ; কিন্তু তার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জীবনের যে প্রত্যক্ষ পরিচয়টুকু প্রকাশ পেয়েছিল, তাই পরবর্তী কালে সমগ্র ভারতীয় সমাজকে নানা ভাবে অনুপ্রেরিত করেছে।

বৈদিক সাহিত্য কিংবা ধর্ম যে আসমুদ্র হিমাচলে একদিন প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল এবং এখনও যে এ'দেশে তার শক্তি অব্যাহত আছে ; তার প্রধান কারণ, বৈদিক সংস্কৃতি সেদিনকার ভারতীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে রচিত হয় নি। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি বৈদিক সংস্কৃতি বাইরে থেকে নিয়ে আসে নি, তা এ দেশেরই

জলবায়ু, প্রকৃতি ও মানুষকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছিল ; কোনো সুদূর আধ্যাত্মিক আদর্শও তার লক্ষ্য ছিল না ; এই সকল গুণেই তা অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের হৃদয় অধিকার করেছিল। বৈদিক সংস্কৃতি মধ্যএসিয়ার সংস্কৃতি নয়, তা ভারতীয় সংস্কৃতি— ভারতীয় লোক-জীবনের বিচিত্র উপকরণে তার সমৃদ্ধি।

বাংলা দেশেও একদিন এই পদ্ধতিতেই আর্য এবং আর্যেতর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হয়েছিল। আর্যভাষী সমাজ যেমন একদিন সিন্ধু উপত্যকায় এসে উপস্থিত হয়ে সেখানকার জন-জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়ে নূতন জাতি-গঠনে সহায়তা করেছিল, তেমনি ভারতের সুদূর এই পূর্বাঞ্চলে একদিন আর্য সংস্কৃতি এসে যখন বিস্তার লাভ করল, তখন তার পক্ষে আর্য পূর্ববর্তী সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করা সম্ভব হলো না। তারই ভিত্তির উপর তার নিজস্ব সংস্কৃতিরূপকে নতুন করে গড়ে নিতে হলো। কিন্তু সেদিনকার বাংলা দেশের এই নতুন সংস্কৃতি-রূপ বিশ্লেষণ কর্‌লে দেখতে পাওয়া যাবে যে, তার দেহটি যেমন বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হতে পারে নি', তার অন্তর্লোকেও যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, তাও নিতান্ত সাধারণ। তা নয়ত সহস্রাধিক বৎসর পরও তার মধ্যে আর্যেতর উপকরণের এত প্রাধান্য দেখা যেত না।

২

লৌকিক ধর্ম

বাংলা দেশে শিক্ষা বিস্তার আজও খুব ব্যাপক হয় নি, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনেও মানুষে মানুষে দীর্ঘকাল ধরেই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে এ' দেশে নিম্নতম সমাজ এবং উচ্চতর সমাজ জীবন এই দু'টি সুস্পষ্ট বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নতম সমাজের মধ্যেই লোকায়ত বা লৌকিক ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় হলেও উচ্চতর বা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজও তার প্রভাব থেকে

সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ভারতের এই পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করবার আগে থেকেই এখানকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে ধর্মবিশ্বাস প্রচারিত ছিল, তারই ভিত্তির উপর একটি সংহত সমাজ-জীবন এ'দেশে গড়ে উঠেছিল এবং নানা কারণেই তা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয় ; সেইজন্য যখন বাইরে থেকে প্রথম হিন্দুধর্ম এবং পরে মুসলমান ধর্ম এই অঞ্চলে এসে নিজেদের অধিকার স্থাপন করতে গেল, তখন সেই ধর্ম লোকায়ত ধর্মকে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। তাকে অনেকখানি নিজের মত করে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারই ফলে বহিরাগত কোন ধর্ম একান্ত শাস্ত্রীয় রূপ রক্ষা করে এই অঞ্চলে প্রচার লাভ করতে পারে নি। এমন কি, তাদের মধ্যে যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হ'য়েছে, তা'তে দেশীয় উপকরণের প্রভাবই বেশী বলে মনে হবে। এই ভাবে বহিরাগত শাস্ত্রীয় ধর্মের একটি নবরূপায়ণ এখানে সম্ভব হয়েছিল, তার ফলে তার যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে, তার আকৃতি এবং প্রকৃতি পুরোপুরি যেমন হিন্দু কিংবা মুস্লিমও নয়, তেমনিই পুরোপুরি লৌকিকও নয়। সব কিছুকে মিশিয়ে এক নূতন ধর্মচিন্তা এখানে গড়ে উঠেছে, তাই বাংলার লৌকিক ধর্ম বাংলার লোক-শ্রুতির একটি প্রধান বিষয়।

হিন্দুধর্মের প্রধান দেবতা শিব। পুরাণে তাঁর একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তাঁকে নিয়ে একটি শাস্ত্র গড়ে উঠেছে ; সেই শাস্ত্র অনুযায়ী সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের মধ্যেই তিনি একটি অভিন্ন আদর্শেই পূজিত হয়ে থাকেন। বাংলার নিরক্ষর জন-সমাজও হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ শিবের নামটি গ্রহণ করেছে ; কিন্তু নিজেদের মনের মত ক'রে তার প্রকৃতিটিকে নূতন ক'রে গড়েছে। বাংলা কৃষিভিত্তিক দেশ, কৃষক-সমাজই এ'দেশের প্রধানতম সমাজ, তার ধ্যান-ধারণাই বাংলার সমাজের ধ্যান-ধারণার রূপ দিয়েছে। সুতরাং তারা এই বিষয় সম্পর্কে যা ভেবেছে, তার একটি বিশেষ

মূল্য আছে। এই বিষয়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, পুরাণ কিংবা হিন্দু শাস্ত্রে শিবকে যা বলেই কল্পনা করা হয়ে থাক না কেন, বাংলার কৃষকের কাছে তিনি একজন কৃষক মাত্র। কৃষিকর্মই সমাজ-জীবনের যখন আদর্শ ছিল, তখন কৃষিকর্ম এবং কৃষক-জীবনের মধ্যেই সমাজ তার সমগ্র জীবনের কল্যাণের স্বপ্ন দেখেছে। সেইজন্য সে তার শ্রেষ্ঠ দেবতাকেও একজন কৃষকের অতিরিক্ত করে দেখতে পারে নি। শিব কৃষক, তিনি নিজের হাতে হাল চাষ করেন, জমি থেকে আগাছা বেছে তুলেন, শক্ত করে জমির আল বেঁধে দেন, সুবৃষ্টির ফলে যখন তাঁর নিজের হাতে চাষ করা জমিতে প্রচুর ফসল ফলে, তখন তাঁর মনে আর আনন্দ ধরে না। সাধারণ মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে তার দেবতাকে কল্পনা করতে পারে না; সেইজন্য বাংলার কৃষক বাঙ্গালীর দেবতার মধ্যে শিবের কৃষকের রূপটাই প্রত্যক্ষ করেছে। পুরাণের মধ্যে একদিন তাঁর সম্পর্কে যে কল্পনার উদয় হয়েছিল, তা বাংলার কৃষক-জীবনের প্রত্যক্ষ কর্মের ক্ষেত্রে প্রেরণা দিতে পারে নি; তাঁর কৃষকরূপ পরিকল্পনার মধ্যেই তাঁর আত্মার প্রসাদ সে অনুভব করেছে।

পুরাণের মধ্যে শিব বিনাশের দেবতা; কিন্তু বাংলার সাধারণ সমাজে তিনি বাঁচবার উপায়; পুরাণে তিনি যোগী এবং শ্মশান-বিহারী; কিন্তু বাংলার সাধারণ সমাজে তিনি গৃহী এবং পরিবারের কর্তা—স্ত্রী-পুত্রকন্যা নিয়ে তাঁর সংসার। কৃষিকর্ম করে তাঁর সংসারের অনটন দূর হয়, বস্ত্রের অনটন দূর করবার জন্যও তিনি কার্পাস তূলোর চাষ করেন, তাঁর স্ত্রী গঙ্গা সেই তূলো থেকে সুতো কেটে তাঁর জন্য কাপড় বুনে দেন। পুরাণে বলেছে, তিনি দিগম্বর; কিন্তু বাংলার চাষী তাঁকে কাপড় পরিয়ে দিয়ে তাঁর দিগম্বরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে।

বাংলার কৃষক সমাজের মধ্যে শিব সম্পর্কে এই যে বিশ্বাসের উদয় হয়েছিল, তা কালক্রমে উচ্চতর সমাজের মধ্যেও প্রসার লাভ করল এবং সংস্কৃত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ প্রমুখ উচ্চ জাতির লোকও শিব

সম্পর্কিত পৌরাণিক সংস্কার বিসর্জন দিয়ে তাঁর এই লৌকিক পরিচয়ের ভিত্তির উপর নূতন সাহিত্য রচনা করতে লাগ্‌ল; বাংলা সাহিত্যে তা শিবমঙ্গলকাব্য বলে পরিচিত হলো। বাংলার পল্লী অঞ্চলে যেখানে বাঙ্গালী জীবনের ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত হয়ে চলেছে, সেখানে শিব-সম্পর্কিত এই ধারণার আজ পর্যন্তও কোন পরিবর্তন হয় নি। সেই বিশ্বাস অনুযায়ী শিব কৃষক, কৃষিকর্মের সরঞ্জাম মাত্রই দেবতা শিবের ব্যবহারের ফলে পবিত্র, কৃষিকর্মকে দেবকর্ম বলে বিশ্বাস করে দৈহিক শ্রমকে বাংলার পল্লীজীবনে এক বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

লৌকিক শৈবধর্মের পরই বাংলার লৌকিক শাক্তধর্মের কথা উল্লেখ কর্‌তে হয়। পুরাণের মধ্যে যে শক্তি-উপাসনার কথা আছে, তারও ভিত্তি লৌকিক। কেউ কেউ মনে করেন, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা থেকেই শক্তিপূজোর প্রতিষ্ঠা হয়েছে ; কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে শক্তিপূজোর যে পরিচয়ই প্রকাশ পাক না কেন, বাংলা দেশে তার একটি বিশেষ রূপ আছে। নারীকে তা'তে কেবলমাত্র শক্তির প্রতীক্ নয়, করুণারও আধার বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে। অন্যায় এবং অবিশ্বাসকে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে শরণাগতকে রক্ষা করবারও একটি করুণা-গুণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। কৃষক শিব যেমন পুরুষ, শক্তির প্রতীক্ যে দেবতা, তিনি তার পরিবর্তে নারী, জননীরূপিণী। বিভিন্ন নামে তাঁর বিভিন্ন পরিচয় প্রকাশ পায়, যেমন সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে তিনি মনসা বলে পরিচিতা, পারিবারিক কল্যাণের শক্তিরূপে তিনি চণ্ডী বলে পূজিতা, বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী রূপে তিনি শীতলা দেবী নামে পরিকল্পিতা। তাঁর একটি পুরুষ পরিচয়ও আছে, তা'তে তাঁর নাম ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুর পুত্রসন্তান দাতা এবং কুষ্ঠরোগ ত্রাতা। সুতরাং দেখা যায়, প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনের ঐহিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই সকল দেবদেবীর কল্পনা করা হয়ে থাকে, স্বর্গ কিংবা বৈকুণ্ঠ লাভের জন্য তাঁরা কদাচ কল্পিত হন না। সমাজ-

জীবনের নিম্নতম স্তরে ধর্মের সঙ্গে ঐহিক জীবনেরই সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। ঐহিক জীবনের সুখদুঃখের উপর লক্ষ্য রেখেই দেব-দেবীর কল্পনা করা হয়ে থাকে; কিন্তু সমাজের উচ্চতম স্তরে পারত্রিক বা আধ্যাত্মিক (spiritual) কল্যাণের লক্ষ্যই বড় হয়ে দাঁড়ায়। দেবদেবীর রূপের মধ্য দিয়েই সমাজ-মানসের অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং সর্পভীত, রোগভীত, শত্রুভীত সমাজ সে'দিন আত্মরক্ষার জন্য যে দেবদেবীর পরিকল্পনা করেছিল, তাদেরই মধ্য দিয়ে এ'দের সামনে তার অসহায় অবস্থার পরিচয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এই সকল দেবদেবী সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত হলেও তাদের মূল পরিকল্পনার মধ্যে একটি সুনিবিড় ঐক্যও প্রকাশ পায়। সাধারণ নিরক্ষর লোকের সমাজ থেকে এই সকল দেবদেবীর পরিকল্পনার উদ্ভব হলেও কালক্রমে দেখা গেল, তাদের প্রভাব সমাজের সকল স্তরেই সমান বিস্তার লাভ করে চলেছে, তখন তাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করে সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চতম ব্রাহ্মণ সমাজও কাব্য রচনার সূত্রপাত করেছিল; তার ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন ব্যাপী এক বিস্তৃত আখ্যায়িকা-মূলক কাব্যসাহিত্য রচিত হয়েছিল, তা মঙ্গলকাব্য বলে পরিচিত। এইভাবে বিভিন্ন লৌকিক শক্তি দেবী যেমন চণ্ডী, মনসা, অন্নদা, শীতলা ও কালিকার নামে যথাক্রমে চণ্ডীমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কালিকামঙ্গল এবং পুরুষ দেবতা ধর্মঠাকুর, দক্ষিণ রায় ইত্যাদির নামে ধর্মমঙ্গল এবং রায়মঙ্গল কাব্য রচিত হ'য়েছে। শৈবধর্মের প্রাধান্যের জন্য উল্লিখিত প্রত্যেক শাক্তদেবীই শিবের সঙ্গে কোন না কোন একটা সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছিলেন: সেইজন্য মনসা হয়েছেন শিবের কন্যা; চণ্ডী, অন্নদা, কালিকা শিবের পত্নী ইত্যাদি; প্রায় সকলেই শিবের সঙ্গে একটা না একটা সম্পর্কে আবদ্ধ।

চণ্ডী ভয়ঙ্করী এবং অনিষ্টকারিণী (malignant) প্রকৃতির দেবী, কিন্তু শিব শান্ত প্রকৃতির দেবতা। অবিশ্বাসকারীকে চণ্ডী বিনাশ

করেন এবং ভক্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। কিন্তু শিব ভক্তের সুখদুঃখে সম্পূর্ণ নির্বিকার, তার কাতর প্রার্থনায় তিনি কোন সাড়া দেন না। চণ্ডী গার্হস্থ্য সুখদুঃখের দেবী, স্ত্রী-সমাজই তাঁর পূজো করে থাকে, তিনি 'যোষিতামিষ্টদেবতা।' পুরুষের সমাজ তার পূজো করে না, এমন কি, তার বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। হিন্দু পুরাণে যে চণ্ডীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়, লৌকিক সমাজের চণ্ডী তা থেকে স্বতন্ত্র; ইনি অনার্য সমাজ থেকে উদ্ভূত দেবতা, হিন্দু-সমাজের সঙ্গে একটা সম্পর্ক নির্দেশ করবার জন্য হিন্দুপুরাণের নামটি গ্রহণ করেছেন; কিন্তু তার আচরণের মধ্য দিয়ে 'হিন্দুত্ব' বলতে যা বুঝায়, তার বিশেষ কিছুই ফুটে উঠ্‌তে পারে নি।

লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে বাংলার সমাজে মনসার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তিনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বাংলা দেশের জলবায়ুতে সর্প জাতির বংশবিস্তার অতি সহজ; সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যাও এদেশে অত্যন্ত ব্যাপক। তাই এই ভয়ঙ্কর শত্রুকে দৈব উপায়ে সন্তুষ্ট করে তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ তাঁর পূজো এত বিস্তার লাভ করেছে। ঋগ্‌বেদে সর্প পূজোর ব্যাপক উল্লেখ নেই; কিন্তু অথর্ববেদের সময় থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী সকল বৈদিক এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সর্পপূজোর ব্যাপক উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার সর্পদেবী মনসার পূজো অথর্ববেদ কিংবা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে প্রচার লাভ করেছে, এমন মনে করা যেতে পারে না। কারণ, তার কতকগুলো বিশেষত্ব আছে, তার সঙ্গে কেবল মাত্র বৈদিক সাহিত্য নয়, ভারতের কোন অঞ্চলের ব্যবহারিক আচারেরও সম্পর্ক নেই। সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই বাংলার সর্পপূজা অত্যন্ত ব্যাপক, কোন কোন অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর উপর তার প্রভাব বিস্তার লাভ করলেও তার মূল নিম্ন শ্রেণীর সমাজের মধ্যেই প্রোথিত রয়েছে। বাংলার সর্পপূজা অবলম্বন করে এক বিস্তৃত সাহিত্য এ'দেশে গড়ে উঠেছে। প্রথমতঃ তা

মুখে মুখে প্রচার লাভ করে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, ক্রমে তার পরিধি অতিক্রম করে তা লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার বিস্তার এবং বৈচিত্র্য বিস্ময়ের বিষয়।

গ্রাম-দেবতার পূজো বাংলার লৌকিক ধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ। মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে এক একটি অঞ্চলে বাস করত, তখন সেই গোষ্ঠীজীবনের সুখদুঃখের একান্ত নিয়ামক বলে এক দেবী বা শক্তির কল্পনা করত। তার কোন পৌত্তলিক রূপ ছিল না; কারণ, হিন্দুসমাজেই পৌত্তলিকতার বিস্তার হ'য়েছিল, হিন্দু সমাজের বহির্ভূত অঞ্চলে তার কিছু কিছু প্রভাব দেখতে পাওয়া গেলেও, তার পূর্ণ অধিকার কোন দিনই স্থাপিত হতে পারে নি। সেইজন্য গ্রাম-দেবতার কোন মূর্তি নেই। পথিপ্রান্তে বৃক্ষমূলে কোন প্রস্তরখণ্ডকে প্রতীক্ মাত্র বিবেচনা করে, তার পূজো হয়ে থাকে। এই পূজোয় কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারিত হয় না, লৌকিক আচারে পশু বলি দিয়ে সমগ্র গোষ্ঠীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার পূজো হয়। ভারতের সর্বত্রই যেখানে প্রাচীন গ্রাম্য সমাজের সংগঠন আজও বর্তমান আছে, সেখানে এই শ্রেণীর গ্রাম-দেবতার উপাসনা আজও প্রচলিত আছে। কিন্তু যেখানে হিন্দুপ্রভাব কিছু বেশী পরিমাণে হয়েছে, সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম-দেবতার নাম ও তার পূজোর আচার হিন্দু আদর্শ দিয়ে অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছে।

পুরাণ এবং শাস্ত্র বহির্ভূত এই সকল দেবদেবী ছাড়া সাধারণ জনসমাজের মধ্যে আরও লৌকিক দেবদেবীর অস্তিত্ব আছে, তাঁদের প্রত্যেকেই সমাজের ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্কের সূত্রে বিজড়িত। প্রথমতঃ যেমন রোগ-নিবারক দেবদেবী; কোন রোগে আক্রান্ত হলে এদের পূজো করে রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, এই বিশ্বাস নিয়ে তাদের পূজো করা হয়। তাদের মধ্যে কলেরা রোগের দেবীর নাম ওলাদেবী বা ওলাঝোলা, বসন্ত রোগের দেবীর নাম শীতলা, খোস পাঁচড়ার দেবতার নাম ঘেঁটু ইত্যাদি। রোগ-নিয়ামক

দেবদেবীর মত রৌদ্রবৃষ্টি নিয়ামক দেবদেবীও আছেন, তাঁরা অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি দূর করে থাকেন। বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ বলে কৃষি-কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেবদেবীরও পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে; তাদের মধ্যে ক্ষেত্রপাল, ক্ষেত্ররক্ষক দেবতা, কোজাগরী লক্ষ্মী ধান্য ও শস্যের দেবী। এ'দেশে কোন অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেবতায় পরিণত হয়ে যান, তাঁরাও ক্রমে লৌকিক দেবদেবীর সমান মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায় এবং বড় গাজি খাঁর নাম উল্লেখ করা যায়। গার্হস্থ্য জীবনের নানা সূত্রে জড়িত এই প্রকার ছোট-বড় দেবতা যে কত আছে, তার সংখ্যা হিসেব করে বলা যাবে না।

৩

লোক-সাহিত্য

লৌকিক ধর্মের পরই লোক-সাহিত্যের কথা বল্‌তে হয়। প্রত্যেক দেশেই লোক-সাহিত্যের ভিত্তির উপরই উচ্চতর সাহিত্য গড়ে উঠেছে, বাংলাদেশেও মধ্যযুগ অর্থাৎ ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু তারপর যখন পাশ্চাত্ত্য জগৎ থেকে নূতন শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব বাংলার সমাজের উপর এসে বিস্তার লাভ কর্‌ল, তখন নতুন যুগের বাংলার যে নতুন সাহিত্য গড়ে উঠ্‌ল, তার মধ্যে একদিক থেকে যেমন বাংলার প্রাচীনতর ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ করা হয়েছে, তেমনই অন্য দিকে পাশ্চাত্ত্য ভাব-ধারাকেও স্বাঙ্গীকৃত করে নেবার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। তথাপি বাংলার লোক-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাকেও যে সারা জীবন ধরে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র ২৩ বৎসর, তখন থেকেই তিনি বাংলার লোক-সাহিত্যের বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করবার প্রেরণা বোধ করেছিলেন এবং নিজের রচনার মধ্যে তার প্রভাব

স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বাংলার লোক-সাহিত্যের সামাজিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক এবং শিল্পগত মূল্য বিশ্লেষণ করে তিনি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, তা আজ পর্যন্তও লোক-সাহিত্য আলোচনার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অভ্রান্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উদ্ভব, বিকাশ এবং শেষ-পরিণতি—সব কিছুর সঙ্গেই তাঁর লোক-সাহিত্যের প্রেরণার সম্পর্ক জড়িত হয়ে আছে। তিনি তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'র মধ্যে লিখেছেন যে, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' এই ছড়াটি থেকে তাঁর কবিত্বের বিকাশ; তারপর আমরা দেখ্‌তে পাই যে, তাঁর জীবনের সর্বশেষ গ্রন্থও বাংলার লোক-সাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট বিষয় 'ছড়া।' 'ছড়া' নামক কাব্যগ্রন্থটিই রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালের সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদি এবং অন্ত উভয় অংশেই লোক-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব মূর্ত হয়ে আছে; জীবনের মধ্যাহ্নেও তিনি তার ব্যাপক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। পোশাকে, পরিচ্ছদে, ধ্যানে এবং চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার বাউল। সঙ্গীত বাউলের যেমন সাধনার অঙ্গ, রবীন্দ্রনাথও তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে সঙ্গীতকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলার লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ আছে; যেমন ছড়া, গীতি, গীতিকা, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ, পুরাকাহিনী, ইতিকথা ইত্যাদি। ছড়া আবার কতকগুলো ভাগে বিভক্ত; যেমন দোলনার ছড়া, ঘুমপাড়ানি ছড়া, খেলার ছড়া, পারিবারিক ছড়া, কৃষির ছড়া ও ব্রতের ছড়া। লোক-সঙ্গীতও কতকগুলো ভাগে বিভক্ত; যেমন, আঞ্চলিক গীতি, আনুষ্ঠানিক গীতি, ব্যাবহারিক গীতি, প্রেম-গীতি, কর্মগীতি ইত্যাদি। আঞ্চলিক গীতির কতকগুলো স্থানীয় বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে, বাংলার সর্বত্র তা সমানভাবে শুন্‌তে পাওয়া যায় না। বারমাসী গান বাংলার এক বিশেষ প্রকৃতির প্রেম-গীতি। তার মধ্যে বছরের বারো মাসে প্রকৃতির রূপ যে পরিবর্তন হয়ে

থাকে, তার পটভূমিকায় প্রেমিকা নায়িকার মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা বর্ণিত হয়ে থাকে ; প্রকৃতির রূপ এবং নারীর অন্তর্গূঢ় অনুভূতির সমন্বয়ে তা এক সার্থক প্রেমকাব্যের রূপ ধারণ করে। প্রকৃতি—বিশেষ করে বর্ষা প্রকৃতিকে বন্দনা করেও বহু সঙ্গীত এদেশে প্রচলিত আছে। স্ত্রী-সমাজের মধ্যেই এই গীতির প্রচলন দেখা যায়। অবসর সময়ে নৃত্য এবং গীতের সহযোগে সুদূর পল্লী অঞ্চলে এখনও তারা গান গেয়ে থাকে।

আনুষ্ঠানিক গীতিকে ইংরেজিতে calendric song বলা হয়। বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়, সেই উপলক্ষেই এই গান গাওয়া হয়। সাধারণ সমাজের মধ্যে বাংলা দেশের সব চাইতে বড় জাতীয় উৎসব চড়ক উৎসব। চড়ক উৎসব সূর্যোৎসব। চড়কের অনুষ্ঠানে যে নৃত্যগীত হয়ে থাকে, তাকে বলে গাজন। গাজনের যে ছড়া ও গান আছে, তা কেবলমাত্র এই উপলক্ষেই গাওয়া হয়। কৃষিজীবী সমাজের মধ্যে এই উৎসবের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে ; কারণ, এই উৎসবের মধ্য দিয়েই সূর্যদেবতাকে তাঁর তেজ প্রশমিত করে বৃষ্টিপাত করবার জন্য প্রার্থনা জানান হয়। কৃষক-সমাজ গাজন উৎসবের আনন্দে মত্ত হয়ে নৃত্য ও সঙ্গীতের সহায়তায় নানা আচার পালন করে, কৃষিকার্যের জন্য সূর্যদেবতার আশীর্বাদ কামনা করে। কিন্তু এ'কথা সত্য, এই উপলক্ষে যে সব গান গাইতে শুনা যায়, তাদের সাহিত্যিক মূল্য খুব উচ্চাঙ্গের বলে অনুভব করা যায় না। কারণ, লোক-সাহিত্য মাত্রই যেমন ক্রমবিকাশের সূত্রে বিধৃত, গাজনের ছড়া কিংবা গান, তা নয়। তাদের সঙ্গে আচারের (ritual) যোগ আছে বলেই তাদের স্বাধীন স্ফূর্তি সম্ভব নয়।

বাঙ্গালীর পরিবারিক জীবনে সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন জাতকর্ম, উপনয়ণ, বিবাহ ইত্যাদি পালন করার সময় যে সকল মেয়েলী সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যায়, তাই ব্যাবহারিক সঙ্গীত (functional song)। কোন পরিবারে যখন এই সব অনুষ্ঠান

হয়, তখনই পল্লীর মেয়েরা একত্র হয়ে বসে সুর করে সময়োপযোগী গান গাইতে থাকে। তাদের মধ্যে কন্যা যখন পিত্রালয় থেকে শ্বশুর বাড়ীতে বিদায় হয়ে যায়, তখন যে করুণ সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যায়, তা মানবিক অনুভূতির রসে সমৃদ্ধ, বাংলার লোক-সঙ্গীতের এই অংশটি বিশেষ মূল্যবান্।

প্রেম-সঙ্গীতের একটি সর্বজনীন আবেদন আছে; সেইজন্য যখনই তা যে-ভাবেই গাওয়া হোক না কেন, তা সাধারণের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। সাধারণতঃ বাংলার প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক কৃষ্ণ এবং নায়িকা রাধা। আমাদের দেশে একটি কথা আছে, 'কানু ছাড়া গীত নাই'। তবে এ'কথা সত্য যে, এই কানু বা কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের কিংবা মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ন'ন, তিনি বাঙ্গালীর চিরন্তন প্রেম-কাহিনীর নায়ক মাত্র; রাধিকাও তাই; তাঁর সঙ্গেও পুরাণ-মহাভারতের কোন সম্পর্ক নেই, তিনিও বাঙ্গালীর চিরন্তন প্রেম-স্বপ্নের ধ্যানমূর্তি। বাংলার পল্লীকবি রাধা এবং কৃষ্ণের মাধ্যমে বাঙ্গালীর চিরন্তন প্রেমানুভূতির কথাই প্রকাশ করেছেন।

মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী বাংলার লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের ধারায় অভিষিক্ত হয়েই পুষ্টিলাভ করেছে। বৈষ্ণব পদাবলী রচনার ধারা আজ লুপ্ত হয়েছে; কিন্তু বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রেম-সঙ্গীতের ধারা আজও অব্যাহত আছে এবং চিরদিন এমনই থাকবে।

কর্মসঙ্গীতও বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ। কর্মসঙ্গীত বিশেষ কোন শারীর কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত (integrated), কর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে তার কোন ব্যবহার নেই। কৃষিকর্ম বাঙ্গালীর প্রধান কর্ম; সেইজন্য কৃষিকর্মের বিভিন্ন অবস্থায় এই শ্রেণীর সঙ্গীত শোনা যায়। নদীমাতৃক বাংলা দেশের নৌকা বাইচের গানও অত্যন্ত জনপ্রিয় কর্মসঙ্গীত। ধান ভানাও বাঙ্গালী মেয়েদের একটি অবশ্য পালনীয় কর্মই একদিন ছিল, ধান ভানার শ্রমকে লাঘব করবার জন্য তারা একদিন যে সঙ্গীতের আশ্রয় নিত,

তার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। ধানভানার গীত বাংলার কর্মসঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি প্রধান বিষয় গীতিকা বা ballad. বাংলার কোন কোন অঞ্চলের গীতিকা ইতিপূর্বেই সংগৃহীত এবং পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার লাভ করেছে, তাদের সৌন্দর্য পাশ্চাত্ত্য জগতের বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। গীতিকা কাহিনী-মূলক রচনা; কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা তার একটি বিশেষ গুণ, তার বিষয়বস্তু প্রেম এবং তার পরিণতি বিয়োগাত্মক। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র যে সংগ্রহ বহুকাল পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, তার সম্বন্ধে বহু পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্ পণ্ডিত আলোচনা করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে যে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত গীতিকা সাহিত্যের অন্তর্গূঢ় ঐক্য আছে, তা' বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। সম্প্রতি চেক্ দেশীয় পণ্ডিত ডক্টর ডুসান জ্‌বাভিতাল *Bengali Folk-Ballads from Mymensing* নামে একখানি বই লিখেছেন; তাতেও তিনি নানা যুক্তি দিয়ে গীতিকাগুলোর অকৃত্রিমতা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বিশ্বের লোক-সাহিত্যে তার স্থান নির্ণয় করেছেন।

বাংলার গীতিকার আর একটি রূপ নাথ-গীতিকা। নাথ একটি ধর্ম-সম্প্রদায়, কিন্তু ধর্মের কথা তার এই গীতিকায় কিছু নেই। নারীপ্রেমের শক্তিই তার মধ্যে কীর্তিত হয়েছে। নাথ-গীতিকার প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র হলেও, গীতিকার যথার্থ রস থেকে তা বঞ্চিত নয়।

বাংলার লোক-কথা বাংলার লোক-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ। এ'দেশের লোক-কথাকে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথা। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে বাংলার লোক-কথা সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর *Folktales of Bengal-*

নামক লোক-কথা সংগ্রহের ভিতর দিয়ে জগতের লোকসাহিত্য-রসিকের কাছে বাংলার লোক-সাহিত্যকে পরিচিত করালেন। তারপর আরও বহু সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। এ কথা সত্য, লোক-কথাগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে অতি সহজেই প্রচারিত হয়ে থাকে; কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশে গিয়েই তার এক-একটা বিশেষ রূপ লাভ করতে হয়, কিন্তু তাতে তার মৌলিক পরিচয়টি বিনষ্ট হয় না। বাংলা দেশেও যে সকল কথা প্রচলিত আছে, অন্যত্রও হয়ত তা শুন্‌তে পাওয়া যায়, তবু বাঙ্গালীর নিজস্ব রসবোধ এবং জীবন-দর্শন দিয়েও বাঙ্গালীর লোক-কথা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

একদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মনে হবে, লোক-কথা বাংলার লোক-সাহিত্যের সমৃদ্ধতম সম্পদ। কিন্তু এ যাবৎ বাংলার লোক-সাহিত্যের যে অনুসন্ধান হয়েছে, বাংলার লৌকিক কথা-সাহিত্য তা'তে বিশেষ স্থান পেয়েছে, এমন কথা বল্‌তে পারা যায় না। কথাসাহিত্যের সর্বপ্রথম সংগ্রহ ইংরেজি ভাষায় সংকলিত হয়েছিল; ইংরেজি ভাষায় এই সংগ্রহ সংকলিত হবার ফলে তা স্বভাবতই সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট কোনও আবেদন সৃষ্টি কর্‌তে পারে নি। তারপর আজ থেকে ৭০ বছরেরও আগে রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে যে আলোচনা এবং তার পরিশিষ্টরূপে যে ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তার মধ্যে ছড়া সম্পর্কে অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলোচনা থাক্‌লেও ছেলেভুলানো সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ লোক-কথা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বাংলার ছড়া, গ্রাম্যগীতি ইত্যাদির যতই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করুন না কেন, তিনি বাংলার লোক-কথা সম্পর্কে কোনও আলোচনাই প্রকাশ করেন নি। অথচ রবীন্দ্রনাথের আলোচনার যে একটি বিশেষ মূল্য ছিল, তা' সহজেই বুঝতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের উক্ত 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে প্রবন্ধ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত

হবার পরই বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগৃহীত হয়ে বহু ছড়া ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' প্রকাশিত হতে থাকে। সেই সময়ই চট্টগ্রাম হতে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, বাঁকুড়া থেকে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রমুখ উৎসাহী পণ্ডিতগণ তাঁদের মূল্যবান্ ছড়াসংগ্রহ প্রকাশ করেন। তা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না হলে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতেও এই মূল্যবান্ ছড়াগুলো সংগৃহীত হতো না—কালক্রমে বিস্মৃত হয়ে যেত। বাংলার লোক-কথাগুলোর উপরও যদি রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি সে'দিন পড়ত, তবে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সে'দিন লোক-কথা সংগ্রহ ও সংকলনের অনুরূপ উৎসাহের সৃষ্টি হত এবং তার ফলে বাংলার বহু লোক-কথা বিস্মৃতির কবল হতে রক্ষা পেতে পারত। কিন্তু বাংলার লোক-সাহিত্যের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বল্‌তে হবে যে, তার উপর রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি সক্রিয়ভাবে কোনদিনই আকৃষ্ট হয় নি; এই জন্যই ছড়া কিংবা গীতির মত তার সংকলন যেমন ব্যাপকও হয়নি, তেমনই গভীরও হতে পারে নি'।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র পর দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় বাংলার রূপকথার যে সংকলন প্রকাশ করেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় বাংলার রূপকথার তা সর্বপ্রথম সংকলন। বাংলার রূপকথাগুলো যথাযথভাবে সংগৃহীত হয়ে সংকলিত হলে তাদের আবেদন আজ যে কত ব্যাপক হতে পারে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের সংকলনগুলোর ব্যাপক প্রচার থেকে তা বুঝতে পারা যাবে। স্বর্গত মিত্র মজুমদার মহাশয় বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চল থেকেই রূপকথাগুলো সংগ্রহ করেছিলেন—তার অর্থ এই নয় যে, বাংলার অন্য কোনও অঞ্চলে

অনুরূপ রূপকথার অস্তিত্ব নেই, কিংবা ছিল না ; বরং তার অর্থ এই যে, বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কোনও অনুরাগী সংগ্রাহকের অস্তিত্ব ছিল না। একমাত্র এই কারণেই বাংলার বিচিত্র রূপকথার মূল্যবান্ সম্পদ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সম্মুখীন হয়ে আজ লুপ্ত হতে চলেছে। বাঙ্গালীর শিশু-সন্তান তার ইংরেজি শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি রূপকথার কিছু কিছু পরিচয় লাভ করে; কিন্তু বাংলার রূপকথা তার শিশুপাঠ্য পুস্তকের তালিকায় কোনদিন স্থান পায় না। পরকে ঘর করে নিয়ে ঘরকে সে পর করে ফেলে। ভবিষ্যৎ জীবনে তার যে ফল দেখা যায়, তা কিছুতেই জাতীয় চরিত্রগঠনের অনুকূল নয়।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের প্রায় সমসাময়িক কালেই বাংলার আর একজন অনুরাগী সংগ্রাহক বাংলার লোক-কথার মূল্যবান্ একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, তাঁর সংগ্রহের নাম 'টুনটুনির বই'। তা রূপকথার সংগ্রহ নয়, উপকথা (Animal Tales) সংগ্রহ বলে উল্লেখ করাই সঙ্গত। কিন্তু তাও বাংলা দেশের একটি মাত্র অঞ্চলেরই সংগ্রহ—তার ভেতর বাংলার উপকথার সামগ্রিক কোনও পরিচয় পাবার উপায় নেই। বাংলার রূপকথা এবং উপকথার বিপুল সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করলে উল্লিখিত তিনটি মাত্র সংগ্রহ যে তার বিশেষ কোনও পরিচয়ই প্রকাশ কর্তে পারে নি, একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

এবার ব্রতকথাগুলোর কথা উল্লেখ করতে হয়। একথা সত্য যে, ব্রতকথার কিছু কিছু সংগ্রহ ইতিপূর্বে এদেশে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আবার একথাও স্বীকার করতে হয় যে, সাহিত্যিক কিংবা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সংগ্রহগুলো প্রকাশিত হয় নি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছেলেভুলানো ছড়া এবং গ্রাম্য-গীতিগুলো সংগ্রহ করেছিলেন, ব্রতকথাগুলো এ পর্যন্ত কেউ সে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংকলিত করেন নি—কেবলমাত্র ধর্মীয় আচার পালনের উদ্দেশ্যেই এগুলো সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

অতএব তাদের দ্বারা যাঁরা ব্রতগুলো উদ্‌যাপন করে থাকেন, তাঁদের প্রয়োজনীয়তা মিটলেও, যারা তার মধ্যে থেকে সাহিত্যরস উপলব্ধি কিংবা সমাজতত্ত্বগত উপকরণ সন্ধান করে থাকেন, তাঁদের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নেতৃত্বাধীনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একবার বাংলার ব্রতকথাগুলো সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার কার্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং তাঁর উৎসাহে ও কর্মতৎপরতায় মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে কিছু মেয়েলী ব্রতকথা সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিতও হয়েছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে নি; স্বর্গতা কিরণবালা দেবীর সম্পাদনায় একখানি মাত্র ব্রতকথার সংকলন প্রকাশিত হবার পর এই বিষয়ে আর কোনও প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায় নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ব্রতকথার এই সংকলনখানির সঙ্গে বটতলায় প্রকাশিত ব্রতকথার বিবিধ সংকলনের তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, কথাগুলো নির্বাচন ও পরিবেষণের মধ্যে যদি শিল্পোচিত নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, তবে তা কেবলমাত্র ধর্মীয় আবেদন ব্যতীতও যথার্থ রসাবেদন সৃষ্টি করতেও সক্ষম হতে পারে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় 'ঠানদিদির থলে' নাম দিয়ে একখানি ব্রতকথার সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তারও ধর্মীয় আবেদন ব্যতীত আর কোনও আবেদন নেই। তিনিও কেবলমাত্র ব্রত উদ্‌যাপনের সহায়করূপে এই গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। তিনি তাঁর রূপকথা সংগ্রহের ভেতর দিয়ে যে রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন, এর মধ্যে তা দিতে পারেন নি। কিন্তু তা থেকে একথা মনে করা ভুল হবে যে, ব্রতকথাগুলোর কোনও সাহিত্যিক আবেদন নেই। বিষয়গুলো পরিবেষণ করবার কৌশল যথার্থ আয়ত্ত থাকলে তাদের মধ্যে থেকেও সাহিত্যিক আবেদন সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই বাংলার পল্লীগীতি সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়

করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' সংকলিত করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে দেশ দেশান্তরে প্রচার লাভ করেছে। কিন্তু যে লোক-কথার পরিচয়ের ভিতর দিয়ে বাংলার লোক-সাহিত্যের সমৃদ্ধতম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তার বিস্তৃত কোন সংকলন আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। ইংরেজি শিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সম্মুখীন হয়ে বাংলার লোক-সাহিত্য আজ বিপর্যস্ত হয়েছে; তার মধ্যে থেকে তার প্রাচীন গৌরবের সন্ধান পাওয়াও কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিষয়ে লোকসাহিত্য রসিকদিগের নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যেরও কোন অর্থ হয় না। বাংলার লোক-কথা এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তাও যদি উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়, তবে এদেশের জাতীয় সংস্কৃতির বিশেষ একটি দিকের যে পরিচয় পাওয়া যাবে, অন্য কোন বিষয় দিয়ে তা সম্ভব হতে পারবে না।

বাংলার পার্শ্ববর্তী আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে এ'পর্যন্ত লোক-সাহিত্যের যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্যে লোক-কথাই সর্বাধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয়েছে। বোডিং এবং বোমপাশের সাঁওতাল উপকথার সংগ্রহ ভারতীয় লোক-সাহিত্যের বিস্ময়। গারো, খাসি ও ত্রিপুরার রিয়াং জাতির উপকথার সংগ্রহও এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। সম্প্রতি উত্তর ব্রহ্মদেশ হতে উপকথার যে এক সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, বাংলার উপকথার সঙ্গে তার বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার উপকথার বিস্তৃততর সংগ্রহ ছাড়া তাদের উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।

ধাঁধাকে আধুনিক লোকশ্রুতিবিদ্ পণ্ডিতগণ লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ বলেই গ্রহণ করে থাকেন। বাংলার সমাজ-জীবনে ধাঁধার একটি ব্যাবহারিক মূল্য ছিল এবং এখনও যে একেবারে নেই, তা বল্‌তে পারা যায় না। কিন্তু সাধারণতঃ তা আজ শিশুর কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধাঁধার ভিতর দিয়েই একদিন সমাজ-জীবনে বুদ্ধির বিচার হতো এবং এই বিচারে

উত্তীর্ণ হলে পুরুষ নানা সামাজিক অধিকার লাভ কর্‌ত। আজ তার আর সে ব্যবহার নেই; সেই জন্য নূতন ধাঁধা যেমন রচিত হয় না, তেমনই পুরানো ধাঁধাগুলোও অব্যবহার্য হয়ে উঠেছে। নাগরিক জীবনে এক শ্রেণীর নূতন ধাঁধার এখন সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো ঐতিহ্য অনুসরণ করে আসে নি, বরং ব্যক্তিবিশেষ তার সচেতন বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা তা সৃষ্টি করে থাকে। তাদের সাহিত্যিক ধাঁধা বলা যায়; কিন্তু জাতীয় রস-চেতনার ঐতিহ্যের ভিতর থেকে একদিন যে সব ধাঁধার উদ্ভব হয়েছিল, তাদের মূল্য এদের তুলনায় অনেক বেশি।

প্রবাদ বাংলার লোক-সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। ইতিমধ্যে প্রায় দশ হাজার বাংলা প্রবাদ সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক নাগরিক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদের প্রচলন প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে; শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে তার ব্যবহার আর শুন্‌তে পাওয়া যায় না। তার ফলে বাংলা গদ্য ভাষার প্রাণশক্তি আজ বহুল পরিমাণে লুপ্ত হয়ে ক্রমাগতই তা কৃত্রিম হয়ে উঠছে।

পুরাকাহিনী বা myths বাংলার লোক-কথার অন্যতম বিষয়। সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্‌তে গিয়ে অবৈজ্ঞানিক মন একদিন যে বিজ্ঞান-চিন্তা করেছিল, তারই পরিচয় পুরাকাহিনী বা myths-এর মধ্যে পাওয়া যায়। কি করে পৃথিবীর জন্ম হলো, কি করে পশু-পক্ষী জীবজন্তু তার মধ্যে আবির্ভূত হলো, গ্রহ-নক্ষত্রের জন্ম রহস্যই বা কি, এই সব বিষয় পুরাকাহিনীতে কীর্তিত হয়েছে, তাই পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক লিখিত হয়ে কালক্রমে পুরাণ বা mythology-র রূপলাভ করেছে।

কোন ঐতিহাসিক জীবন কিংবা কোন ত্যাগ ও বীর্যের কাহিনী যখন কবিকল্পনায় পল্লবিত হয়ে তার ঐতিহাসিক পরিচয় প্রায় প্রচ্ছন্ন করে দেয়, তখনই তাকে ইংরেজিতে legend এবং বাংলায় ইতিকথা বলা হয়। বাংলার অতীত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ে যে সকল ত্যাগ-বীর্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা অনেক সময় পল্লীকবিকে

কাব্য-রচনার প্রেরণা দিয়েছে ; তবে বীর্য অপেক্ষা ত্যাগ-বৈরাগ্যের কাহিনীই এদেশে প্রাধান্য লাভ করেছে ; কারণ, এ'দেশে দৈহিক শক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তিকেই বেশি মূল্য দেওয়া হয়। বাংলার ইতিকথা সেইজন্য আধ্যাত্মিক শক্তি কিংবা ত্যাগ-বৈরাগ্যের কাহিনীতেই সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

৪

লোক-নাট্য

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই লোক-সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই উচ্চতর সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে থাকে, তারপর উচ্চতর সংস্কৃতির বিশিষ্ট কোন রূপ এইভাবে বিকাশ লাভ করবার পরও লোক-সংস্কৃতির বিশিষ্ট ধারা অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হয়ে যেতে পারে। বাংলা নাটক ও অভিনয়ের ক্ষেত্রেও যে তাই হয়েছে, তা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। বাংলাদেশেও সংস্কৃত ভাষাতেই হোক, কিংবা অন্য যে-কোন ভাষাতেই হোক, লিখিতভাবে নাটক রচিত হবার পূর্বেও যে মৌখিকভাবে নাটক রচিত হয়ে অভিনীত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রমাণ কেবলমাত্র যে বাংলাদেশের পক্ষেই সহজলভ্য, তা নয়,—যে সকল জাতির মধ্যে সাহিত্য সংস্কার অত্যন্ত প্রাচীন, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই নিতান্ত সুলভ। আমরা যখনই কোন জাতির নাটক কিংবা অভিনয় বিষয়ে অনুশীলন করে থাকি, তখন তার যে লিখিত রূপ বা পরিচয়টুকু পাই, তার মধ্যেই আমাদের অনুশীলন সীমাবদ্ধ রাখি ; কিন্তু লিখিত রূপের মধ্যে যেখান থেকে যথার্থ প্রাণ-শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে, তার সম্পর্কে কোন সংবাদ রাখি না। সেইজন্য লিখিত রূপের প্রকৃত তাৎপর্যও অনেক সময় বুঝে উঠ্‌তে পারি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা সাহিত্যে যে সকল নাটক রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে লিখিত সাহিত্যের ধারা যেমন

অনুসরণ করা হয়েছে, তেমনই লোক-নাট্যের মৌখিক ধারাও অনুসরণ করা হয়েছে। সুতরাং কেবলমাত্র লিখিত সাহিত্যরূপের সংস্কার দিয়ে যদি তাঁর নাটকের বিচার করা হয়, তবে তাঁর সম্পর্কে একটি গুরুতর ভুল করা হবে। বাংলার লোক-নাট্যের যে বিস্তৃত পটভূমিকার উপর তাঁর পৌরাণিক নাটক, এমন কি, তাঁর সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকগুলোরও কতকাংশ রচিত হয়েছে, তা সম্যক্ উপলব্ধি করতে না পারলে, কোন নাটকেরই যথার্থ শক্তি ও আবেদন উপলব্ধি করা যাবে না। জাতির সাহিত্যসৃষ্টিতে জাতির ঐতিহ্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না, বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যে জাতীয় রস-সংস্কারের প্রেরণা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। অজ্ঞতা বশতঃ এই বিষয়টি অস্বীকার করে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে কোন বিচারই সার্থকতা লাভ করতে পারে না। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের কথাও যদি ধরা যায়, তথাপি দেখতে পাওয়া যাবে যে, তাঁর মাত্র দু'একখানি নাটক বাদ দিলে আর সকল নাটকই দেশীয় যাত্রার পালার আকারে লিখিত। তিনি নিজেও তাঁর 'রক্তকরবী' সম্পর্কে বলেছেন, 'আজ আপনাদের বারোয়ারী সভায় আমার "নন্দিনী"র পালা-অভিনয়। প্রায় কখনও ডাক পড়ে না, এ'বারে কৌতূহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে পালা সাঙ্গ হলে ভিখ্ মিলবে না— কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করবার চেষ্টা কোর্‌বে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট কর্‌তে পার্‌বে না।' 'বারোয়ারী সভা' 'পালা' ইত্যাদি কথা যে বাংলার লোক-নাট্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই এসেছে, তা সত্য। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গীতিনাট্য কিংবা রূপক নাট্যই এই যাত্রার 'পালাগান'। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নাটকের আঙ্গিক কিংবা ভাব-বস্তু নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি, তখন বাংলার ঐতিহ্যকেই অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন হয়, ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান ও অধিকার এই বিষয়ে কিছুই সাহায্য করতে পারে না।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটক এবং বাঙ্গালীর রঙ্গমঞ্চ পাশ্চাত্ত্য আদর্শে পুনর্গঠিত হলেও, এ'কথা কেউ বলবেন না যে, বাংলা নাটকের তখনই জন্ম হয়েছিল। কারণ, হাজার বছর আগে রচিত 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে বিভিন্ন ভাবে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার সংস্কার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবার আগে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে বাংলা নাটক রচিত হতে আরম্ভ করল সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীর নূতন যুগের নূতন নাটকের এ'যাবৎকাল প্রচলিত বাংলার বিভিন্ন লোক-নাট্যের সংস্কার তার ভেতর থেকে কিছুতেই দূর হতে পারল না। সেইজন্য সেই যুগেও বাংলা নাটক যা রচিত হল, তা পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্য নাটক হলো না বটে, তবে বাঙ্গালীর নাটক হলো। বাংলা নাটকের এই বিশেষ রূপটির পরিচয় পেতে হলে তার লোক-নাট্যের ধারাটি অনুসরণ করবার প্রয়োজন হয়।

লোক-নাট্য বলতে এখানে প্রকৃত কি মনে করা হচ্ছে, তা একটু স্পষ্ট করে বলা আবশ্যক মনে করি। সাহিত্যের যে-কোন বিষয় যদি লোক (Folk) সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার প্রধান বিশেষত্ব এই হবে যে, তার কোন লিখিত পরিচয় থাকবে না। লিখিত সাহিত্যরূপ মাত্রই একটি বিশিষ্ট অনমনীয় (Rigid) রূপ লাভ করে তার ফলে একটিমাত্র আদর্শ সমাজের সাম্নে অবিচল হয়ে থাকে—ভাব এবং রূপ উভয়ের দিক দিয়েই তা ক্রমবিকাশের অন্তরায়। কিন্তু লোক-সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিষয়েরই অবশ্য-পালনীয় ধর্ম ক্রমবিকাশ, তা গতিশীল (dynamic), স্থিতিশীল (static) নয়।

এ'কথা মনে হতে পারে, নাটকের মত একটি সুদীর্ঘ বিষয় কি ভাবে কেবলমাত্র মৌখিক প্রচারিত হয়ে ক্রম-বিকাশ লাভ করতে পারে? কিন্তু নিরক্ষর সমাজের স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে যাঁদের সামান্য ধারণাও আছে, তারাই স্বীকার করবেন যে, তা কখনই অসম্ভব নয়। 'মাণিকচন্দ্র রাজার গানে'র মত

সুদীর্ঘ গীতি-কাহিনী জর্জ গ্রীয়রসন সাহেব রংপুর জেলার নিরক্ষর কৃষক সমাজের নিকট থেকে কেবলমাত্র মৌখিক শুনতে পেয়ে লিখে নিয়েছিলেন। লোক-নাট্যের কোন বিষয়ই তা অপেক্ষা দীর্ঘ নয়। বাংলাদেশে চিরকালই লোক-গীতির বিভিন্ন বিষয় পরিবেষণের এক-একটি সুনির্দিষ্ট রীতি আছে। অধিকাংশ গীতিকাহিনী সমস্ত রাত কেবলমাত্র মৌখিক গীত হয়, তা 'জাগরণ' নামে পরিচিত। লোক-নাট্যও একদিক দিয়ে 'জাগরণ গান', ; কারণ, সমস্ত রাত ধরেই তার অনুষ্ঠান হয়। সুতরাং লোক-নাট্যের দৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন, তা নিরক্ষর সমাজের স্মৃতির মধ্যে রক্ষা করবার পক্ষে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে ঐতিহ্যমূলক বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে যেমন লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় রচিত হয়, লোক-নাট্যও তাই হয়। বাংলার জাতীয় কাব্য, জাতীয় জীবনে স্বাঙ্গীকৃত বহিরাগত সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় উপকরণ, যেমন রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির কাহিনী অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে, বাংলার লোক-নাট্যের একটি ধারাও তেমনি রচিত হয়েছে। তার আর একটি ধারা লৌকিক বীরত্ব ও প্রণয়-কাহিনী নিয়ে রচিত হলেও, তাও ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে যায় নি ; সামগ্রিকভাবে জাতীয় না হলেও দেশের আঞ্চলিক ঐতিহ্যের ভিত্তি অবলম্বন করেই তা রচিত হয়েছে। মধ্যযুগের ইংরেজী নাটক যেমন কাব্যধর্মী ছিল, বাংলার লোক-নাট্য ছিল তেমনই গীতি-ধর্মী। জাতীয় গীতি-প্রবণতার প্রেরণা থেকেই বাংলার লোক-নাট্যে গীতিধর্মিতার ভাব এসেছে ; সুতরাং তাও জাতীয় ঐতিহ্য বিরোধী কোন প্রেরণা নয়। কেবলমাত্র গীতি-ধর্মিতাই নয়, গীতির সঙ্গে নৃত্যের অনুষ্ঠানও লোক-নাট্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ; নৃত্য ব্যতীত লোক-নাট্যের কল্পনা করা যায় না। উচ্চতর পাশ্চাত্ত্য নাটকের মধ্যে নৃত্যের কোন স্থান না থাকলেও পাশ্চাত্ত্য দেশের লোক-নাট্যে নৃত্যের বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রায়

প্রত্যেক দেশের লোক-নাট্যই নৃত্য-সম্বলিত। জাতীয় রস-সংস্কারের বিভিন্ন উপকরণই জাতির নাট্যানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। আধুনিক বাংলা নাটকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তার অভাব দেখা গেলেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের কোন কোন ধারায় যে নৃত্য এবং সঙ্গীত এত প্রাধান্য লাভ করেছিল, তা তার উপর যে লোক-নাট্যের প্রভাবের ফল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে সঙ্গীত প্রাধান্য লাভ করে থাকে; তা যেমন তারই ফল, তেমনই তাঁর রচিত নৃত্য-নাট্যগুলোও যে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে, তার মূলেও এই কথাই বর্তমান রয়েছে।

বাংলায় সাহিত্যিক গদ্যভাষার জন্মের পূর্বে গীত এবং নৃত্যই বাংলা লোক-নাট্যের অবলম্বন ছিল। তারপর এক দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের সৃষ্টির পর পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে গদ্য সংলাপ দিয়ে যখন বাংলা নাটক রচিত হতে লাগল, তখন লোক-নাট্যগুলোতে তাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করল। কিন্তু সমাজের যে স্তরে লোক-নাট্যগুলো রচিত ও অনুশীলিত হয়ে থাকে, তার সঙ্গে সাহিত্যিক গদ্যভাষার কোন সম্পর্ক থাকত না বলে, বাংলা লোক-নাট্যের গদ্যভাষা অনেক সময়ই নিতান্ত গ্রাম্যতাদোষ-যুক্ত হতে বাধ্য হোত। তবে গদ্যভাষার ভিতর দিয়ে তার লেখকগণ বিশেষ কোন শিল্পকৌশল দেখাতে পারেন না বলে সঙ্গীতই প্রধানতঃ তাদের অবলম্বন হত। সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে সুগভীর ভাবের অভিব্যক্তির কোন অন্তরায় হয় না। বরং সঙ্গীতের বন্ধনেই তাদের শক্তি রক্ষাপায়, গদ্য সংলাপের ভিতর দিয়ে তা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক দেশেই লোক-নাট্যই জাতীয় নাটকের ভিত্তি। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। বাংলা-দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে তার জাতীয়

জীবনের রস-সংস্কারের ধারা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে তার সাংস্কৃতিক জীবনে এক অন্ধকার যুগ দেখা দিয়েছিল, তা উত্তীর্ণ হয়ে যখন জাতি নূতন জীবনের নব অরুণোদয়কে অভিনন্দন জানিয়ে বরণ করে নিল, তখন তার পূর্ব-জীবনের সংস্কার লুপ্ত হয়ে গেছে। তখন থেকে তার যে নূতন জীবনের জয়যাত্রা সুরু হয়েছিল, তার মধ্যে পূর্ববর্তী জীবনের প্রেরণা নিতান্ত ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে; সেইজন্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের উপর বাংলার নূতন জীবনের নূতন সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে নি। সুতরাং বাংলার লোক-নাট্যের ভিত্তির উপর এ দেশের উচ্চতর নাট্যসাহিত্য জন্ম লাভ করতে পারল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙ্গালীর রস-সংস্কারের মধ্যে লৌকিক নাটকের একটি প্রেরণা সক্রিয় ছিল বলে, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবজাত বাংলা নাটক রচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে বাংলার লোক-নাট্যের উপকরণ প্রবেশ করতে লাগ্‌ল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগের অবসানেই যে এক শ্রেণীর গীতি ও নৃত্যবহুল পৌরাণিক ও রোমান্টিক নাটক রচিত হয়েছিল, তার এই কারণ। এই সকল বাংলা নাটকের মধ্যে দেখা গেল যে, তাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যের উপকরণ যেমন রয়েছে, তেমনই পাশ্চাত্ত্যের লোক-নাট্যের উপাদান গিয়েও প্রবেশ করেছে, তার ফলে অচিরকাল ব্যবধানে বাংলা নাটক বলে যা রচিত হতে লাগল, তাতে পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণের প্রতি আসক্তি যেমন দেখা গেল না, তেমনই আনুপূর্বিক লোক-নাট্যের ধারাটিও অনুসরণ করতে দেখা গেল না; উভয়ের সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীর চেতনায় এক নূতন রস-সম্পদ জন্মলাভ করল।

বাংলার লোক-নাট্য যে কত প্রাচীন কাল থেকে এ দেশের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আনন্দ দান করে এসেছে, তা অনুমান করে বলাও অসম্ভব। জীবনকে অনুকরণ করবার প্রবৃত্তি থেকেই নাটকের জন্ম হয়, লোক-নাট্যও তাই। অনেক ছেলেভুলানো-ছড়া যথার্থ নাটকীয় বলে মনে হতে পারে; মনে হয়, তাদের

মধ্যেই আদিম সমাজে নাটকের বীজ উপ্ত হয়েছিল। নাটকের মত শিশুর খেলাও শিশুর জীবনের অনুকরণ বা জীবনের ছায়া। সেইজন্য তাদের মধ্যে জীবনের রূপ অতি সহজেই ধরা পড়ে।

লিখিত সাহিত্যের প্রত্যেক বিষয়েরই যেমন এক একটি প্রাচীন বা পূর্ববর্তী রূপ থাকে, যা ক্রমে 'ক্লাসিক্‌স্' (classics) বা 'প্রাচীন' সংজ্ঞা লাভ করে, লোক-সাহিত্যের কোন বিষয়েই তেমন কোন পরিচয় থাকে না ; সেই সূত্রে লোক-নাট্যেরও প্রাচীন কোনও রূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। লোক-সাহিত্যে কেবলমাত্র একটি যুগই আছে, তা আধুনিক যুগ। লোক-নাট্যেরও কেবল একটি মাত্রই যুগ, তাও আধুনিক যুগ। তবে পরবর্তী কালে লোক-নাট্য যে আধুনিক রূপেই বর্তমান ছিল, তা নয়। লোক-সাহিত্যের যেমন পরিবর্তনশীলতাই ধর্ম, লোক-নাট্যেরও তাই। ক্রমাগত পরিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়েই লোক-সাহিত্যের সকল বিষয়ের মত লোক-নাট্যেরও অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। যেখানে এই পরিবর্তনের ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়, সেখানেই তার বিনাশ অনিবার্য হয়ে উঠে। লোক-নাট্য যতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র লোক-সমাজের মধ্য দিয়ে মৌখিক অগ্রসর হয়ে যায়, ততদিন তার প্রাণশক্তি বিনষ্ট হতে পারে না ; কিন্তু যখনই তা কোন লিখিত রূপ লাভ করে, তখনই তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়।

বাংলার প্রাচীনতম বৈষ্ণব গীতিকাব্য জয়দেব রচিত 'গীত-গোবিন্দ' যে কোনও লোক-নাট্যের ভিত্তির ওপর রচিত হয়েছিল, তা বুঝতে পারা যায়। এই গীতিকাব্যখানি সম্পর্কে একটি মত প্রচলিত আছে যে, তা মূলতঃ বাংলার তদানীন্তন প্রাদেশিক ভাষায় বা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হয়েছিল, তারপর সেন রাজসভায় সংস্কৃত প্রভাবের বশবর্তী হয়ে আদ্যোপান্ত সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়েছে। যদি তা হয়ে থাকে, তবে তা যে লোক-নাট্যের ভিত্তির উপর রচিত হয়েছিল, এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়মূল হয়। 'গীত-গোবিন্দে'র অন্তর ও বহির্মুখী পরিচয় লক্ষ্য করলে তার মধ্যে

লৌকিক উপাদানের যত সন্ধান পাওয়া যাবে, পৌরাণিক কিংবা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রভাব তত অনুভব করা যাবে না। তা দিয়ে এর সঙ্গে লোক-সাহিত্যের মৌলিক সম্পর্ক প্রমাণিত হয় এবং লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তাতে যে রূপটির প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হয়, তা লোক-নাট্যের প্রভাব। লোক-নাট্যের প্রভাব বলবার কারণ এই যে, 'গীত-গোবিন্দে'র বিষয়-বস্তু কোন পুরাণ-সম্মত নয়, তার রচনা-পদ্ধতিও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুমোদিত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা যে একটি সুগঠিত কাব্যরূপ লাভ করেছে, তার অর্থ ই এই যে, প্রায় অনুরূপ একটি কাহিনী সমাজের মধ্যে মৌখিক প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রথমতঃ অপভ্রংশ ও তারপর সংস্কৃত ভাষায় তা লিখিত রূপ লাভ করবার পর, তার মৌলিক এবং মৌখিক পরিচয়ের আর বিশেষ কিছু তাতে অবশিষ্ট থাকতে পারে নি—কেবল মাত্র কাঠামোটুকুই অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং তার মধ্যে থেকেই এর প্রাচীনতম লোক-নাট্যের সামান্য আভাস পাওয়া যেতে পারে।

'গীত-গোবিন্দে'র প্রথম শ্লোকটি থেকে শেষ শ্লোকটি পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেলেই বুঝতে পারা যাবে যে, তা কতকগুলো সংস্কৃত শ্লোকে রচিত গীতি-সংলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু বর্ণনা ব্যবহৃত হয়েছে সত্য ; কিন্তু তা বিভিন্ন সংলাপের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানগুলো মাত্র পূর্ণ করেছে, তা ছাড়া কাহিনীর দিক দিয়ে আর কোনও দায়িত্ব পালন করে নি। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ যে অনুমান করেছেন, তা পূর্বে দেশীয় ভাষায় রচিত হয়েছিল, তার সমর্থন এতেও পাওয়া যায়। কারণ, দেখা যায়, 'গীত-গোবিন্দে'র পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রচনা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও কতকগুলো সঙ্গীত-সংলাপের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। 'গীত-গোবিন্দ' যদি প্রথমতঃ দেশীয় ভাষাতেই রচিত হয়ে থাকে, তবে একটি মৌখিক প্রচলিত রূপ অবলম্বন করে যে প্রথম তা লিখিত রূপ লাভ করেছিল, তা বুঝতে পারা যায়। সেই মৌখিক রূপই বাংলার লোক-নাট্যের একটি

অতি প্রাচীন নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তা মূলতঃ কি প্রকৃতির ছিল, তা আজ সম্পূর্ণ বোঝবার উপায় নেই; কেবল 'গীত-গোবিন্দে'র মধ্যে থেকে তার সম্পর্কে সামান্য একটু ধারণা করা যায় এই মাত্র। এই বিষয়ে যতদূর মনে হয়, তা থেকে তার প্রাচীনতম মৌখিক অথবা লোক-নাট্যের রূপ সম্পর্কে এইটুকু অনুমান করা যায়।

'গীত-গোবিন্দে'র প্রাচীনতম মৌখিক রূপ যে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী-ভিত্তিক রচনাই ছিল, এমন না-ও হতে পারে। বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার লাভ করবার পূর্বে যেমন লোক-সঙ্গীত মাত্রই রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ রচনা ছিল, তারপর ক্রমে তাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম এসে প্রবেশ করতে লাগল, তেমনই 'গীত-গোবিন্দে'র প্রাচীনতম মৌখিক রূপের মধ্যেও রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের অস্তিত্ব না থাকাই সম্ভব ছিল। তারপর যখন তা দেশীয় ভাষায় প্রথম গীতিকাব্যের আকারে রচিত হয়, তখন ইতিমধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ সমাজে প্রচারলাভ করবার ফলে, তাতে রাধাকৃষ্ণের নাম, দশাবতার বন্দনা ইত্যাদি এসে প্রবেশ করে। লিখিত সাহিত্যই তত্ত্বভারে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, মৌখিক সাহিত্য কদাচ অনাবশ্যক বস্তুভার বহন করতে পারে না। সেইজন্য এ'কথা সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, 'গীত-গোবিন্দে'র অন্তর্ভুক্ত দশাবতার স্তোত্র পরবর্তী কালে তাতে এসে যুক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ দশাবতার স্তোত্র-অংশ যে 'গীত-গোবিন্দ' প্রসঙ্গের অপরিহার্য বিষয় নয়, তাও সকলেই স্বীকার করবেন। তারপর সর্বশেষে যখন তা সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কাব্যরূপে গৃহীত হয়েছিল, তখন তার মৌলিক লোক-নাট্যগত পরিচয় আরও প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে তার উপরিস্তরে রাজসভার বহির্মুখী ঐশ্বর্যের ছাপ পড়ে গেল। এই ঐশ্বর্য পরিচয়ের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনদেবের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস এসে যুক্ত হয়ে তার মৌলিক পরিচয় অনেক দিক দিয়ে লুপ্ত করে দিয়েছে। প্রায় প্রত্যেক জাতিরই লোক-নাট্যের এই পরিণাম

নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব হয়েছে। সেইজন্যই অনুমান করা যায় যে, 'গীত-গোবিন্দে'র মৌলিক রূপের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের কোন প্রসঙ্গ ছিল না, কেবলমাত্র সাধারণ নরনারীর প্রেম-গীতিরূপেই তা লোক-মানসে (folk mind) প্রথম বিকাশলাভ করেছিল।

তার আরও একটি প্রমাণ এই যে, 'গীত-গোবিন্দে'র কাহিনী কোন প্রচলিত পুরাণকে অনুসরণ করে রচিত হয় নি। বাংলার লোক-সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের নাম থাকা সত্ত্বেও যেমন তা বৈষ্ণব পদাবলী হয় নি, তেমনই 'গীত-গোবিন্দে' রাধাকৃষ্ণের নাম থাকা সত্ত্বেও তা পুরাণ নয়। শ্রীচৈতন্যদেব তার পদ গান করতেন বলেই পরবর্তী বৈষ্ণব সাধকগণ তাকেও বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তথাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ-বিরোধী বহু বিষয় তার মধ্যে স্থানলাভ করেছে। সুতরাং তা বৈষ্ণব প্রভাব বহির্ভূত অঞ্চলেই মৌখিক উদ্ভূত হয়েছিল, এ' কথাই সত্য বলে মনে হয়। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ তার মধ্যে থাকবার কোন কথা ছিল না।

'গীত-গোবিন্দে'র প্রাচীনতম মৌখিক লোক-নাট্যের রূপ যে কেবলমাত্র কতকগুলো গীতি-সংলাপের সমষ্টিমাত্র ছিল, তাও স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। কারণ, একবার দেশীয় ভাষায় এবং পুনর্বার তা থেকে সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তিত হয়েও তার গীতিরূপ বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি। এই ধারা অবলম্বন করেই যে প্রাচীনকালে এদেশে লোক-নাট্য মাত্রই রচিত হোত, সে সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হবার আরও কতকগুলো কারণ আছে। যেমন, 'গীত-গোবিন্দে'র পরবর্তী উল্লেখযোগ্য লোক-নাট্যের লক্ষণাক্রান্ত রচনা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব রয়েছে এবং এই ধারাটিই ক্রমে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষ্ণযাত্রা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছে। কেবলমাত্র 'গীত-গোবিন্দ' ব্যতীতও এই সকল বিভিন্ন সূত্র থেকেও এই উক্তির সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'গীত-গোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও সংস্কৃত শ্লোক যে ভাবে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে, 'গীত-গোবিন্দ' সেইভাবে আবৃত্তি করা

যায় না, বাংলা গানের সুরে তা গীত হয়। গীত হবার জন্য যে সকল রাগরাগিণী নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তা সকলই মধ্যযুগে পদাবলী কীর্তনের মধ্যে ব্যবহৃত হোত। সুতরাং তার প্রাচীনতম যে মৌখিক রূপটি ছিল, তার মধ্যে যে সুর ব্যবহৃত হোত, তা তার দেশীয় এবং সংস্কৃত ভাষার আবরণের মধ্য দিয়েও রক্ষা পেয়ে এসেছে বলে মনে হতে পারে। ভাষার রূপ ক্রমাগত পরিবর্তন স্বীকার করে নিলেও সুর অবিনাশী, বিভিন্ন যুগের পরিবর্তিত ভাষা-রূপের মধ্য দিয়েও অবিনাশী সুর তার অবিকৃত পরিচয় রক্ষা করে অগ্রসর হতে থাকে। সেইজন্য 'গীত-গোবিন্দে'র ওপর বাইরে থেকে যখন যে-কালের আঘাতই এসে পড়ুক না কেন, তার সুরের অখণ্ডতায় কোনদিক দিয়ে কেউ আঘাত করতে পারে নি। বাংলা গানের একটি নিজস্ব সুর তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাকে সংস্কৃত ভাষাও বিনাশ করতে পারে নি। তা থেকে বুঝতে পারা যায়, প্রাচীনতম বাংলার লোক-নাট্য কেবলমাত্র গীতি-সংলাপের পরম্পরায় রচিত হোত, তার মধ্যে গদ্যসংলাপ থাকলেও, তা প্রাধান্য লাভ করত না। নৃত্য এবং গীত প্রত্যেক জাতিরই লোক-নাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং 'গীত-গোবিন্দে'র মৌলিক লোক-নাট্যরূপের মধ্যে যদি গীতি প্রাধান্যলাভ করে থাকে, তবে তা নৃত্যসম্বলিত গীতি হওয়াই স্বাভাবিক। লোক-নাট্যের মধ্যে নৃত্য যত সহজে প্রবেশলাভ করতে পারে, উচ্চতর নাটকের মধ্যে তা তত সহজে পারে না। সেইজন্য 'গীত-গোবিন্দে'র সংস্কৃত গানের মধ্যে নৃত্য ক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছে। তথাপি তার সুর এবং গীত-রীতি লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, নৃত্য তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার পক্ষে কোন বাধা নেই; তার সুর এবং গীত-রীতির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, সহজেই তাতে নৃত্যও প্রবেশ করতে পারে। পুরীর মন্দিরে একদিন দেবদাসীর নৃত্যের সহযোগে যে 'গীত-গোবিন্দ' গান করা হোত, তা সকলেই, জানেন। লক্ষ্মণসেনদেবের সভাতেও যে একদিন নৃত্য সহযোগেই

'গীত-গোবিন্দ' পরিবেষণ করা হোত, তাও অনুমান করা যায়। কারণ, জয়দেব স্বয়ং পদ্মাবতী নাম্নী রাজসভার একজন নর্তকীর 'চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। এমন কি, 'গীত-গোবিন্দে'র এই সুপরিচিত শ্লোকটির মধ্যেও নৃত্যের উল্লেখ রয়েছে,

'ললিত লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে,
মধুকর-নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ-কুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে,
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমংসখি
বিরহিজনস্য দুরন্তে॥'

অর্থাৎ মলয়-সমীর লবঙ্গলতার আলিঙ্গনে কেমন কমনীয় ভাব ধারণ করেছে, ভ্রমরসমূহের ঝঙ্কারে এবং কোকিলের কুহুধ্বনিতে কুঞ্জকুটীর কেমন পরিপূর্ণ; হে সখি! এই বিরহীগণের পক্ষে দারুণ যন্ত্রণাময় মধুর বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ যুবতী নারীগণের সহিত বিহার এবং নৃত্য কচ্ছেন। 'গীত-গোবিন্দে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির মধ্যে নৃত্যের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন—

করতল-তাল-তরল-বলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহ নৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশংসে॥

অর্থাৎ রাস-ক্রীড়ায় হরির সহিত নৃত্যপরায়ণা কোন কোন যুবতী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির সঙ্গে করতালি দিচ্ছে এবং সেই সঙ্গে তাদের বলয়ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে; দেখ, শ্রীহরি তাকে প্রশংসা কচ্ছেন। এর মধ্যে যেভাবে নৃত্যের কথাটি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 'গীত-গোবিন্দে'র কেবলমাত্র আদি মৌলিক রূপই নয়, তার সংস্কৃত রূপটিও অদ্যোপান্ত নৃত্যের মধ্য দিয়ে পরিবেষণ-যোগ্য। সুতরাং 'গীত-গোবিন্দ' বাংলার প্রাচীনতম নৃত্যনাট্য, এবং লোক-নাট্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ নৃত্য।

নৃত্যসম্বলিত এই লোক-নাট্যের ধারা বাংলা দেশে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে অগ্রসর হয়ে এসেছে; সে যুগের এই শ্রেণীর রচনাকে নাট-

গীত বল্‌ত; 'নাট-গীত' শব্দের অর্থই হচ্ছে নৃত্যসম্বলিত গীতি। বাংলার লোক-নাট্যের একটি ধারায় নৃত্য স্থান লাভ করলেও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, আর একটি ধারার মধ্য থেকে নৃত্য পরিত্যক্ত হয়েছিল, তা কৃষ্ণযাত্রা বলে পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আসার পর তা ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের প্রভাবের বশীভূত হয় এবং তারই ফলে বিশেষত্ব-বর্জিত হয়ে যায়, নাট-গীত ইতিপূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

৫

লোক-নৃত্য

প্রথমতঃ তুর্কী আক্রমণ এবং দ্বিতীয়তঃ ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের পর বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবন থেকে তার যে সকল জাতীয় উপকরণ বিলুপ্ত হতে আরম্ভ করেছিল, নৃত্যশিল্প তাদের অন্যতম। বিজেতা তুর্কীগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামধর্ম কিংবা ইংরেজ জাতি প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা, উভয়ই বাঙ্গালীর জাতীয় এই একটি রস-সংস্কারের বিরোধী ছিল। তার ফলেই আজ জাতির রস-চেতনার মধ্য থেকে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে আশ্রয় করে যে কিভাবে বাঙ্গালীর সৌন্দর্য ও শিল্পবোধ গড়ে উঠেছিল, তা অনুসন্ধানের ফলে আজও আমরা জানতে পারি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে নৃত্যশিল্পের দুটি ধারা আছে, একটা সুনির্দিষ্ট কোন রীতিকে অনুসরণ করে গড়ে উঠে, তাই প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি বা 'ক্লাসিক্যাল ড্যান্স' বলে পরিচয় লাভ করে। সমগ্রভাবে সমাজের পরিবর্তে সমাজের বিশিষ্ট কোন অংশ কর্তৃক অনুশীলনের ফলে তা কালক্রমে একটা বিশিষ্ট (rigid) আদর্শ গড়ে তোলে; বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগ না থাকলেও, সমাজের যে অংশ চিন্তা কিংবা কর্মে নানা বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করে থাকে, তার ভিতর থেকেই তার বিকাশ হয়। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি 'ভরত নাট্যম্'

সে অঞ্চলের মন্দির এবং দেবসাধনাকে অবলম্বন করে বিকাশলাভ করবার ফলে কেবলমাত্র সমাজের উচ্চতর একটি অংশকেই অবলম্বন করেছিল। কালক্রমে তা একটি সুনির্দিষ্ট বিধির অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে তার স্বাধীন বিকাশের ধারাটি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ; ফলে তা প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্য বা 'ক্লাসিক্যাল ড্যান্স' বলে গণ্য হোল। কিন্তু সমস্ত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে নিম্নতর সাধারণ সমাজের মধ্যে উৎসবে-পার্বণে যে নৃত্যধারা স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছিল, তার সুনির্দিষ্ট কিংবা অনমনীয় কোন পদ্ধতি কোন-কালেই বিধিবদ্ধ হয় নি বলে, তার ধারা কোনকালেই লুপ্ত হয়ে যেতে পারে নি এবং কখনও প্রাচীন বা ক্লাসিক হয়ে উঠবার অবকাশও পায় নি ; তাই লোক-নৃত্য। লোক-নৃত্যের প্রাচীন কোন রূপ নেই, তার ধারা প্রবহমাণ, তা লুপ্ত হলেও প্রাচীন হয় না।

লোক-নৃত্যই প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যের ভিত্তি ; প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্য বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে লোক-নৃত্যের উপকরণ পাওয়া যায়। লোক-নৃত্যেরই বিশেষ এক-একটি রূপ সুদীর্ঘকাল অনুশীলনের ফলে সুনির্দিষ্ট একটি রীতি গ্রহণ করে ; সুনির্দিষ্ট রীতিগুলোর মধ্যে কতকগুলো নতুন নতুন আঙ্গিক গড়ে উঠে তাকে উচ্চতর নৃত্যশিল্পের রূপ দান করে। তার ফলেই লোক-নৃত্যের বৈশিষ্ট্য থেকে তা পৃথক্ হয়ে যায়। মণিপুরের রাস-নৃত্যের কথা যদি ধরা যায়, তা হলে দেখা যায়, তার একটি প্রাচীনতর লোক-নৃত্যগত পরিচয় ছিল, এখন তা উচ্চতর নৃত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে ; তার আদর্শটি ক্রমে অপরিবর্তনীয় বা rigid হয়ে পড়ে একটি প্রাচীন বা ক্লাসিক্যাল নৃত্য-পদ্ধতির অঙ্গীভূত হয়ে পড়বার অবস্থা আসন্ন হয়েছে। যে আঙ্গিকগুলো কালক্রমে মণিপুরী রাস-নৃত্যের মধ্যে গড়ে উঠে লোকনৃত্য থেকে তাকে পৃথক্ করেছে, তা অতি সহজেই চিন্‌তে পারা যায়। প্রথমতঃ তার সুনির্দিষ্ট পোশাক পরিধানের রীতি। লোক-নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে, কোন রীতিকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে তা আঁকড়ে থাকে না। সেই জন্য লোকনৃত্যে

পোশাক-পরিচ্ছদের কোন বাঁধাধরা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। জাতির সর্বজনীন পোশাকই নৃত্যকালীন পোশাক। কারণ, লোক-নৃত্যে নৃত্যের ভাবটি জাতির জীবন থেকে আপনা থেকে বিকাশ লাভ করে, সেখানে জীবনের অন্তর্মুখী আচরণের মধ্যে নৃত্যের অনুভূতি প্রকাশ পায়। কিন্তু মণিপুরী নৃত্যই হোক, কিংবা অন্য কোনও আনুষ্ঠানিক নৃত্যই হোক, তা জাতির বহির্মুখী প্রয়োজনের দিক পূর্ণ করে মাত্র। যেমন দেবদাসী কিংবা রাজনর্তকী—এরা সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আনন্দ-প্রেরণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে নৃত্যের অনুষ্ঠান করে থাকে। মণিপুরী নৃত্য এখন তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, মণিপুরী জাতির বৃহত্তর সমাজ জীবন পরিত্যাগ করে এই নৃত্য একান্তভাবে রাজা কিংবা পুরোহিতের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেছে। সমগ্রভাবে সমাজকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র রাজা কিংবা পুরোহিতের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবার অর্থ কি, তা সকলেরই বোধগম্য—তা দিয়ে একদিকে ব্যক্তি-রুচি ও অপর দিকে ধর্মীয় লক্ষ্য সিদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু লোক-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তি-রুচির বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অনুগামী না হয়ে বরং সমাজের সামগ্রিক রস-চেতনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করা।

মণিপুরী নৃত্যের পোশাক-পদ্ধতি যেমন সুনির্দিষ্ট, তেমনি তার অঙ্গ-চালনাতেও একটি সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। একক হোক কিংবা গোষ্ঠীগত ভাবেই হোক, নৃত্যের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট অঙ্গ চালনার রীতি না থাকলে তা বিসদৃশ হয়, এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সুনির্দিষ্টতা যখন অন্ধ আনুগত্য হয়ে উঠে, তখনই তার প্রাণ-শক্তি বিনষ্ট হয়। লোক-নৃত্যের তুলনায় প্রাচীন নৃত্য-পদ্ধতি দৃশ্যতঃ যত আকর্ষণীয়ই হয়ে উঠুক না কেন, তা যে প্রাণ-হীন, তা এই কারণেই হয়ে থাকে। মণিপুরী নৃত্যের বহির্মুখী আঙ্গিক বিষয়ে বর্তমানে যে অন্ধ আনুগত্যের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাই তাকে প্রাচীন

বা 'ক্লাসিক' নৃত্যের পর্যায়ে স্থান দিয়েছে। সহজ স্ফূর্তির মধ্যে লোক-নৃত্যের আনন্দ বিকাশ লাভ করে। আয়াস-সাধ্য প্রচেষ্টায় উচ্চতর নৃত্যশিল্পের রূপ প্রকাশ পায়। মণিপুরী নৃত্যে একদিন যত সহজ আনন্দের সরস অভিব্যক্তি প্রকাশ পাক না কেন, আজ তা যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে, তাতে তার বাইরের আড়ম্বর দিয়ে অন্তরের সুগভীর ভাবটি ঢেকে দিয়েছে।

বাংলা দেশেও প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্য একদিন প্রচলিত ছিল—প্রাচীন সাহিত্যে ও শিল্পকীর্তিতে তার পরিচয় আমরা সর্বদাই পেয়ে থাকি। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলার প্রাচীন নৃত্য-পদ্ধতির মধ্যে লোক-নৃত্যের প্রভাব সর্বাধিক ছিল। বাংলার নিজস্ব পদ্ধতিতে রচিত মন্দিরগুলো যেমন সাধারণ বাঙ্গালীর বাস-গৃহের অনুযায়ী পরিকল্পিত হয়ে থাকে, বাঙ্গালীর প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতিও তার লোক-নৃত্য হতে সর্বাধিক উপকরণ সংগ্রহ করে পরিকল্পিত হয়েছে। এই সম্পর্কে বাংলাদেশের সঙ্গে উড়িষ্যা এবং আসামের কতকটা তুলনা করা যেতে পারে, কিন্তু তার স্বতন্ত্র কোন কারণ নেই। তা এই দুই প্রতিবেশী প্রদেশের উপর এর স্বাভাবিক প্রভাবের ফল ব্যতীত আর কিছুই নয়।

লোক-নৃত্যের সঙ্গে আদিবাসী নৃত্যের যে সম্পর্ক, তাও এখানে আলোচনা করে দেখা আবশ্যক। কারণ, বাংলার লোক-নৃত্য যে তার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের নৃত্য দিয়েও প্রভাবিত হয়েছে, তা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। বরং একদিক দিয়ে একথাও বলা যায় যে, বাংলার লোক-নৃত্য তার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের নৃত্যের ভিত্তির ওপরই উদ্ভূত হয়েছে। সুতরাং আদিবাসী-সমাজ এবং লোক-সমাজ উভয়ের পরস্পরের সম্পর্কের কথা আলোচনা করে দেখা আবশ্যক।

আদিবাসী সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে বহিরাগত সাংস্কৃতিক উপকরণ গৃহীত ও স্বাঙ্গীকৃত হয় না; কিন্তু লোক-সমাজ বা 'ফোক সোসাইটি'তে তা সর্বদাই হয়ে থাকে। একদিক দিয়ে

বরং বলা যায় যে, বহিরাগত উপকরণ গ্রহণ ও তার স্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়েই লোক-সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের পুষ্টি হয়ে থাকে। বাংলার লোক-নৃত্য বহিরাগত বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণ দিয়ে কেবলমাত্র যে পুষ্টিলাভ করেছে, তাই নয়, বরং তার মধ্যেই জন্মলাভ করেছে। বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলের আদিবাসী-সমাজ এবং বাংলার লোক-সমাজ এক নয়। সুতরাং আদিবাসী সমাজের উপকরণ অপরিবর্তিত রূপে কোথাও বাংলার লোক-সমাজে প্রবেশ লাভ করতে পারে নি। বিভিন্ন রূপান্তরের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের নৃত্যই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ লাভ করলেও তাদের মধ্যে কালক্রমে একটি অখণ্ড ঐক্য গড়ে উঠেছে। স্বাঙ্গীকরণের ধর্মই তাই—মৌলিক উপকরণ অন্যত্র হতে গ্রহণ করে নিজস্ব অন্তঃপ্রকৃতি অনুযায়ী আপন বিশিষ্ট রূপ তার ওপর আরোপ করা সম্ভব হয়ে থাকে। জাতির অন্তঃপ্রকৃতির বিশেষত্বই তাকে জাতীয় বিশেষত্ব দিয়ে থাকে। বাংলার লোক-সমাজের বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণের সঙ্গে তার আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক উপকরণেরও সেই সম্পর্ক বর্তমান।

আদিবাসী সমাজ অন্ধ আসক্তি বশতঃ নিজের সমাজ-জীবনের উপকরণগুলো আঁকড়ে ধরে থাকে। প্রাচীন পদ্ধতির ক্লাসিক্যাল নৃত্যের মত তারও প্রতিটি খুঁটিনাটি রীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি হয় বলে, তাও কালক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু লোক-সমাজের অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপকরণের মত লোক-নৃত্যও নতুন নতুন প্রেরণা তার নিজের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করে তার প্রাণশক্তি অব্যাহত রেখে অগ্রসর হয়। আজ যে ভারত জুড়ে আদিবাসী সমাজের নৃত্য এত বৈচিত্র্যহীন বলে অনুভূত হয়, তার প্রধান কারণ, বহুকাল যাবৎ তাদের মধ্যে বাইরের কোন সাংস্কৃতিক উপকরণ যেমন প্রবেশলাভ করতে পারে নি, তেমনি তা প্রতিবেশী সমাজকেও আর নূতন নূতন বিষয়ের প্রেরণা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেনি। কিন্তু একদিন আদিবাসী সমাজের উপকরণই

লোক-সমাজের অবলম্বন ছিল; সেদিন তার জীবনীশক্তি অটুট ছিল বলে অন্যকে সে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছে, নিজেও তেমনই নিজের মধ্যে নতুন নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছে।

আদিবাসী সমাজের সান্নিধ্যের জন্যই বাংলার লোক-নৃত্যেও এত বৈচিত্র্য দেখা যায়। বিশেষতঃ বাংলাদেশের প্রতিবেশী রূপে যে সকল আদিবাসী সমাজ বাস করে, অনেক সময়ই তাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত কোন ঐক্য দেখা যায় না। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে আদি-অস্ত্রাল জাতির আদিবাসীর বাস হলেও বাংলার উত্তর কিংবা পূর্ব সীমান্তে আর এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির আদিবাসীর বাস। তাদের একটি প্রধান অংশ বাংলা ভাষা গ্রহণ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসে বাস করতে থাকলেও হিন্দু ধর্ম ও সমাজ দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মৌলিক পরিচয় একেবারে প্রচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে নি। তারা প্রধানতঃ ইন্দো-মঙ্গোলয়েড্ বা কিরাত বলে পরিচিত। তাদের মধ্যেও যে বিভিন্ন শাখা আছে, তাও বিভিন্ন দিক থেকে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলার উত্তর, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের লোক-নৃত্য তাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে বলে অনুভব করা যায়। ইঙ্গো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির যে শাখা বাংলার পূর্ব সীমায় বাস করে, তাদের নৃত্য বৈচিত্র্যহীন; সেইজন্য মূলতঃ তার প্রভাবজাত অঞ্চলেও লোক-নৃত্য বৈচিত্র্যহীন ছিল বলে অনুভূত হয়। কিন্তু কালক্রমে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে আরও দুটি দিক থেকে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল,—একদিকে হিন্দুধর্ম ও আর একদিকে মুসলমান ধর্ম। বাংলার পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বৈচিত্র্যহীন লোক-সংস্কৃতির উপর যখন হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের প্রভাব বিস্তারলাভ করল এবং তা এই অঞ্চলের লোক-সমাজের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হয়ে গেল, তখনই দেখা দিল বৈচিত্র্য। ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির অংশ এই অঞ্চলের আদিম আদিবাসী বোড়ো জাতির নৃত্যধারার উপর একদিক থেকে হিন্দু সমাজের রাধাকৃষ্ণের কাহিনী, অপর দিক দিয়ে মুসলমান

সমাজের কারবালা যুদ্ধের বৃত্তান্ত এসে প্রবেশ করল। তার ফলে এই অঞ্চলের লোক-সমাজের নৃত্য নতুন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো। এই ভাবেই একদিকে এই অঞ্চলের গোপিনী খেলা, ঘাটু ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অন্যান্য লোক-নৃত্য বিকাশলাভ করলো এবং অন্য দিকে জারি নৃত্যও এক অভিনব প্রাণশক্তি লাভ করে সমাজের সকল কৌতূহল আকর্ষণ করতে লাগল। এই প্রভাব দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি দিক থেকে এসেও একই সমাজের মানস-ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার স্থাপন করেছে এবং একই জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হয়েছে বলে তারা একই সূত্র দিয়ে বিধৃত হয়েছে। এইভাবে বাংলার লোক-সংস্কৃতির মধ্যে ভাগবত, পুরাণ ও কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত একাকার হয়ে গেছে। আদি সমাজ-জীবন থেকে বাংলার লোক-সংস্কৃতির মৌলিক উপকরণগুলো এসে পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের কোন কোন উপাদানের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হয়ে বাংলার সংস্কৃতিকে নূতন রূপদান করেছে। বাংলার লোক-সমাজের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রবেশ করবার আগেও কিংবা রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর প্রভাব বহির্ভূত অঞ্চলেও বাংলার লোক-নৃত্য যে বৈচিত্র্যহীন ছিল, তা বলবার উপায় নেই। কারণ, দেখা যায় যে, বাংলার নাথ-ধর্ম সম্পর্কিত সাহিত্যের মধ্যেও নৃত্যের ব্যাপক অনুশীলনের পরিচয় আছে। এই নৃত্য লোক-নৃত্যেরই কোন কোন রূপ, প্রাচীন পদ্ধতির কোন নৃত্য নয়। নাথ-সাহিত্যে পাওয়া যায়, গোরক্ষনাথ নৃত্য করে যোগভ্রষ্ট মীননাথের চৈতন্যের উদয় করেছিলেন। নাথ-ধর্ম সর্ব ভারতীয় ধর্ম বললেও হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোন প্রাদেশিক সাহিত্যে গোরক্ষনাথের মধ্যে এই নৃত্যগুণের অস্তিত্বের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না; তার অর্থ এই যে, বাঙ্গালীর যে মৌলিক জনগোষ্ঠীর ওপর নাথধর্ম নিজের প্রভাব স্থাপন করেছিল, সেই জন-সমাজের মধ্যে নৃত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। সুতরাং বাংলার লোক-নৃত্যের প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায়, তার

মূলে যে বৈচিত্র্য আছে, তা আদিবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভাবের ফল।

প্রত্যেক দেশের সমাজেই আচার জীবনের অন্তর্ভুক্ত এক শ্রেণীর নৃত্য আছে, তাকে ইংরেজিতে 'রিচুয়েল ডান্স' বলে। আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কলাপের উদ্দেশ্য থেকেই তাদের উদ্ভব হয়ে থাকে। সমাজের ওঝা কিংবা পুরোহিত শ্রেণীর আদিম ধর্মাচারের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর নৃত্যের অস্তিত্ব আছে। তা অলোক বা 'মিস্টিক' ধর্মীয় আচার মাত্র। ইংরেজিতে তাকে ম্যাজিক বা 'মিস্টিক ডান্স'ও বলা হয়। তা লোক-নৃত্য না হলেও তার সঙ্গে লোক-নৃত্যের সম্পর্ক আছে। অনেক সময় ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের প্রকৃত তাৎপর্য সমাজ কর্তৃক বিস্মৃত হয়ে যাবার ফলে তা সাধারণ লোক-নৃত্যের রূপ লাভ করে। তখন তার আচারগত বা রিচুয়েল মূল্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ধর্ম ও ঐন্দ্রজালিকতা নিরপেক্ষ লোক-মনোরঞ্জনের গুণটিই তার মধ্যে প্রকাশ পায়। চৈত্র-সংক্রান্তির সময় শিবদুর্গা সেজে যে গাজন-নৃত্য এই দেশের সমাজে এখনও প্রচলিত, তার একদিন আচারগত মূল্য ছাড়া আর কোন মূল্য ছিল না; কিন্তু বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই তা আচার-নিরপেক্ষ সাধারণ আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পনের দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করবার পর একদা সন্ন্যাসী বা ভক্তগণ পরম নিষ্ঠাভরে দেবতার নিকট আগে থেকে মানত করে এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতো। কোন প্রকার নিয়মভঙ্গ করতো না। কিন্তু এই নৃত্যানুষ্ঠান বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই আমোদের ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তারই অবনতির আর একটি ধাপ অগ্রসর হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর ক'লকাতার জেলে পাড়ার সং-এ পর্যবসিত হয়েছে। কারণ, একবার আচারের বন্ধন অতিক্রম করে বার হলে স্বেচ্ছাচারিতা যে তাকে ব্যভিচারের কোন স্তরে নিয়ে যায়, তা কেউই বলতে পারে না। আধুনিক যুগের গাজন-নৃত্যের তাই হয়েছে। গাজন-নৃত্যের অধঃপতনের পথ ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীর

সং সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, আচার-নৃত্য লোক-নৃত্যে অবনমিত হয়ে ক্রমে তার সকল বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়।

বাংলার লোক-নৃত্যের মধ্যে পুরুলিয়া জেলার 'ছো'-নৃত্য নানা কারণে এখনও শ্রেষ্ঠ। তার আচার-গত মূল্য এখনও বিনষ্ট হয় নি বলেই এখনও তা কৌতুকের বিষয় হয়ে উঠ্‌তে পারে নি। আদ্যোপান্ত রামায়ণ কাহিনীটি বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত করে তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে; বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়েই গোষ্ঠীগত ভাবে তার অনুষ্ঠান হয়। বাংলার পল্লীজীবনের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিরই তা একটা বিশেষ রূপ। রামায়ণ-কাহিনীর সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির, তথা সমগ্র ভারতবাসীর যে আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়েছে, তার মর্যাদা সম্পূর্ণভাবেই এতে রক্ষা করা হয়ে থাকে বলেই তার সঙ্গে জাতির চিত্তের যোগ অতি সহজেই স্থাপিত হয়ে থাকে। এই নৃত্যের মধ্যে মুখোস ব্যবহৃত হয়; সেইজন্য মুখে চোখে নৃত্যকারীর কোন ভাবের অভিব্যক্তি অসম্ভব; কেবলমাত্র হস্ত, পদ এবং দেহের অন্যান্য অংশ দিয়েই তার ভাব ব্যক্ত হয়; কিন্তু তাতে যে সার্থকতা প্রকাশ পায়, তা উপেক্ষণীয় নয়। মুদ্রার ব্যবহারও তাতে নেই। ছো-নাচ পুরুষের নাচ, যুদ্ধ নাচ, এবং তার ভঙ্গির মধ্য দিয়ে যে পৌরুষের পরিচয় প্রকাশ পায়, তা এ'দেশে আর বিশেষ কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ঢালী, রায়বেঁশে—এ'রাও বাংলার প্রাচীন যুদ্ধ-নৃত্য। গম্ভীরার মুখোস নৃত্য এখনও আচার জীবনেরই অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রী-নৃত্য প্রধানতঃ আচার (ritual) নৃত্য। তাদের মধ্যে কাছাড়ের বউ নাচ (bridal dance) অনেকটা আচারের সম্পর্ক থেকে মুক্ত। বীরভূমের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বউ নাচ প্রচলিত আছে, তাও বিয়ের স্ত্রী-আচারের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। সেখানে বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলার মধ্যে নববধূকে নিয়ে নৃত্য করবার রীতি আছে। নববধূর গায়ে রঙ দেওয়া হয় এবং কুটুম্বস্বজন নববধূকে কোলে নিয়ে নৃত্য করেন। বাল্য-বিবাহ

প্রবর্তিত হবার আগে এ ক্ষেত্রে বধূ স্বয়ং তার নৃত্য কৌশল দেখাত, তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়।

৬

লোকাচার

সমাজ-জীবনের যে সকল আচার বা প্রথা (customs) কোন লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে না এসে কেবলমাত্র লোক-পরম্পরায় সমাজের মধ্যে প্রচারলাভ করে এবং তা দিয়ে সমাজের লৌকিক আচার-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, তাও জাতির লোক-শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন, আদিম সমাজ-জীবন থেকে তার উৎসার হলেও তা সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বিয়ের স্ত্রী-আচার তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

হিন্দু-বিবাহের আচার দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত—একটি বৈদিক আচার, আর একটি স্ত্রী-আচার; বৈদিক আচার লিখিত শাস্ত্রের পথ ধরে আসে, স্ত্রী-আচার সমাজের অলিখিত স্মৃতির পথ ধরে এসে থাকে। লৌকিক আচারই প্রাচীনতম আচার বলে এখনও হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রভাবের মধ্যেও তার শক্তি হ্রাস পায় নি। বিয়ের প্রথা অত্যন্ত রক্ষণশীল, সহজে বদ্‌লায় না; কারণ, বিয়ের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, যদি বিয়ের প্রথার লঙ্ঘন করা হয়, তবে সন্তান লাভে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তবে একথা সত্য, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ের লোকাচারের মধ্যে অনেক বিষয়েই ঐক্য নেই; কারণ, বিভিন্ন দিক থেকে বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক সমাজ প্রভাবিত হবার ফলে বিভিন্ন উপকরণ তার ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করেছে। কেবলমাত্র বৈদিক আচারের মধ্য দিয়েই যে অভিন্নতা রক্ষা পায়, তার মধ্য দিয়েই সামাজিক সংহতিও রক্ষা পেয়ে থাকে।

সূতিকাগৃহে শিশুর জন্ম থেকে আরম্ভ করে বার্ধক্যে তার মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ-জীবনে তার যে বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পায়, তাদের প্রত্যেকটির মধ্য দিয়েই তার বিশেষ আচার পালনের আবশ্যক হয়। সেই আচার শিশুর হয়ে যেমন অন্যে পালন করে, শিশু নিজেও তেমনই পালন করে। এই সকল আচার আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বলে মনে হতে পারে ; কিন্তু একদিন যখন তাদের উৎপত্তি হয়েছিল, তখন কোন ব্যাবহারিক প্রয়োজনেই তা হয়েছিল। মাত্র দু'একটির দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাক।

পল্লীসমাজে শিশু যখন সূতিকাগৃহে জন্মগ্রহণ করে, তার আগে থেকেই সেই গৃহের দ্বারে গোমুণ্ড, ছেঁড়া জুতো, লোহার কোন অস্ত্র, এ'সব ঝুলিয়ে রাখা হয়। নবজাত শিশুকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এই দৈব উপায় অবলম্বন কর্‌তে হয়। ক্রমে তা একটি অবশ্যপালনীয় প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেও শিশুর গলায় বকুলের বীচি, শূকরের দাঁত, বাঘের নখ, সোনা কিংবা রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে পরিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় কোমর-বন্ধনীর সঙ্গে তা বেঁধে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে যে জাতকর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাতে গোক্ষুরা সাপের খোলসের প্রয়োজন হয়। এই সমস্তই শিশুর অনিষ্ট নিবারক ঐন্দ্রজালিক গুণের আধার বলে বিবেচিত হয়। সভ্যতার কোন্ স্তর হতে যে এই ঐন্দ্রজালিক উপকরণগুলো গৃহীত হয়েছে, তা সহজেই বুঝ্‌তে পারা যায়। যে-শিশুর অগ্রজের মৃত্যু হয়েছে, সাধারণতঃ আশঙ্কা করা হয়ে থাকে যে, তার মাথার উপর মৃত্যুর দণ্ড ঝুলছে ; অতএব তাকে রক্ষা করবার জন্য বিবিধ ঐন্দ্রজালিক উপকরণের শরণ লওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ তার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, এই প্রকার শিশুর এক পায়ে একটি লোহার খাড়ু পরিয়ে দেওয়া হয়। এই লোহার খাড়ুকে বলা হয় 'লুয়া'। যে ছেলে এই খাড়ু ধারণ করে, তাকে ডাড়কো ছেলে বলা হয়। সাধারণের বিশ্বাস, এই খাড়ু দেখতে পেলে যম তাকে স্পর্শ করবে

না। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, এমন ছেলের নামকরণের মধ্যেও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হয়। সাধারণতঃ এমন ছেলের নামকরণ করা হয়, 'মরণ' অর্থাৎ সে মরেই আছে, এই বিবেচনা করে যম তাকে আর স্পর্শ করবে না; কিংবা নিমাই। নিমফল তেতো, অতএব তেতো বিবেচনা করে যম তা খেতে চাইবে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেবের শিশুকালের নাম ছিল নিমাই। এই সম্পর্কে তাঁর চরিতকার লিখেছেন,

ডাকিনী যোগিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই।

এখানে কোন বস্তুর পরিবর্তে নামের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক গুণের অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়েছে। ভারতীয় উপজাতির জীবনে এই প্রকার দৃষ্টান্ত খুব দুর্লভ নয়। কোন শিশুর অগ্রজের মৃত্যু হ'লে পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে তাদের অনিষ্টকারী শক্তির হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা আরও প্রবল ভাবে অনুভূত হয়। কোন কোন অঞ্চলে এই প্রকার শিশুকে আঠার মাস (অর্থাৎ দেড় বৎসর) বয়স পর্যন্ত সূতিকা-গৃহের বাইরেই আনা হয় না। এই সময় বিবিধ ঐন্দ্রজালিক উপকরণ দিয়ে সূতিকা গৃহের চারদিক উত্তমরূপে বেষ্টন করে রাখা হয়। যে পরিবারে এই নিয়ম এমন কঠোরভাবে পালন করবার উপায় নেই, সেখানে শিশুকে বাইরে আনা হলেও তার দেড় বৎসর বয়স পর্যন্ত তার গলায় একটি সুবৃহৎ সিসার মাদুলী পরিয়ে রাখা হয়। মাদুলীটির ওজন অনেক সময় আধ পোয়া পর্যন্ত হয়ে থাকে। রুগ্নতা বশতঃ শিশু এই মাদুলীর ভার বহনে অসমর্থ হলে, অনেক সময় তা শিশুর পরিবর্তে প্রসূতি নিজেও ধারণ করে। বাংলার পূর্বাঞ্চলে বিয়ের আসরে বরের আসনের নীচে গোমুণ্ড পুঁতে রাখা হতো, একটি কলা গাছের গায়ে পুরানো মাছ ধরবার এক প্রকার সরঞ্জাম থেকে বাঁশের শলা নিয়ে বিঁধিয়ে দেওয়া হতো। ঘৃতসিক্ত তুলো লাগিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হতো; বরের মাথার উপর একটি পুরানো জোয়াল টানিয়ে

রাখা হতো। বরকে বিয়ের সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে বরণ করে নেবার সময় এবং বিয়ের খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। আপাত দৃষ্টিতে অর্থহীন এই প্রকার খুঁটিনাটি সামাজিক প্রথা যে কত আছে, হিসেব করে বলা যাবে না। নাগরিক জীবনে এগুলো আজকাল বহুলাংশে শিথিল হয়ে আস্‌ছে।

৭

যাদুবিদ্যা

প্রত্যেক কার্যেরই যে একটি কারণ আছে, আদিম যুগের মানবও তা বুঝতে পার্‌ত। যেখানে কারণটি প্রত্যক্ষগোচর, সেখানে কার্যটির ব্যাখ্যা করা সহজ। যেমন, আগুনে হাত পড়লে দেখতে পাই, হাত পুড়ে যায়; গায়ে জল পড়্‌লে দেখতে পাই, গা ভিজে যায়। এই উভয় স্থলে কার্যকে কারণের সঙ্গে সহজেই যুক্ত করতে পারা যায়। অর্থাৎ এমন স্থলে বল্‌তে পারি যে, আগুনে হাত পড়েছিল বলে হাত পুড়েছে, গায়ে জল পড়েছে বলে গা ভিজেছে। এইভাবে প্রত্যেক কার্যই কোন না কোন কারণ থেকে উদ্ভূত; এই ধারণা সকলের মনেই সহজে বদ্ধমূল হয়েছিল। কারণটি যেখানে প্রত্যক্ষগোচর, সেখানে কার্য সম্বন্ধে কারও মনে কোন বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না; কিন্তু এমন কার্যও সংঘটিত হয়, যার কারণটি প্রত্যক্ষগোচর নয়। কোন কার্যের অ-প্রত্যক্ষগোচর কারণ আদি মানবের মনে অপার বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যক্ষভাবে কোথাও কোনও আগুন কিংবা তজ্জাতীয় কোন দাহ্য পদার্থ দেখা যাচ্ছে না, অথচ কোন কোন প্রস্রবণের জল উষ্ণ। অতএব উষ্ণ প্রস্রবণ একটি রহস্যময় বস্তু। চারদিককার শীতল প্রস্রবণের জলমধ্যে একটি প্রস্রবণের জল কেমন করে উষ্ণ হয়ে উঠল? নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তি কার্য্যকরী হয়েছে। কার্য ছাড়া ত কারণ হতে পারে না। আদিম জাতির মানবের মতে এই অদৃশ্য শক্তি একটি ঐন্দ্রজালিক

গুণ। যে কার্য মানবের সহজে বুদ্ধিগম্য নয়, বরং তার পক্ষে দুর্জ্ঞেয়, কিংবা যে কার্য যুক্তি-তর্কমূলক বিচার-পদ্ধতির অধীন নয়, তাই ঐন্দ্রজালিক শক্তি দিয়ে সাধিত হয় বলে বিশ্বাস করা হতো। ঐন্দ্রজালিক কারণসমূহ মানবিক বুদ্ধি, বিশ্বাস ও যুক্তিতর্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয়; যে এই সকল বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারও নিকট তা বোধগম্য নয়; এইজন্যই এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ লোকের রহস্যবোধেরও অন্ত ছিল না। এই অদৃশ্য কারণসমূহ সাধারণের প্রত্যক্ষগোচর ছিল না বলেই যে-যার মতে এই সকল বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে সর্বদাই চেষ্টা করেছে। আকাশে মেঘ সঞ্চিত হয়ে কি করে তা থেকে বৃষ্টিপাত হয়, আদিম যুগের মানব তা বুঝত না; অথচ এই বিষয়টি যে-যার মানসিক শিক্ষা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সকল ব্যাখ্যা অনুযায়ী অনেক সময় তারা কতকগুলো ক্রিয়া সম্পাদন করে কার্যকে সংঘটিত করবারও চেষ্টা করে থাকে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট কার্যের কতকগুলো অপ্রত্যক্ষ কারণ অনুমান করে তাদের অনুষ্ঠান করাকে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (magical practices) বলা হয়। বাংলাদেশে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, ছোট ছেলেপিলেদের খেলার পুতুল জলে চুবিয়ে স্নান করালে বৃষ্টি হয়। অতএব যদি অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টিপাতের জন্যে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, তবে এই কার্যকে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (magical practice) বলা হবে। অতএব দেখা যায়, প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক অপরিণত জ্ঞান থেকেই আদি সমাজের মধ্যে ইন্দ্রজাল বিদ্যার জন্ম হয়েছিল। জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর সমাজে তার প্রচলন ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে এলেও তথাকথিত আদিম সমাজে তার প্রতি বিশ্বাস অটুট আছে।

ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যার সঙ্গে দুইটি বিষয়ের সম্পর্ক নিয়ে পাশ্চাত্ত্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা বিজ্ঞান এবং ধর্ম। প্রত্যক্ষ কার্য-কারণ সূত্রের উপর বিজ্ঞানের ভিত্তি

প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত পক্ষে আদি মানবের সমাজ এই কার্য-কারণ সূত্রকে সন্ধান করতে গিয়া যেখানে বিফলকাম হয়েছে, সেখানেই ঐন্দ্রজালিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করেছে। তারপর ক্রম-বিবর্তনের পথে এই আদিম সমাজ সামনের দিকে অগ্রসর হতে হতে যতই নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পেয়েছে, তার মন হতে ততই ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসসমূহ দূর হয়ে তার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর যে সকল জাতি এই ক্রমোন্নতির পথ ধরে চলতে পারে নি, তারা তাদের প্রাচীন বিশ্বাস নিয়ে আদিম স্তরেই পড়ে আছে। যাদুবিদ্যা এবং বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য এক; তথ্য বিশ্লেষণ করে সত্য প্রতিষ্ঠা উভয়েরই লক্ষ্য, উভয়ই এক অভিন্ন প্রেরণা হ'তেই জাত। কিন্তু ইন্দ্রজালের পথ ভ্রান্ত, বিজ্ঞানের পথ সত্য। মানবিক বৃত্তি ও অন্যান্য ব্যাবহারিক বস্তু নিয়ে যেমন বিজ্ঞানের কাজ, ইন্দ্রজালেরও তাই; তাদের কারও কোনও অপ্রাকৃত লক্ষ্য নেই। বিজ্ঞান ও ইন্দ্রজালের মধ্যে এই প্রকার বহুবিধ ঐক্য দেখে কোন কোন ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ্ তাকে কৃত্রিম বিজ্ঞান (pseudo science) বলে উল্লেখ করেছেন।

একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ্ বলেছেন, ইন্দ্রজালের ব্যর্থতা থেকেই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। তবে ধর্মীয় এবং ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া উভয়ই পরস্পর পাশাপাশি একই সমাজের মধ্যে যুগপৎ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সঙ্গে ধর্মীয় আচরণের কতকগুলো বিষয়ে বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে, এই দুই বিষয়ের মধ্যে তার অতিরিক্ত উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক আর বিশেষ কিছুই নেই।

ভারতীয় বৈদিক সংহিতার অন্তর্ভুক্ত অথর্ববেদের মধ্যে যাদু-বিদ্যার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অথর্ব বেদের বহু উপাদান তৎকালীন ভারতীয় আর্যভাষীদের সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন; যাদুবিদ্যা সম্পর্কিত উপাদানগুলো প্রধানতঃ

আর্যেতর সমাজ থেকেই তাতে গিয়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ কথাও কেউ বল্‌তে পারবে না যে, প্রাচীন আর্যভাষী জাতির সঙ্গেও যাদুবিদ্যার মৌলিক কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রকৃত কথা এই যে, আর্য-ভাষাভাষিগণও যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করত এবং সম্ভবতঃ তাদের মধ্যেও এই সংস্কার বর্তমান ছিল বলেই অথর্ববেদের সঙ্কলনে তারা এই শ্রেণীর উপাদান নির্বিচারে গ্রহণ করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির লোকের মধ্যেই এই যাদুবিদ্যার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। অতএব আর্য-ভাষী জাতি এদেশে আসবার সময়ই এই বিষয়ক একটি সুপরিণত সংস্কার নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির অনুরূপ উপাদানের সঙ্গে সংমিশ্রণ লাভ করে অথর্ববেদ সংকলনের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। কিন্তু আবার এ' কথাও সত্য যে, ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যের ধারায় পরবর্তী কালে অথর্ব বেদের বিশেষ কোন প্রভাব অনুভব করা যায় না। অতএব মনে হয়, আর্যভাষী জাতি এদেশে আসা মাত্রই আর্যেতর জাতির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, পরবর্তী কালে তা কতকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তখন নানা সামাজিক বিধি-নিয়ম গড়ে উঠ্‌বার ফলে আর্যভাষী ও প্রাক্-আর্যভাষী জাতির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য প্রাক্-আর্য সামাজিক জীবনের যে সকল উপকরণ অথর্ববেদ সংহিতার মধ্যে স্থানলাভ করেছিল, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তা আর সেই পরিমাণে প্রবেশ করতে পারে নি।

অথর্ববেদের পরই ব্যাপকভাবে যাতে যাদুবিদ্যার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তা ভারতীয় তন্ত্রসাহিত্য। তন্ত্রশাস্ত্রকে 'আগম' বলা হয়, অর্থাৎ বাইরে থেকে যা এসেছে, তাই আগম। ভারতীয় তান্ত্রিক সাধনার মূল উৎস কোথায়, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই ; কিন্তু এ' কথা কিছুতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তান্ত্রিক সাধনা কেবলমাত্র যে বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী, তা নয়, তার সঙ্গে ভারতীয় কোন অনার্যভাষী জাতিরও ধর্মীয় আচারের

কোন যোগ নেই। তা একটি স্বতন্ত্র ধারা হতে এই দেশে এসেছে; কিন্তু এই ধারাটির উৎপত্তির সন্ধান পাওয়া সহজসাধ্য নয়। তবে এ' কথা সত্য যে, অথর্ববেদের ঐন্দ্রজালিক প্রকরণের সঙ্গেও তার কোনই যোগ নেই। তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে ভারতের প্রাচীনতর আর একটি সাধনার ধারা এসে কালক্রমে যুক্ত হয়েছিল, তা যোগ-সাধনা। যোগ-সাধনা ভারতের একটি অত্যন্ত প্রাচীন সাধন-মার্গ; তা আর্যভাষীদেরও পূর্ববর্তী। কালক্রমে দর্শনের বিভিন্ন ধারা যখন বিধিবদ্ধ হয়, তখন তাও পতঞ্জলি কর্তৃক যোগদর্শন নামে বিধিবদ্ধ হয়েছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও তার লৌকিক ধারাটিও ভারতের কোন কোন সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল। কালক্রমে তা কিয়ৎ পরিমাণে তান্ত্রিক সাধনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, যোগ-সাধনার সঙ্গে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার কোন যোগ নেই। তান্ত্রিক সাধনার মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গেও প্রথমতঃ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার কোন যোগ ছিল না, তার অধঃপতিত (decadent) যুগে সাধারণ লোকের মধ্যে যখন তার বিস্তার হল, তখন সাধারণ লোক কর্তৃক অনুষ্ঠিত ইন্দ্রজাল-বিদ্যার উপাদানগুলো বিষয় ও প্রক্রিয়ার কতকটা ঐক্যের জন্য এই তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে এসে প্রবেশ লাভ করল। সেইজন্য ভারতীয় তান্ত্রিক সাধনার মূল ধারাটির সঙ্গে ঐন্দ্রজালিক প্রবৃত্তির কোন যোগ দেখতে পাওয়া যায় না। তান্ত্রিক সাধনার লৌকিক স্তরের মধ্যেই ঐন্দ্রজালিক উপাদানগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়, ঊর্ধ্বতন স্তরে তার কোন প্রভাব অনুভূত হয় না। মধ্যযুগের বাংলার সমাজেও তন্ত্রের নামেই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সাধিত হোত।

বাংলার হিন্দু-সমাজের বিয়ের অনুষ্ঠানে যেসকল স্ত্রী-আচার পালন করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে অনেকগুলো আচারই যে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সাধনের উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়, তা সহজেই বুঝ্‌তে পারা যায়। তা ছাড়াও এদেশের অধিবাসীর দৈনন্দিন জীবনের বহু আচারের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে

আছে। দু'একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলোকে লোকাচারের মধ্যেও উল্লেখ করা যেত।

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশে যাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে জানতে পারা যায়। বর্তমানেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও তার প্রচলন অব্যাহত আছে।

অনাবৃষ্টির কালে বৃষ্টিপাতের জন্য ঐন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বন করবার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বহু অনগ্রসর জাতির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশেও এই রীতির ব্যাপক প্রচলন আছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে, যেখানে অতিবৃষ্টির ফলে অনেক সময় শস্য নষ্ট হয়, সেখানে অতিবৃষ্টি নিবারণের জন্য ঐন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কালবৈশাখীর সময় বৃষ্টির সঙ্গে শিলাপাতের ফলে পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলেই নানা অনর্থপাত হয়; এই শিলাবৃষ্টি নিবারণের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। সর্বসাধারণের পক্ষে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পাদন করবার জন্য এক শ্রেণীর লোক এখনও এই অঞ্চলে বাস করে, তাদের শিলারি—পূর্ববঙ্গের প্রচলিত ভাষায় 'হিরালি'—বলে। তাদের বেশভূষা, আচার-আচরণ ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের রীতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনুরূপ ব্যবসায়িদিগের প্রায় সমতুল্য। অতএব তাদের মধ্যে থেকে বাংলা দেশের প্রাগৈতিহাসিক একটি বিলুপ্ত প্রায় লোক-সংস্কারের পরিচয় উদ্ধার করা যায়।

কালবৈশাখী আরম্ভ হবার আগেই ফাল্গুন মাসের শেষ কিংবা চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে শিলারিগণ গৃহস্থের বাড়ীতে এসে দেখা দেয়। দীর্ঘ আলখাল্লা কিংবা তজ্জাতীয় কোন পোশাক পরে, একহাতে একটি দীর্ঘ লোহার শলাকা ও অন্য হাতে একটি বৃহৎ মহিষের শিঙ্গা নিয়ে উচ্চকণ্ঠে দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তারা এসে হাজির হয়। মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হলে শিঙায় ফুঁ দিয়ে

হাতের লোহার শলাকাটি দিয়ে গৃহস্থের প্রত্যেকটি ঘরের চাল স্পর্শ করে এবং এক মুষ্টি সরষে ঘরের অগ্নিকোণের দিকে নিক্ষেপ করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, তার এই মন্ত্রপূত লৌহ-শলাকার স্পর্শ দিয়ে ঝড়ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টি থেকে এবং সরিষামুষ্টি দিয়ে বজ্রপাত থেকে তাদের ঘর-দুয়ার রক্ষা পায়। তার বিনিময়ে গৃহস্থগণ তাকে যে-যার সাধ্যানুযায়ী পারিতোষিক দিয়ে থাকে। শিলারিগণ যখন এই ব্যবসা নিয়ে গ্রামে গ্রামে বের হয়, তখন এমন একটা ভাব ধারণ করে যে, তারা যেন সাধারণ লোকের সমাজ থেকে স্বতন্ত্র; কখনও বা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে আকাশের দিকে তাকায়, কখনও নিজের মনেই বিড় বিড় করে কি বকে, কখনও বা মুখ উঁচু করে শিঙায় ফুঁ দেয়। সাধারণ লোক মনে করে, এ'দের মধ্যে কোন 'দৈব' ভাবের উদয় হয়েছে। কেউ কেউ বা সেই বৎসর শিলাবৃষ্টি কি পরিমাণ হবে, তা তাদের জিজ্ঞাসা করে; তারা সর্বদাই তার অত্যন্ত অতিরঞ্জিত ও আতঙ্কপূর্ণ জবাব দিয়ে থাকে। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গেই তা থেকে কি ভাবে যে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে, তার বিধান দেয়। শিলাবৃষ্টির জন্য কতভাগ ফসল নষ্ট হবে, তারও একটা কল্পিত ভবিষ্যদ্বাণী তারা করে। তাদের প্রতি সাধারণ লোকের গভীর বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মকালে পূর্ববাংলার কোন কোন নিম্নভূমিতে এক প্রকার ধান জন্মায়, এই ধান সেই অঞ্চলের সমৃদ্ধতম শস্যসম্পদ। কিন্তু তার একটি প্রধান শত্রু শিলাবৃষ্টি। এই ধান যখন পেকে আসে, তখন যদি তার উপর শিলাবৃষ্টি হয়, তখন এক মুঠি ধানও কেউ ঘরে তুলতে পারবে না, সবই নষ্ট হবে। শিলাবৃষ্টির হাত থেকে এই ধান রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে শিলারিগণ নানা ঐন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বন করে। যখন আকাশে মেঘ জমে শিলাবৃষ্টি হবার উপক্রম হয়, তখন তারা মাঠের মাঝখানে গিয়ে কতকগুলো আচার পালন করে এবং উচ্চৈঃস্বরে মেঘের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার মন্ত্র বলতে থাকে। যদি দৈবাৎ শিলাপাত না হয়, তবে তাদেরই মন্ত্রে বশীভূত

হয়ে শিলা স্থানান্তরে গিয়ে বর্ষিত হয়েছে বলে তারা প্রচার করে। সাধারণ লোকও তাদের কথায় অবিশ্বাস করে না।

পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ জেলার পূর্বভাগে এই বিষয়ে একটি সুন্দর জনশ্রুতি আছে। তা নানা কারণেই এখানে উল্লেখযোগ্য। বহুকাল আগে যতীন্দ্র নামক একজন শিলারি সেই অঞ্চলে বাস করত; তার অলৌকিক শক্তির গুণে প্রতি বৎসর এই অঞ্চলের বৈশাখী ধান্য শিলাবৃষ্টির হাত হ'তে রক্ষা পেত। একবার সে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল যে শিলাবৃষ্টির মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। সমস্ত আকাশ তা'তে আবৃত হয়ে বর্ষণোন্মুখ হলো। যতীন্দ্র তার শিলাবৃষ্টি নিবারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ঐন্দ্রজালিক সরঞ্জামসমূহ নিয়ে মাঠের মধ্যে অগ্রসর হয়ে গেল। ততক্ষণে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়ে গেছে; কৃষকগণ হাহাকার করে উঠ্‌ল। যতীন্দ্র আকাশের দিকে মুখ তুলে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র বলে যেতে লাগল। দেখতে দেখ্‌তে চারিদিক আচ্ছন্ন করে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো, আর মেঘের মধ্যে সঞ্চিত সমগ্র শিলারাশি মন্ত্রবলে যতীন্দ্রের মাথার উপর এসে পড়্‌তে লাগল। বৃষ্টি থামলে দেখ্‌তে পাওয়া গেল, ধানের কোন ক্ষতি হয় নি, কিন্তু শিলাপাতের ফলে যতীন্দ্রের দেহের অস্থিরাশি ধুলোর মত গুঁড়ো হয়ে গিয়ে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। কৃষকেরা সেই অস্থির গুঁড়ো সংগ্রহ করে রাখল, প্রতি বৎসর ক্ষেত চাষ করে সেই ধূলিময় অস্থিসঞ্চয় হতে সামান্য মাত্র ক্ষেতের মধ্যে তারা পুতে রাখ্‌ত, এই থেকেই তাদের ধান শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পেত।

৮

লোক-বিশ্বাস

বহুবিবাহপ্রথা-পীড়িত বাংলার এই সমাজে এককালে ঔষধ দিয়ে স্বামীকে বশ করবার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইংরাজীতে তাকেই love charm বলা হয়। বহুবিবাহ-প্রথার বিলোপ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই রীতি বর্তমানে অপ্রচলিত হয়ে পড়লেও ছ'তিন শ'বছর আগেকার বাংলার দাম্পত্য-জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে এই রীতি প্রচলনের বিস্তৃত এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। ছ'একটি বিষয় এখানে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাক। তা থেকে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে এই বিষয়ক বিশ্বাস সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাবে।

ছুর্গাপূজার সময় ছুর্গাপ্রতিমার দক্ষিণপার্শ্বে যে কলাগাছ দিয়ে নবপত্রিকা গঠন করা হয়। সেই কলাগাছ ছুর্গা প্রতিমার সঙ্গে জলে বিসর্জন না দিয়ে গৃহাঙ্গিণায় রোপণ কর্‌তে হবে, প্রতিদিন তার সাম্‌নে ঘৃতের প্রদীপ জ্বেলে দিতে হবে, সেই কলাগাছ হতে পাতা কেটে সেই পাতায় নিরামিষ অন্ন আহার কর্‌তে হবে, তা হলে স্বামী স্ত্রীর আজ্ঞাকারী দাস হবে। শেষরাত্রে উলঙ্গ হয়ে শ্মশান হতে ক্ষীরা ও কবরের উপর হতে বিছুটির পাতা সংগ্রহ করে আনতে হবে, তারপর তা একত্র বেটে সপত্নীর কাপড়ের মধ্যে গোপনে ফেলে দিতে পারলে সপত্নী স্বামীর বিষনয়নে পড়বে। স্বামীকে নিজের বশীকরণের প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সপত্নীকেও স্বামীর বিষদৃষ্টিতে ফেলবার জন্য 'ওষুধ' করা হত। তাকে ইংরেজীতে বলা হয় hate charm ; উপরের প্রক্রিয়াটি শেষোক্ত উদ্দেশ্যেই।

চূণ, পান এবং খয়ের একত্র পুড়িয়ে ছাই করবে, তাতে কালো রঙের গরুর রেঁায়া ও ছুর্গাপ্রতিমার মুখ থেকে কিছু হরিতাল রঙ সংগ্রহ করে এনে মিশোবে। গ্রহণের সময় জেলের মাছ ধরবার বেড়াজাল থেকে কিছু সূতো সংগ্রহ করে আনবে। পূর্বোক্ত বস্তু

এই বেড়াজালের সূতোর সঙ্গে মিশিয়ে ফোঁটা করে ললাটে ধারণ করবে, তা হলেই দুর্গার মত স্বামী-সৌভাগ্যবতী হতে পারবে।

সাপের ফণা হতে আঁঠুলি সংগ্রহ করে এনে তাবিজে পূরে বাম হাতে ধারণ করবে। তার একটি নজিরও উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা যখন দ্রৌপদীর সতিনী হলেন, তখন দ্রৌপদী এই ঔষধ ধারণ করে স্বামী অর্জুনকে নিজের একান্ত বশে রেখেছিলেন। এই দুঃখে সুভদ্রা ভ্রাতা জগন্নাথের আশ্রয়ে পুরী চলে গেলেন। বলা বাহুল্য, মহাভারতের মধ্যে এমন কোন বৃত্তান্তের উল্লেখ নেই। অনেক সময় সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার জন্য এই প্রকার কৃত্রিম পৌরাণিক নজীরের উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

জোড়া অশথ পাতার উপর দুর্গাপ্রতিমার সম্মুখস্থ প্রদীপ থেকে কাজল করে তা চোখে লাগাবে, সেই কাজল-আঁকা চোখে স্বামীর দিকে তাকালে স্বামী নিতান্ত বশীভূত হবে। সাপের ওঝার চর্বিত সুপুরি ও বকুল গাছের পাতা ধারণ (কিংবা আহার) করলে স্বামী সহজে বশীভূত হয়। একপত্রবিশিষ্ট হাই আমলার গাছ সংগ্রহ করবে, শনি কিংবা মঙ্গলবারে রাত্রি জাগরণ করে কামরূপ-কামাখ্যার দিকে মুখ করে প্রভাতে তা বেটে নেবে, তারপর তা দিয়ে ললাটে তিলক পরলে স্বামী সহজেই বশীভূত হবে। বর্তমানেও এই সম্পর্কে যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তাতে দেখা যায় যে, কোন স্বামী-সৌভাগ্যবতী নারী এই ওষুধ বেটে দেবে, নিজে বাটলে চলবে না।

বিল্বপত্রে কিছু কালি নেবে, কালো রঙের একটি বেড়াল গৃহদ্বারে বলি দেবে, কিছু শুশুকের তৈল বা চর্বি সংগ্রহ করবে। এই সকল জিনিস গৃহে রেখে ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালবে, তা হলেই স্বামী-সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে।

শূকর ও শকুনির হাড়, কাঁচা হাঁড়িতে গৃহীত আইবুড়ো মেয়ের চুল ধোওয়া জল, সাপের চামড়া, নকুল ও হাতির মুণ্ড, নিষ্পত্র হরিদ্রা, শ্মশানের তিলফুল—এই সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করে ধারণ

করার ফলে সত্যভামা সপত্নী থাকা সত্ত্বেও স্বামী-সৌভাগ্যবতী হয়েছিলেন এবং তার প্রেমবশেই কৃষ্ণ তাকে পারিজাত উপহার দিয়েছিলেন।

ছিনে জোঁক, শ্বেত কাকের রক্ত, নিহত কালো রঙের কুকুরের পিত্ত, কচ্ছপের নখ, কুম্ভীরের দাঁত, বৃক্ষ-কোটর হতে ধরে আনা পেঁচক, গোধিকার অন্ত্র, বাদুড়ের পাখা, সজারুর কাঁটা—এই সকল জিনিস একত্র করে তিনটি পথের মিলন স্থলে এনে আগুনে ভস্মীভূত করে ললাটে তার ভস্মচিহ্ন ধারণ কর্‌লে স্বামী পত্নীর একান্ত বশীভূত হবে। শঙ্খের মুখ, টিকটিকি, ইঁদুরের মুণ্ড, দুম্বার (একজাতীয় ভেড়ার) শিঙ ও চাতকের ঠোঁট ইত্যাদি একত্র করে যে কামরূপের দিকে মুখ করে বেটে লয়, সে নিজের শয়ন-গৃহে অলক্ষ্যে স্বামীকে লাভ করে। গুলাল, শিরীষ, কুসুম, কুন্দ ও পদ্মের মৃণাল—এই পাঁচ প্রকার জিনিস সমানভাবে নিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে স্বামীর প্রতি পাঁচ বার তা নিক্ষেপ কর্‌বে। এই কার্য সাধন করে দ্রৌপদী পাঁচ পতিকে বশ করেছিলেন; তার অন্য কোন সতিনী, তা কর্‌তে পারে নি।

স্বামীর গাত্রমল যত্ন করে রেখে তার সঙ্গে বাঘের তৈল (চর্বি) মিশ্রিত করে মুখে মাখলেও স্বামী চিরদিন বশীভূত থাকে। সাধারণতঃ বিয়ের সময়ই কন্যার স্বামী-সৌভাগ্য কামনা করে কন্যার জননী বরের প্রতি এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করে থাকেন।

কন্যার জননী বার হাত লম্বা শাড়ী দুই ভাঁজ করে পরে নেন। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তিনি মোষের নাকের দড়িও এক টুকরো সংগ্রহ করেন। তার ঐন্দ্রজালিক গুণে স্ত্রী স্বামীকে নাকে-দড়ি-বাঁধা মোষের মত বশ করে লয়। বশীকরণের আর একটি উপকরণ সাপের দই।

উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বশীকরণের উদ্দেশ্য যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত উপকরণ হ'তে বহুলাংশে

স্বতন্ত্র। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্য থেকে তার কিছু নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করা যায়—

সুপারির দোকান থেকে মুখশুদ্ধ সুপারি কিনে আন। অন্যের অলক্ষিতে পানের বর থেকে পান কিনে নাও, এক কড়া মূল্যের চুন নিয়ে আস; মন্ত্র পড়ে তা দিয়ে পান সেজে দিলে এই পান খেয়ে স্বামী চিরদিন স্ত্রীর বশীভূত থাকবে।

একবার মাত্র প্রসব করেছে এমন গরুর দুধে হাই আমলকি পাতা এনে দাও। তাতে কন্যার হাত ধুয়ে সেই দুধ যদি কন্যার জননী পান করে, তা হলেই বর এবং কন্যা একপ্রাণ হবে। বেনের দোকান হতে সিঁদুর নিয়ে আস, তার সঙ্গে পাঁচটি কানাকড়ি চূর্ণ করে সাদা ছাগলের দুধের সঙ্গে তা বেটে নাও। তা দিয়ে ফোঁটা পরলে বর কোনদিন কন্যার দিকে মুখ তুলে চেয়ে কথা বলতে পার্‌বে না, তার এমনই বশ হবে। শালগ্রামের উপর যে তুলসীপাতা দেওয়া হয়, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণের পৈতা, চিতার ঝুল, ইঁদুর মাটি, কাঠঠুক্‌রী একত্র মিশ্রিত কর্‌লে বর কন্যাকে দেখে আত্মহারা হবে। চিলের ডানার পালক, ডিমের খোসা, চিতার উপর জাত তিল ও তুলসীগাছের পাতা, চিতার মাটি ইত্যাদি একটি কাঁচা হাঁড়িতে করে যে-কোন শনি কিংবা মঙ্গলবারে তা ঘরের চালের উপর তুলে রাখবে; তারপর একদিন নামিয়ে পাটার উল্‌টা পিঠে একটি মরিচের সঙ্গে বেটে উলঙ্গ হয়ে যদি তা আহার কর, তা হলে কন্যা যদি পরপুরুষেও আসক্ত হয়, তথাপিও স্বামী তাকে কিছু বল্‌বে না, এমনই বশীভূত হবে।

বিবাহে যে স্ত্রী-আচার পালন করা হয়ে থাকে, তার মধ্যেও কয়েকটি আচার বশীকরণের উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়। এখন পর্যন্তও বাংলার কোন কোন অংশে উপরোক্ত প্রাচীন ধারার অনুবর্তন করে স্বামীকে বশীভূত কর্‌বার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে; কিন্তু আগেই বলেছি, বহুবিবাহ-প্রথার লোপ ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তা প্রায় লুপ্ত হয়ে আসছে।

পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের ন্যায় এ'দেশেও নিষ্ঠীবনের (থু থু) ঐন্দ্রজালিক গুণ আছে বলে মনে করা হয়। বাঙ্গালীর ভদ্রগৃহস্থ ঘরের মেয়েরা চুল বাঁধতে গিয়ে চিরুনীতে আঁচড়াবার সময় যে সকল চুল ছিঁড়ে ফেলে, তা অমনি ফেলে না দিয়ে তার উপর মুখ থেকে থু থু দিয়ে দেয়, কেউ বা তা ঘরের চালেও গুঁজে রাখে। তাদের বিশ্বাস, যদি কেউ তাদের অনিষ্ট করতে চায়, তবে এই চুল দিয়ে বিশেষ এক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সাধন করলে সহজেই সেই অনিষ্ট সাধিত হতে পারে। সম্মার্জনীর সামনের দিকটা কারো গায়ে লাগলে সেই সামনের অংশের কিছুটা ভেঙে দিয়ে তাতে মুখ থেকে থু থু দিতে হয়; তা হলেই সম্মার্জনীর স্পর্শ-জনিত কোন অনিষ্ট হতে পারে না। সন্তান কোন স্থলে যাত্রা-করবার সময় মা কিংবা মাতৃস্থানীয়া কেউ তার গায়ে থু থু দিয়ে দেন, তা হলে সন্তানের যাত্রাপথ থেকে অনিষ্টকারী অপদেবতাগণ দূরে সরে থাকবে।

পাড়াগাঁয়ে নিরক্ষর লোকেদের মধ্যে এখনও কোন অসুখ-বিসুখ হলে প্রথমেই ওঝা (exorcist) ডেকে তার কারণ অনুসন্ধান করা হয়। কে কোন্ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সাধন করে কার অসুখের সৃষ্টি করে, তা ওঝা গণনা করে বলে দেবে। অনেক সময় সন্দেহের অতীত কোন নিকট সম্পর্কিত ব্যক্তির নামোল্লেখ করে ওঝা সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে পথ দিয়ে যাতায়াত করে, সেই পথে কেউ একটি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রপূত হাঁসের ডিম পুতে রেখে আসে। সেই পথ অতিক্রম করামাত্র অলক্ষ্যে রোগ এসে তাকে আক্রমণ করবে। অনেক সময় এই প্রকার আক্রমণে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। উড়িষ্যার শবর জাতির মধ্যেও অনুরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সেখানে মৃত্যুর পরদিন মৃতব্যক্তির আত্মা জিজ্ঞাসিত হয়ে এই ষড়যন্ত্রকারীর নাম 'কুরাণ-বই'র (শবর নারী পুরোহিত) মুখ দিয়ে প্রকাশ করে দেয়। অবশ্য এজন্য বিজ্ঞাপিত ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিকে কোন সামাজিক শাস্তি

দেবার ব্যবস্থা নেই—এই রকম প্রকাশ্য অভিযোগেও উক্ত ব্যক্তি যে কোন রকমের মর্মযন্ত্রণায় কাল কাটায়, তাও নয়। তা একটা মামুলী ব্যাপার বলে মনে করা হয়ে থাকে।

পশ্চিম বাংলায় দ্যাশী (সং দেববাসী?) নামে এক শ্রেণীর লোক আছে, তারা জাতিতে হিন্দু এবং বিশেষ কোন স্থানীয় লৌকিক দেবতার পূজারী। বর্তমানে বহু লৌকিক দেবতাই হিন্দুধর্মের প্রভাবে পৌরাণিক আভিজাত্য লাভ করবার ফলে তাদের পূজোয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োজিত হয়েছে। তথাপি এই দ্যাশীরাও দেবতার প্রতি তাদের বংশগত দাবি পরিত্যাগ করে নি। অনেক গ্রাম্যদেবতার মন্দিরেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং নিম্ন শ্রেণীর দ্যাশীর যুগপৎ প্রভুত্ব দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের আয় উভয়ে বণ্টন করে নেয়। এই দ্যাশীরা কোন কোন সময় অনাবৃষ্টির প্রতিকারের জন্য নানা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সাধন করে। শুধু তাই নয়, গ্রামে মহামারী, কিংবা গোমড়ক দেখা দিলে প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে তারা নানা ক্রিয়াকর্ম করে। আবার কখন কখন রোগে মাদুলী ও টোট্‌কা ওষুধ দেয়। তারাও প্রকৃতপক্ষে যাদুকর শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। তাদের একটি বিশেষ সামাজিক পদমর্যাদা আছে। সেই অনুযায়ী তারা সামাজিক প্রতিষ্ঠা (status) লাভ করে। তাদের বৃত্তি বংশানুক্রমিক। কিন্তু কোন কোন সময় বিশেষ কোন দেবতা কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হওয়ার দাবিতে নূতন কোন ব্যক্তিও এই পদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অনেক সময় এই বৃত্তিই তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হয়ে থাকে। নিত্য দেবপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে বলে তারা সাধারণ হতে একটু স্বতন্ত্র জীবন-প্রণালী অবলম্বন করে। কখনও তারা মাথায় জটা রাখে, হাতে ত্রিশূল নিয়ে চলাফেরা করে। রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করে, হাতে তামার তাগা, কিংবা হাতেপায়ে লোহার খাড়ু পরিধান করে। তারা অনেক সময় সাপঝাড়া, ভূতঝাড়া এ'সব কাজও করে। এই সব কারণে তাদের প্রতি সাধারণের একটু শ্রদ্ধাবোধ জন্মায়। পরের অনিষ্ট সাধনের

জন্য কোন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান তারা সাধারণতঃ করে না। তারা সমাজের হিতকারী বলেই সকলের বিশ্বাস। কোন স্থানীয় লৌকিক দেবতার অর্চনাই এই ছ্যাশীদের প্রধান বৃত্তি; দেবতার সঙ্গে এই সম্পর্ক থেকে সাধারণ লোক তাদেরে নানা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী বলে মনে করে; অতএব তাদেরে প্রত্যক্ষ ভাবে যাদুকর (magician) বলে গণ্য করা ভুল হবে।

৯

লোক-শিল্প

বাংলার লোক-শিল্প যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনই সমৃদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যেই তার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলা দেশ ধান চাষের দেশ, নদ-নদীর দেশ, পলি মাটি ও বাঁশ-খড়ের দেশ; সুতরাং বাঙ্গালীর শিল্প-পরিচয়ও তার মাছভাত, বাঁশখড়, পলিমাটি নিয়েই গড়ে উঠেছে। তার চিত্র এবং কারুশিল্পের মধ্যেও যে বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে, তা তাকে ভারতীয় অন্যান্য অঞ্চল থেকে একটি স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। বাংলা দেশে সাধারণ লোকের জন্য যে গৃহ নির্মিত হয়, তার মধ্যে একটি নম্রতা অথচ রুচির পরিচয় প্রকাশ পায়, কোন দিক থেকেই তার ঔদ্ধত্য এবং অর্থহীন জাঁক-জমকতার পরিচয় প্রকাশ পায় না। এমন কি, বাংলা দেশে যে মন্দির নির্মিত হয়, তার মধ্যেও ব্যক্তি কিংবা জাতির ঐশ্বর্যের অহমিকা দেবতার দেবত্বকে আচ্ছন্ন করে দেয় নি। বাংলার গৃহনির্মাণ পদ্ধতি যে একদিন বাংলার বাইরেও সম্মান লাভ করেছিল, বিশেষ এক শ্রেণীর বিলাস-গৃহ অর্থে বাংলা গৃহ বা ইংরাজি bungalow শব্দটি থেকেও তা বুঝতে পারা যায়। বাঙ্গালীর মন্দির বাঙ্গালীর সাধারণ গৃহের আদর্শেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তুলনায় তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মন্দিরগাত্রে পোড়া ইঁটের কারুকার্যের মধ্যে লোক-শিল্পের যে

নিদর্শন পাওয়া যায়, তা একদিক দিয়ে বাঙ্গালীর শিল্পবোধ, আর একদিক থেকে তার অধ্যাত্মবোধের বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ করেছে। বাংলার মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা দেখেছি, বাঙ্গালী তার দেব-দেবীকে নিজের ঘরের মানুষ করে নিয়েছে, তাকে নিজেদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র করে রেখে তার সঙ্গে কোন বিচ্ছেদ সৃষ্টি কর্‌তে যায় নি। তেমনই সে তার এই দেবদেবীর জন্য যে মন্দির নির্মাণ করেছে, তাও সে তার নিজের বাসগৃহের অনুরূপই সৃষ্টি করে। বাঙ্গালী নিজের আরাধ্য দেবদেবীকে যে মন্দিরের মধ্যে স্বতন্ত্র করে না রেখে নিজের ঘরের মধ্যে রেখেই উপাসনা করছে, এ'র মধ্য দিয়েও তা বুঝ্‌তে পারা যায়। সেইজন্য বাংলার অন্যান্য প্রদেশে হিন্দুর মন্দির নির্মাণ যেমন উচ্চতর স্থাপত্য শিল্পের অন্তর্গত, তেমনই বাঙ্গালীর মন্দির নির্মাণের মধ্যেও লোক-শিল্পের ধারাকে অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে করা যায়। বাংলার কবি জয়দেব যেমন তার 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যে সংস্কৃত কাব্য রচনার শাসন স্বীকার করেন নি, বাংলার শিল্পী তেমনই ভারতীয় মন্দির নির্মাণের সনাতন ধারা উপেক্ষা করেই বাঙ্গালী প্রথায় দেবমন্দির নির্মাণ করেছেন।

বাঙ্গালীর খাদ্য বিষয়েও একটু রুচি আছে, তাও বাঙ্গালীর বিশিষ্ট সংস্কৃতিরই একটি অঙ্গ। মাছ ভাতের বাঙ্গালী, দুধ-দধি-ননী-মাখন-ছানার বাঙ্গালী খাদ্যের মধ্য দিয়েও তার একটি শিল্প, রুচি এবং রসবোধ প্রকাশ করেছে। কিছুদিন আগেও বাঙ্গালী ছাড়া আর কেউ দুধে ছানা কাটাতো না, ছানার ব্যবহার এই জাতির মধ্যেই এদেশে সূত্রপাত হয়েছে, এখনও সমগ্র ভারতবর্ষে তার ব্যবহার বাঙ্গালী ছাড়া আর কোথাও নেই। কারণ, দুধে ছানা কাটান এখনও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল পাপ বলে মনে করে। কিন্তু বাঙ্গালী তার রসনার কাছে অলীক পাপ-বোধকে বহুদিন থেকেই বিসর্জন দিয়েছে। দুধের নানা ভাবে ব্যবহার করে নানা প্রকার শিল্পসঙ্গত ছাপের মধ্য দিয়ে তার পরিবেষণ বাঙ্গালীকে খাদ্যের জগতে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। বাঙ্গালী নারীর এই বিষয়ে

একটি বিশেষ গুণ ছিল, তা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে। ভাত বাঙ্গালীর খাদ্য, চালের গুঁড়োকেও সে বহুদিন যাবৎ নানা শিল্পকর্মে ব্যবহার করে আস্‌ছে। তার মধ্যে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী আল্‌পনা বাঙ্গালীর লৌকিক চিত্রশিল্পের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

বাঙ্গালীর প্রতিমা-নির্মাণ পদ্ধতির একটি বিশিষ্টতা আছে। ভারতের অন্যত্র যেখানে পাষাণে গঠিত প্রতিমা মন্দিরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবিচল হয়ে থাকে, পলিমাটির ভাঙ্গাগড়ার দেশে তার পরিবর্তে প্রতি বৎসর নতুন নতুন শিল্পী নতুন নতুন প্রতিমা মাটি দিয়ে নির্মাণ করে। পূজান্তে তা বিসর্জন দেওয়া হয়। একটি পাষাণপ্রতিমা শত শত বৎসর যাবৎ যখন সমাজের আদর্শ হয়ে যায়, তখন সমাজ-মানসে শিল্প-চেতনা সজাগ থাকবার কোন উপায় থাকে না; কিন্তু প্রতি বৎসর নতুন নতুন প্রতিমা গড়বার যখন আবশ্যক হয়, তখন সমাজের মধ্যে চিরকাল ধরেই শিল্প-চেতনা সক্রিয় হয়ে থাকৃতে বাধ্য হয়। সেইজন্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যখন প্রতিমা-নির্মাণের শিল্পক্রিয়া সমাজের মধ্য থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে, তখনও বাঙ্গালী শিল্পীর শিল্প-চেতনা সক্রিয় আছে— বাংলার নদনদীর পলিমাটির ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনকে কখনও শিথিল হয়ে পড়তে দেয় নি। সে জন্যই বাঙ্গালীর শিল্পিজীবনের মধ্য দিয়েও একটি ধারা সক্রিয়ভাবে ও অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বাংলার লৌকিক চিত্রশিল্প নাগরিক জীবনেও যে তার প্রতিষ্ঠা রক্ষা কর্‌তে সক্ষম হয়েছে, লোক-চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিই তার প্রমাণ।

বাংলার মেয়েদের হাতের তৈরী কাঁথা, শিকা, এ সবও বাংলার লোক-শিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শন। বাংলার মৃৎশিল্পও আজ শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার মধ্যে বাঁকুড়ার ঘোড়া বলে পরিচিত সুবৃহৎ পোড়া মাটির ঘোড়া আজ বিদেশেও সমাদর লাভ করেছে। তা ছাড়া পুরুলিয়ার ছো-নাচের মুখোস, কৃষ্ণনগরের

মাটির পুতুল, বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত গিয়েও জনপ্রিয়তা রক্ষা করে চলেছে।

১০

লোকোৎসব

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই বিভিন্ন উপলক্ষে যে বাৎসরিক জনসমাবেশ হয়, তাকে সাধারণ ভাবে মেলা বলা হয়। মেলাগুলো বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বাৎসরিক উৎসবের ক্ষেত্র। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র বাঙ্গালী জীবনের যে আনন্দানুষ্ঠানের দিকটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে, তাই নয়; বরং তার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের বিশিষ্ট রূপটি প্রকাশ পায়। এক-একটি নির্দিষ্ট পল্লীতে এক-একটি বিশেষ কারণে এক-একটি মেলার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল; তারপর থেকে তার ধারা অব্যাহত ভাবে চলেছে, তার উদ্ভবের মূল যে কি ছিল, তা সমাজ ক্রমে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেছে, ক্রমে নূতন নূতন ঐতিহাসিক বিষয় এসে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, ক্রমে তাও আবার জনশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কোন কোন মেলার উপর ক্রমে অভিজাত হিন্দু-ধর্মের প্রভাব এসে স্থাপিত হয়েছে, সেখানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মন্দিরে দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, দেবতাকে কেন্দ্র করে ক্রমে নানা জনশ্রুতি গড়ে উঠেছে। অনেক সময় তার লৌকিক পরিচয় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়ে তার উপর পৌরাণিক অধিকার নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছে, এই সকল ক্ষেত্র ক্রমে হিন্দুর তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

বাংলা দেশে একটি মাত্র সর্বভারতীয় হিন্দু তীর্থ স্থান আছে, তা' গঙ্গাসাগর; গঙ্গা যেখানে সাগরের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, তা আজ সর্বভারতীয় হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গঙ্গাসাগরের বাৎসরিক মেলা আজ সর্বভারতীয় মেলার রূপ ধারণ করেছে, ভারতবর্ষের সকল অঞ্চল থেকেই কেবল সাধু-সন্ন্যাসীই নয়, গৃহস্থগণও সেখানে এসে সমবেত হয়। এই মেলাও একদিন স্থানীয়

অধিবাসীরই একটি লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র ছিল ; হয়ত স্থানীয় মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে প্রবেশ করবার আগে এখানে সমুদ্রের নামে পূজো দিত, তারপর সমুদ্রগামী বণিকেরাও এখানেই সমুদ্রের পুজো করে তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াত। এই ভাবে তা গড়ে উঠ্‌তে লাগল। তারপর সংস্কৃত পুরাণ রচিত হলো, পুরাণে তার মাহাত্ম্য কীর্তিত হলো, তারই পরিকল্পনায় এখানে কপিল মুনির আশ্রম গড়ে উঠল, সগর রাজের ঘোড়া ইন্দ্র এখানে এনে বেঁধে রেখে গেলেন, তারপর কপিলের ক্রোধাগ্নিতে সগর সন্তানগণ ভস্মীভূত হলেন, ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে এসে তাদের উদ্ধার করলেন। পুরাণে যখন এ'সব কাহিনী রচিত হলো, তখন তার উপর ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। একটি বিশেষ দিনে দলে দলে লোক সেখানে এসে সমবেত হতে লাগল। যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চার পাঁচ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তির দিনে এখানে স্নান করে। হিন্দুধর্মের প্রেরণা তার সঙ্গে সংযুক্ত হবার ফলে গঙ্গাসাগর মেলাই আজ বাংলা দেশের বৃহত্তম মেলা। হিন্দুধর্মের প্রভাবের জন্যই আজ তার লৌকিক পরিচয়টি প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কবে কি ভাবে কি উপলক্ষে যে তার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা বুঝবার উপায় নেই।

বাংলা দেশের আর কোন মেলার উপর গঙ্গাসাগরের মেলার মত হিন্দুধর্মের এত ব্যাপক প্রভাব অনুভব করা যায় না ; আর সর্বত্রই এই ক্ষেত্রে বাংলার লৌকিক জীবনের রূপ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। এই শ্রেণীর মেলাগুলোকে সাধারণতঃ দুটো প্রধান বিভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমতঃ পৌষ মেলা অর্থাৎ post-harvest মেলা এবং ধর্মীয় মেলা। পৌষ মেলা কৃষকদের কৃষির ফসল ঘরে তুলবার পর অনুষ্ঠিত হয় ; সাধারণতঃ তার সময় পৌষ কিংবা মাঘ মাস। কিন্তু ধর্মীয় মেলার বিশেষ কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে গাজনের মেলা, আষাঢ়ে রথের মেলা, শ্রাবণে বেহুলার

মেলা, ভাদ্রে মনসার মেলা, আশ্বিনে দুর্গা মেলা, কার্তিকে রাসের মেলা, এই রকম বারমাস জুড়েই বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলার অনুষ্ঠান হয়। ধর্মীয় মেলা বলে তাদের নাম দেওয়া হলো বলে, তা যে বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা মনে করবার কোন কারণ নেই। কারণ, যে ধর্মসম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই এই শ্রেণীর মেলার উদ্ভব হোক্ না কেন, তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী সমান ভাবেই যোগদান করে থাকে, তাদের মধ্য দিয়েই চিরকাল বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সংহতি গড়ে উঠবার সহয়তা করেছে। কোন মুসলমান পীরের মৃত্যু উপলক্ষে বাংলার পল্লীতে কোন মেলার যদি প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে, ক্রমে তা হিন্দু-মুসলমান নিরপেক্ষ বাঙ্গালীর জাতীয় অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়, তেমনই হিন্দুর কোন লৌকিক দেব-দেবীর পূজা কেন্দ্র করে যদি কোন মেলা গড়ে উঠে, তবে তাও সর্বশ্রেণীর বাঙ্গালীরই মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

এই সকল মেলায় একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে জাতির সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নানা বিষয়েরই রূপ একত্র দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে তা' শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, আরেক দিকে আনন্দমূলক অনুষ্ঠান। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির দিক থেকে এই মেলাগুলোর যে একটি বিশেষ স্থান ছিল, রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে বিশেষ সচেতন থেকেই তার শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলার প্রবর্তন করেছিলেন।

এই সব এক-একটি মেলার উৎপত্তির ইতিহাস যেমন স্বতন্ত্র, তাদের প্রত্যেকের চরিত্রও তেমনই স্বতন্ত্র। দুইটি পার্শ্ববর্তী গ্রামে যদি একই বৎসরে দুইটি মেলা হয়, তবে তাদের মধ্যেও পার্থক্য অনুভব করা যায়। তাদের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রেরও সার্থক অনুসরণ সম্ভব হতে পারে। প্রত্যেক মেলার স্বতন্ত্র বিবরণ, স্বতন্ত্র ধারা এবং স্বতন্ত্র পরিচয়। তাদের তালিকা এবং বিবরণী সংগ্রহের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর বহুমুখী সামাজিক জীবনের বিচিত্র পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে।

বাংলার সর্পশ্রুতি

বাংলার লোক-শ্রুতি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে বলবার পর, তার একটি বিশেষ দিক নিয়ে আজ কিছু বিস্তৃত করে বল্‌তে চাই। যে বিষয়টি নিয়ে আজ বল্‌ব বলে মনে করেছি, আশা করি তা আপনাদের মনে একটু কৌতূহল সৃষ্টি কর্‌তে পারবে।

আপনাদের সুন্দর শহর লেলিনগ্রাডে নেভা নদীর তীরে সাম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ প্রতিষ্ঠিত অশ্বারোহী পিটার দি গ্রেটের যে বিরাট ব্রঞ্জ নির্মিত প্রতিমূর্তিটি আছে, তার অশ্বের পদতলে একটি বিরাটকায় সর্পকে দলিত হতে দেখ্‌তে পেয়েছি। সর্পকে এখানে যে শত্রু বলে মনে করা হয়েছে এবং মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্‌ পিটার দি গ্রেট যে তাকে অশ্বপদে দলিত করে শত্রুবিমর্দনকারী রূপে কল্পিত হয়েছেন, তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। বাংলা দেশে সর্পকে মনে মনে শত্রু বলে মনে করা হলেও প্রকাশ্যে এই ভাবে তাকে পদতলে বিমর্দিত করবার দুঃসাহস কেউ রাখে না, বরং তাকে নানাভাবে পূজো করে তার আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় সন্ধান করে থাকে। যেখানে পরাক্রম দিয়ে প্রতিরোধ করবার শক্তির অভাব হয়, সেখানেই দৈব-নির্ভরতা দেখা দেয়। ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সর্পের মত ভয়ঙ্কর শত্রুকে পরাক্রম দিয়ে প্রতিরোধ করবার উপায় নেই ; সেইজন্য তাকে পূজো দিয়েই প্রশমিত করতে হয়েছে। আজ বাংলা দেশের এই সর্পপূজো বিষয়েই আপনাদের কাছে একটু বিস্তৃত করে বল্‌ব।

বর্তমানে উত্তর ও মধ্য ভারতে প্রচলিত নাগপূজো কিংবা দক্ষিণ ভারতের সাধারণ জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত সর্পপূজোর সঙ্গে বাংলায় প্রচলিত নাগপূজোর পার্থক্য আছে। উদ্দেশ্য সর্বত্র এক এবং অভিন্ন হলেও পূজোর প্রণালী বিভিন্ন ; সেই জন্য মনে হয়,

কালক্রমে এদের উপর বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রভাব কার্যকর হয়েছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত রীতিটির উপর বহিঃ-প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প হয়েছে বলে, তার মধ্যে ভারতীয় সর্পপূজোর প্রাচীনতম রূপটির সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর এবং মধ্যভারতে নাগরাজ (নাগমাতা নয়) বাসুকি তাঁর সরীসৃপ মূর্তি (Zoomorphic form)-তেই পূজিত হয়ে থাকেন, দক্ষিণ ভারতে জীবন্ত সর্প (live snake)-ই পূজার লক্ষ্য এবং বাংলাদেশে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবী নারীর আকৃতি (anthropomorphic form)-তে পূজিত হন—এই দেবী মনসা নামে পরিচিত। মনসা ব্যতীতও তাঁর আরও ক'টি নাম আছে। যেমন জাঙ্গুলী, বিষহরী ও পদ্মাবতী ; তাদের মধ্যে জাঙ্গুলী নামটি বর্তমানে অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

একথা সত্য যে, বাংলা দেশে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবী পরিকল্পিত হলেও তার সরীসৃপরূপ (Zoomorphic form)-ও এদেশে অপরিচিত নয়। কারণ, দেখতে পাওয়া যায়, মনসাপূজোয় দেবী মূর্তির যে রকম ব্যবহার আছে, নাগমূর্তিরও তেমনই ব্যবহার আছে। নাগমূর্তিগুলোকে নাগঘট বা মনসার ঘট বলা হয়—এগুলো মাটি দিয়ে তৈরী। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রণালীতে নির্মিত হলেও এরা মূলতঃ অভিন্ন প্রেরণা থেকে জাত। তাদের একটু বিবরণ দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাংলার পশ্চিম সীমা বিশেষতঃ বীরভূম জেলায় যে নাগঘট পূজিত হয়, তা বাংলায় ব্যবহৃত নাগঘট গুলোর প্রাচীনতম রূপ বলে মনে হয়। তা'তে এক-একটি বড় মাটির হাঁড়ির গায়ে কতকগুলো সাপের ফণা গড়ে দেওয়া হয়—অনেক সময় ফণাগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়—তাদের উপর ক্রমাগত সিন্দূর লিপ্ত হবার ফলে এদেরে বাইরে থেকে চিন্‌বার কোন উপায় থাকে না। এই রকম একটি, তিনটি, পাঁচটি কিংবা সাতটি ঘট একসঙ্গে পূজিত হয়। কোন কোন আধুনিক ঘটে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি হংসবাহনা নারীমূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘটগুলোর উৎপত্তির ইতিহাস বড়ই বিচিত্র।

গ্রাম্য কুম্ভকারেরাই এগুলো তৈরী করে। কিন্তু লোকের বিশ্বাস, কোন কুম্ভকার ইচ্ছে করলেই তা গড়তে পারে না—এজন্য দেবীর আদেশ চাই। যদি কোন কুম্ভকারের হাত দিয়ে দেবী নিজের সর্পরূপ প্রকাশ করতে চান, তবে সেই কুম্ভকার তার নিয়মিত হাঁড়ি তৈরীর সময়ই একটি হাঁড়ির উপর আপনা থেকেই একটি সর্পফণা গড়ে তুলবে। তা থেকেই সে বুঝতে পারবে যে, তার উপর দেবীর ঘট নির্মাণের আদেশ হয়েছে। এই আদেশ শিরোধার্য করে কুম্ভকার এই প্রকার নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘট নির্মাণ করে নদী কিংবা পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখবে। এইবার পূজারী বা দেয়াসীর উপর দেবীর স্বপ্নাদেশ হবে—স্বপ্নাদেশ মত কোন বাগ্দী, কেওট, মাল কিংবা অন্য কোন নিম্ন জাতির লোক নিমজ্জিত ঘটগুলোকে আনুষ্ঠানিক ভাবে তুলে এনে তার গৃহে প্রতিষ্ঠিত করবে—সেই অবধি সে পুরুষানুক্রমিক সেই ঘটগুলোকে পূজো করতে থাকবে এবং যে কুম্ভকারের হাত দিয়ে ঘটগুলো তৈরী হয়েছিল সেও সমাজে মনসার একজন পরম অনুগৃহীত বলে গণ্য হবে—সে তার জাত ব্যবসায় অর্থাৎ কুম্ভকারের ব্যবসায় পরিত্যাগ করে অন্য ব্যবসায় গ্রহণ করবে। মনসা-পূজো এই অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর লোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে যে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তা এই বৃত্তান্ত থেকেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্যেই যে সকল স্থানে হিন্দুধর্মের প্রভাব একটু বেশী প্রবল হয়েছে, সেখানে নাগঘটের সঙ্গে সঙ্গে মনসার নারীমূর্তি গড়ে তার পূজো করবার রীতিও প্রচলিত থাক্‌তে দেখা যায়। আজও বর্ধমান জেলার বাগ্‌দী জাতির মধ্যে মূর্তি নির্মাণ প্রথা প্রচলিত আছে।

মালদহ থেকে আরম্ভ করে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে মনসা পূজো উপলক্ষে নাগমূর্তিই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য নেই। একটি নাগমূর্তিই অধিকাংশ স্থানে পূজিত হয়; জলপাইগুড়ির কোন কোন স্থানে মনসা ও

তার সঙ্গে তার অন্যান্য সহচর ও সহচরীদের মূর্তি নির্মাণ করে পূজোর প্রথাও প্রচলিত আছে।

পূর্ববঙ্গে নাগঘট-নির্মাণের বৈচিত্র্য সর্বাধিক দেখতে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ জিলা থেকে আরম্ভ করে বাখরগঞ্জ জিলা পর্যন্ত এই অঞ্চলে বিবিধ আকৃতির নাগঘট নির্মিত হয়—তাদের মধ্যে কোন-কোনটির ভিতর দিয়ে বাংলার লোকশিল্পের কয়েকটি বিশিষ্ট নিদর্শনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়।

ময়মনসিংহ জিলার পূর্বভাগে প্রাধানতঃ দুই শ্রেণীর নাগঘট ব্যবহৃত হয়—একশ্রেণীর নাম কৈতরী ঘট এবং অপর শ্রেণীর নাম অষ্ট নাগের ঘট। নলাকৃতি যে একটি মৃদ্ ঘটের দুপাশে দুটি নাগ—একটি নাগ ও আর একটি নাগিনী—ফণা বিস্তার করে থাকে, তাকে কৈতরী ঘট বলে। এই অঞ্চলে তার ব্যবহার খুব ব্যাপক। যে ঘটের এক-এক পাশে চারটি করে সর্পফণা থাকে, তাকে অষ্ট নাগের ঘট বলে, এই ঘটের উপরের অংশে মনসা দেবীর মুখটি গড়ে দেওয়া হয়। তা চিত্রিত হয়ে থাকে এবং তার পরিকল্পনা উন্নত সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়। ঘটের সঙ্গে মনসার মূর্তিও এই অঞ্চলে পূজিত হয়, কিন্তু ঘটের ব্যবহার প্রাচীনতর এবং মূর্তির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ঢাকা-ফরিদপুর জিলার বিক্রমপুর অঞ্চলের নাগঘটই সর্বাপেক্ষা বিচিত্র—এই ঘট বিশিষ্ট সংখ্যক সর্পফণাযুক্ত হয় এবং সেই অনুসারে তাদের পঞ্চনাগ, অষ্টনাগ, নবনাগ ও বিয়াল্লিশ নাগের ঘট বলা হয়। এই অঞ্চলের মনসার মূর্তি পূজোর প্রচলন নেই ; নাগপঞ্চমী ও শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর হিন্দুর গৃহেই এই নাগঘট পূজিত হয়। এই বিষয়ে যে পরিবারের মধ্যে যে প্রথা আগে থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে, সেই অনুসারে সেই পরিবারে পঞ্চ, অষ্ট, নব কিংবা বিয়াল্লিশ নাগের ঘট পূজিত হয়। বিয়াল্লিশ নাগের ঘটের পরিকল্পনা বাংলা দেশের আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। অষ্ট নাগের ঘটের পরিকল্পনা মহাভারত বা হিন্দু পৌরাণিক প্রভাবজাত হলেও, অন্যান্য সংখ্যক

ঘটের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ লৌকিক প্রভাবজাত। ফরিদপুর জিলার ঘটগুলোর আরও একটি বৈচিত্র্য আছে—তা'তে একটি ঘটের গা থেকে চারটি সর্পফণা (কোন কোন সময় তিনটিও হতে পারে) চারদিক থেকে উপরের দিকে উঠে গিয়ে ঘটের মুখটি আবৃত করে রাখে।

বাখরগঞ্জ জিলা ও খুলনা জিলার বাগেরহাট মহকুমার নাগঘট একটু অন্য প্রকৃতির হয়। তা একটি মৃদ্‌ভাণ্ডের মত, তবে তার মধ্যভাগটি নিম্ন ও উপরিভাগ থেকে সামান্য সরু এবং তার গায়ে সর্পফণা নির্মাণ করবার পরিবর্তে তার উপর বিচিত্র রঙে মনসার মূর্তি অঙ্কন করা হয়। এই অঞ্চলে রয়ানী নামক বহু ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠানে মনসা ও অন্যান্যের বিরাট মূর্তি নির্মাণ করবার রীতি প্রচলিত আছে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাধারণতঃ মনসার মূর্তি নির্মাণ করে পূজো করবার রীতি প্রচলিত নেই; এক হাত লম্বা এক নলাকৃতি ঘট সেখানে পূজিত হয়; তার গায়ে কোন সর্পফণা থাকে না, পূজোর শেষে এই ঘট অন্যান্য হাঁড়িকুড়ির মতই ব্যবহার করা হয়। তবে কারও মানসিক থাকলে মনসার মূর্তি নির্মাণ করে অনাড়ম্বরের সঙ্গে পূজো করা হয়। চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি ভাগরথী তীরবর্তী জিলাসমূহে নাগঘট পূজোর রীতি প্রচলিত নেই, মনসার মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করবার রীতিও ব্যাপক নয়, এসবের *পরিবর্তে সিজ-মনসা গাছে সর্পপূজোর প্রথাই অধিকতর প্রচলিত।* তার কথা নিম্নে উল্লেখ করছি।

নাগঘট পূজার উদ্দেশ্য কি? এই বিষয়ে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এই সব ঘট ধন বা শস্য-ভাণ্ডারের প্রতীক্। দুটি কারণে সর্পকে ধনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়—প্রথমতঃ সর্পের মাথায় 'সাত রাজার ধন মাণিক্য' থাকে বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ সর্প এবং গুপ্তধন উভয়ই মাটির নীচে থাকে; সেইজন্য সর্পকেই গুপ্তধনের এবং তা থেকেই ধনের রক্ষক বলে মনে করা

হয়। গৃহস্থের নিকট শস্যই ধন; সেইজন্য তারা সর্পকে শস্য ভাণ্ডারের রক্ষক বলে মনে করে। ঘটগুলো ভাণ্ডারের প্রতীক্ এবং সেই ঘটের সঙ্গে সর্পের ফণা যুক্ত করে সর্পকেই সেই ভাণ্ডারের রক্ষক বলে কল্পনা করা হয়। সেইজন্য নাগঘটের পূজো এদেশের সমাজে এত ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল। তা নারীমূর্তিতে মনসা পূজা প্রথা প্রচলিত হবার পূর্ববর্তী এবং প্রায় দাক্ষিণাত্যের অনুযায়ী জীবন্ত সর্পের পূজার সমধর্মী; কারণ, ঘট বা ভাণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত করাতে সর্প তাতে অধিকতর প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব বলে মনে হয়।

স্বতন্ত্র কোন একটি জাতির সংস্কৃতি থেকে সর্প পূজার আর একটি স্বাধীন ধারা বাংলার সর্পপূজোর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে—তা মনসা সিজ (Euphorlia neriifolia) পূজো। ভাগীরথীর দুই তীর জুড়ে তার ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া বাংলা-দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও তার প্রচলন আছে। বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক; কারণ, উভয়ই উর্বরতাবাদের (fertility) প্রতীক্। দাক্ষিণাত্যে অশ্বত্থবৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়; সেইজন্য অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে মৃৎ কিংবা প্রস্তরনিমিত নাগমূর্তি উপহার দেওয়া হয়—অপুত্রক নারীগণ সন্তান কামনা করে অশ্বত্থতলে নাগমূর্তি উপহার দিয়ে কিংবা পূজো করে ১০৮ বার সেই বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করে। তা'তে বৃক্ষ ও সর্পের সঙ্গে উর্বরতাবাদ বা fertility cult-এর সম্পর্কটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে।

মনে হয়, জীবিত সর্পের পূজারী কোন জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে কালক্রমে বৃক্ষমধ্যে সর্পের পূজারী কোন জাতির সংস্কৃতি একত্র মিশে গিয়েছিল। সেইজন্য এক সময়ে বৃক্ষমধ্যে সর্পপূজোর প্রচলন ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল। জে. ফার্গুসনের *Tree and Serpent Worship* (1868) নামক বিরাট গ্রন্থে এই বিষয়টি নানা দিক দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে

-বৃক্ষমধ্যে সর্পপূজক কোন জাতির প্রভাববশতঃ এই দেশেও এই রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল, কালক্রমে তা এ'দেশে প্রচলিত সর্পপূজোর অন্যতম পদ্ধতি জীবিত সর্পপূজোর সঙ্গে একত্র মিশে গিয়েছিল। তার ফলেই বাংলাদেশে বিশেষ এক বৃক্ষের মধ্যে সর্পপূজোর রীতি প্রচলিত হয়। এই বৃক্ষের নাম মনসা সিজ। সিজ শ্রেণীর বৃক্ষ চারি প্রকারের হয়ে থাকে; যেমন, সিজ (*Euphorbia nivulia*) মনসা-সিজ (*Euphorbia neriifolia*), তিকাটা-সিজ (*Euphorbia antiquorum*), লঙ্কা-সিজ (*Euphorbia tirucalli*)।

মনসা-সিজ বৃক্ষ হতে ক্ষীরজাতীয় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, তার সর্পবিষ নিবারণ করবার শক্তি ছিল বলে মনে করা হোত; সেইজন্য তাতেই সর্পের পূজো করা হোত। মনসা-সিজ পূজোর এই ধারাটি প্রত্যক্ষ সর্পের পূজোর ধারার সঙ্গে এসে মিশে গিয়েছে, তার ফলেই মনসা-সিজ বৃক্ষের নীচে ঘট বসিয়ে কিংবা মৃত্তিকা-নির্মিত সর্পফণা স্থাপন করে পূজো করবার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ জাতির কাছ থেকে বাঙ্গালী মনসা-সিজ বৃক্ষে সর্পপূজা করবার রীতিটি গ্রহণ করল? বলাই বাহুল্য যে, এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারা যাবে না, তবে একটি অনুমান করা যায়। আসামের বোড়ো নামক ইন্দো-মোঙ্গলীয় জাতির এক শাখার মধ্যে সিজ বৃক্ষের পূজোর প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি, তার মধ্যে মনসা-সিজ বৃক্ষ প্রস্তরে খোদিত করেও পূজো করবার রীতি প্রচলিত ছিল। এই প্রকার প্রস্তরমূর্তি আসামের বোড়ো অধ্যুষিত অঞ্চল হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। মনসা-সিজ পূজোর প্রচলন এই জাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক। তারা সিজ বৃক্ষেই গৃহদেবতা বাথউর পূজো করে। বোড়ো জাতির অন্যতম শাখা গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারো জাতির মধ্যেও মনসা-সিজ বৃক্ষের ব্যবহার আছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গ এক কালে বোড়ো জাতির অধিকারভুক্ত ছিল এবং বাংলার এই সকল অঞ্চলের সাধারণ জনসমষ্টি

প্রধানতঃ বোড়ো জাতিরই মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত। কালক্রমে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও তার সাংস্কৃতিক দান বিস্তার লাভ করেছিল। অতএব অনুমান করা যেতে পারে যে, বোড়ো জাতি হতেই মনসা-সিজের পূজো বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল; কারণ, বাংলাদেশের পশ্চিমে বিহার কিংবা দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা প্রভৃতি কোন অঞ্চলেই মনসা-সিজ বৃক্ষ কিংবা কোন শ্রেণীর সিজ বৃক্ষেরই পূজোর প্রচলন নেই। মনসা-সিজ বৃক্ষ হতে দুগ্ধজাতীয় যে পদার্থ নির্গত হয়, তার বিষ-প্রতিষেধক গুণ হতেই তার প্রতি আদিম সমাজে বিস্ময়বোধের উৎপত্তি হয়েছিল, তা হতেই সর্পভয়-নিবারণের জন্য তার পূজো প্রচলিত হয়ে থাকবে। কারণ, দেখতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যেও পালা (*Alstonia Scholaris*) বলে পরিচিত এক শ্রেণীর অনুরূপ ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষেই সর্প ও অন্যান্য গ্রাম্য দেবদেবীর পূজো হয়। কিংবা এমনও হতে পারে যে, দুগ্ধ সর্পের প্রিয় খাদ্য বলে দুগ্ধস্রাবী বৃক্ষকেই সর্বত্র সর্পের আবাস বলে মনে করা হোত। সেই সূত্রেই বাংলাদেশে মনসা-সিজ এবং দাক্ষিণাত্যে পালা বৃক্ষে সর্পপূজো কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় মনসাদেবীর যে সকল প্রস্তর এবং ধাতু নির্মিত মূর্তি ক্ষোদিত ও নির্মিত হয়েছিল, তাদেরও কোন-কোনটির মধ্যে দেবীমূর্তির পার্শ্বে মনসা-সিজ বৃক্ষের শাখা উৎকীর্ণ দেখতে পাওয়া যায়। তা থেকে বুঝতে পারা যায়, মনসা-সিজ বৃক্ষের পূজোর প্রথা যখন এ'দেশের সমাজে অত্যন্ত প্রবল ছিল, তখনই মূর্তি নির্মাণ করে মনসা-পূজোর প্রচলন এ'দেশে প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ এখানে একটি আদিম সংস্কারের উপর অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলার সর্পপূজোর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তার সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মনসার পরিকল্পনা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, উত্তর ভারতে পৌরাণিক প্রভাববশতঃ নাগরাজ বাসুকির পূজোই প্রচলিত, দক্ষিণ-ভারতের সাধারণ জনসমাজের মধ্যে বহিঃপ্রভাব কার্যকর ছিল না

বলে সর্পের সরীসৃপ রূপ (Zoomorphic from)-ই পূজিত হয় ; কিন্তু বাংলাদেশে এই উদ্দেশ্যে নাগঘট ও সিজবৃক্ষ-পূজোর প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সর্প-দেবতার এক স্বতন্ত্র পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছিল— তা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবী, তিনি মনসা নামে পরিচিত।

পিতৃতান্ত্রিক (patriarchal) সমাজে স্ত্রী-দেবতার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; সেইজন্য সহজেই অনুমান করা যায় যে, মনসার পরিকল্পনাও কোন মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। উত্তর ভারতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাববশতঃই সর্প সেখানে পুং-দেবতা নাগরাজ বাসুকি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাববশতঃই মহীশূর ও কর্ণাটে সর্পদেবতা স্ত্রী-রূপিণী মুদামা ও মনে মঞ্চাম্মা, অন্ধ্রদেশে নাগম্মা বা বালনাগম্মা, উড়িষ্যায় বৈরাট পাট-ঠাকুরাণী ও খিচিঙ্গেশ্বরী, আসামের খাসিয়া অঞ্চলে থেল্ন। আর্য ভাষাভাষী জাতির প্রভাববশতঃ বাংলার উচ্চতর সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী হলেও, এ'দেশের সাধারণ সমাজ মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তির উপরই স্থাপিত ; সেইজন্য তার প্রধানতম দেবতা দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতা সকলই স্ত্রী-জাতীয়া। এই সংস্কার অনুসরণ করেই বাংলায় সর্পদেবতারও উৎপত্তি হয়েছে ; সেইজন্য তিনি পুরুষ না হয়ে স্ত্রী।

বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তস্থিত খাসি ও জয়ন্তী পর্বতের অধিবাসী আদিম জাতির মধ্যে এক শক্তিশালিনী সর্পদেবীর পূজো হয় থাকে, তাঁর নাম থেল্ন (Thelen)। কিছুদিন পূর্বেও নরবলি দিয়ে তাঁর পূজো করা হোত। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল—বিশেষতঃ বিহারেও যে প্রাচীনকালে সর্পদেবীর পূজো প্রচলিত ছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগীরের ধ্বংসস্তূপ খননের ফলে সেখান হতে এক প্রাচীন সর্পমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি নারীরূপিণী নাগিনীমূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ; মনে হয়, তারাও প্রাচীনকালে স্থানীয় কোন নামে পূজিত হোত। এখন পর্যন্তও সেখানে মনিয়ার নামক সর্পের উদ্দেশ্যে পূজো

দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিহারের সর্পশ্রুতি অনুযায়ী মনিয়ার বা মানিয়া (মণিকা) নামক সর্পই বাসরগৃহে বালা-লখীন্দরকে দংশন করেছিল।

প্রাচীনকালে বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই সর্পদেবী সম্পর্কিত সংস্কার প্রচলিত ছিল বলে সহজেই মনে হতে পারে যে, তার মধ্যবর্তী অঞ্চল বাংলাদেশও অনুরূপ সংস্কারের প্রভাব হতে মুক্ত ছিল না। অতএব মনে করা যেতে পারে যে, প্রাচীনকাল হতেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও সর্পভয় হতে ত্রাণ পাবার জন্য এক স্ত্রী-দেবতার পূজো করা হোত। খাসিয়াদিগের থেলুন দেবতার মত তার নিকটও নরবলি দেওয়া হত বলে মনে হয়; কারণ, সর্পদেবীর নিকট পশুবলি দিবার সংস্কার বাংলাদেশে এখন পর্যন্তও অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু আজ থেকে কতকাল আগে যে বাংলাদেশে সর্পদেবীর পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছিল, তা আজ নিশ্চিত করে বলবার কোন উপায় নাই। তবে মাতৃতান্ত্রিক জাতির মধ্য থেকেই দেবী-পূজোর মত নর বা পশুবলির উদ্ভব হয়ে থাকে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করে থাকেন।

এই সকল কারণে মনে হয় যে, বাংলার প্রতিবেশী গারো কিংবা খাসিয়া জাতির মত বাংলাদেশেও যখন এক প্রবল মাতৃতান্ত্রিক জাতির বাস ছিল, তখনই তা'তে এক সর্পদেবীর পূজোর উদ্ভব হয়েছিল, তারপর এ'দেশে ক্রমে যখন বৌদ্ধ ও হিন্দুসংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছে, তখন সেই প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সংস্কার হিন্দুসংস্কার দিয়ে বাইরের দিক থেকে প্রভাবিত হয়েছে; কিন্তু তার অন্তঃপ্রকৃতি প্রায় অক্ষুণ্ণই রয়ে গেছে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে এদেশের সর্পদেবীর যখন উদ্ভব হয়েছিল, তখন তা যে কি নামে পরিচিত ছিল, তা আজ আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু তার পরবর্তী যুগ অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত যুগে যে তার কি পরিচয় ছিল, তা জানতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বলতে মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মই

বুঝায়; কারণ, এই অঞ্চলে তারই পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বাংলার মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সর্পদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁর নাম জাঙ্গুলী। জাঙ্গুলী শব্দটি সংস্কৃত নয়—জঙ্গল নামক দেশজ শব্দ হতে জাত, তার অর্থ জঙ্গল বা অরণ্যের অধিবাসিনী। কোনও আরণ্য জাতি কর্তৃক পূজিতা দেবী বলে তিনি এই নামে পরিচিতা ছিলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধসূত্রগ্রন্থ 'সাধনমালা'য় জাঙ্গুলীর বিস্তৃত পরিচয় এবং তাঁর উপাসনার প্রণালী নির্দেশ করা আছে। যদিও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কালেই জাঙ্গুলী দেবীর এই দেশে অস্তিত্ব এবং বিশেষ প্রাধান্য ছিল, তথাপি একথা সত্য যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারা যায় না। কিন্তু একথাও সত্য যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে প্রবেশ লাভ করবার পূর্বে এই দেবী স্থানীয় কিংবা বহিরাগত কোন আদিম সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, নতুবা তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজ তা দিয়ে প্রভাবিত হবার কথা ছিল না। তিব্বত প্রমুখ দেশ থেকে মাতৃতান্ত্রিক কোন জাতির মধ্যস্থতায় এই দেশে যে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার লাভ করেছিল, তা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন; সেইজন্য মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম এই দেশে প্রচারিত হবার আগেই ইন্দো-মোঙ্গলীয় কোন জাতির প্রভাববশতঃ বাংলাদেশে জাঙ্গুলীর উদ্ভব হয়েছিল।

বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগে বৌদ্ধ সংস্রবের জন্য সর্পদেবীর জাঙ্গুলী নামটি পরিত্যক্ত হয় এবং তার পরিবর্তে তাঁর বিষনাশকারক গুণের উপর ভিত্তি করে নূতন নাম কল্পিত হয় বিষহরী। শিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তাঁর আভিজাত্য বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করা হয়।

সর্পদেবীর জাঙ্গুলী নামটি বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেলেও বিষহরী নামটি বাংলা এবং বিহারে অদ্যাপি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। কিন্তু তার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে তাঁর আর একটি নাম

প্রচার লাভ করেছে—তা মনসা। মনসা নামটি কখন্ কোথা হতে এ'ল, তাই এখন অনুসন্ধানের বিষয়।

পূর্ব পাঞ্জাবের আম্বালা ও গুরগাঁও জিলায় দু'টি সর্পমন্দির আছে —মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনসা। উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত হরিদ্বার শহরের উপর মনসা পাহাড় নামক একটি টিলা ও তদুপরি মনসাদেবীর মন্দির নামক একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে; মন্দিরের ভিতরে এক ক্ষুদ্র দেবীমূর্তি, মন্দিরের সম্মুখস্থ এক অনুচ্চ বৃক্ষের শাখায় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মাটির ঢেলা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়—পশ্চিম বাংলায় ষষ্ঠী বা মনসাতলায় অনুরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এখনও 'মনসা' নাম রাখা হয়—তা নিশ্চিতই দেবতা অর্থবাচক। মধ্যপ্রদেশের কোল জাতির মধ্যে এক পুং-দেবতা অর্থে 'মন্সা দেও' নামটি প্রচলিত আছে; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সর্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় না।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি জিলার ওরাওঁ নামক দ্রাবিড়-ভাষাভাষী আদিম জাতির মধ্যে সর্পদেবীরূপে 'মনসা'র নাম শুনতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে সাপের ওঝাকে নাগমতি বলে। নাগমতি এবং তার শিষ্যগণ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে 'মন্সা'র নিকট মুরগী বলি দিয়ে তাঁর পূজো করে। নাগমতি ও তার শিষ্যগণ এই উপলক্ষে সারাদিন উপোস করে থাকে এবং সন্ধ্যার সময় 'মন্সা'র নামে নাগমতি ও তাহার প্রত্যেক শিষ্য একটি করে মুরগী বলি দেয়, সকলে মিলে একসঙ্গে 'মন্সা'র মাহাত্ম্য কীর্তন করে, গান গায় ও তালে তালে হাতে তালি বাজায়। এই উপলক্ষে সাপের বিষ ঝাড়বার নানাপ্রকার মন্ত্র আবৃত্তি করা হয় এবং নানা জাতি সাপের নাম করা হয়। অনুষ্ঠানটির সঙ্গে শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠিত বাঁকুড়া ও বীরভূম জিলার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ঝাঁপান অনুষ্ঠানটির আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

সিংহভূম জিলার অন্তর্গত কম্বন অঞ্চলের হো জাতির মধ্যেও মনসাদেবীর নাম শুনতে পাওয়া যায়। মানভূম ও হাজারিবাগ জিলা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ভূমিজ ও কুর্মীদের মধ্যে সর্প-দেবীরূপে মনসার নামটি সুপরিচিত। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদিগের মধ্যেও মনসাদেবীর নাম শুনতে পাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগণা জিলার অন্তর্গত দেওঘরে বৈদ্যনাথ শিবমন্দিরের আঙ্গিনায়ও একটি মনসাদেবীর মন্দির আছে, কিন্তু মন্দিরটি যে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পর নিমিত হয়েছিল, তা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু সিংহভূম, মানভূম, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি পশ্চিম বাংলার সীমান্ত সংলগ্ন জিলাসমূহে নামটি বাংলাদেশ থেকে গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়। উত্তর বিহারের সর্বত্র সর্পদেবী অর্থে বিষহরী নামটি অধিকতর প্রচলিত হলেও মনসা নামটিরও ব্যাপক প্রচার আছে। নামটি প্রথম বিহারে কিংবা বাংলাদেশে প্রচারিত হয়েছিল, তা বলতে পারা যায় না। বাংলাদেশ থেকেই মনসা নামটি আসামে প্রচারিত হয়েছে।

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর এক জাতি বছরের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট দিনে বল্মীক-স্তূপে এক অদৃশ্য সর্পিণীর উদ্দেশ্যে পূজো নিবেদন করে থাকে—সর্পিণীর নাম 'মনে মঞ্চাম্মা'। 'মনে' শব্দটি বাদ দিলে 'মঞ্চাম্মা' কথাটির মধ্যে দুইটি শব্দ আছে, মঞ্চা ও অম্মা। মঞ্চা শব্দটি থেকে মনসা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে কেউ মনে করেছেন। তবে কি ভাবে যে সুদূর কর্ণাট অঞ্চলের এক অদৃশ্য সর্পিণীর নাম বাংলাদেশে এসে প্রচার লাভ করল, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবার কেউ বলেছেন, সেনরাজগণ কর্ণাট অঞ্চল থেকেই বাংলাদেশে এসেছিলেন, তাঁরাই এই নামটি বাংলাদেশে এনে প্রচার করেছেন। কিন্তু একটি কথা এখানে স্মরণ রাখতে হবে; দাক্ষিণাত্যের সকল অঞ্চলেই উচ্চতর জাতি নিম্নজাতির সকল সংস্রব বাঁচিয়ে চলে। সেনরাজগণ উচ্চবংশসম্ভূত কর্ণাট ক্ষত্রিয়, তাঁরা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; কিন্তু গ্রাম্য

সর্পদেবী 'মনে মঞ্চাম্মা'র উপাসকগণ বাংলাদেশের বাউরী, বাগ্‌দী প্রভৃতি অপেক্ষাও হীন তোরিয়ার, চক্র প্রভৃতি নামে পরিচিত নিম্নতম জাতির অন্তর্ভুক্ত। বিশেষতঃ, মনে মঞ্চাম্মার মত গ্রাম্য-দেবী দাক্ষিণাত্যের প্রতি গ্রামেই বিভিন্ন নামে নিম্নজাতির কাছে পূজো পেয়ে আস্‌ছেন, তাদের মধ্যে মুদামা নামক সর্পদেবীরও প্রস্তরমূর্তি নির্মিত হোত। অতএব তাদের মধ্যে থেকে বিশেষ করে মনে মঞ্চাম্মা সেনরাজদিগের পূর্বপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোনই কারণ ছিল না। সুতরাং মনসা নামটি সেখান থেকে আসেনি। মনে হয়, নামটি পশ্চিম ভারতের মনসা থেকেই এসেছে, কালক্রমে জাঙ্গুলী দেবী নাম বৌদ্ধ সংস্রব হেতু লুপ্ত হবার পর মনসা নামটি প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর আগে তা হয় নি।

সর্পদেবী মনসার কাহিনী নিয়ে এক আখ্যায়িকা-কাব্য বাংলায় রচিত হয়েছে, তা মনসা-মঙ্গল বলে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে মনসা-মঙ্গলই সব চাইতে বেশী প্রচার লাভ করেছিল। তার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

চন্দ্রবংশে পশুসখা নামে এক রাজা ছিলেন। বার্ধক্যে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে একদিন অরণ্যে নদীতীরে বসে তপস্যা করছিলেন, এমন সময় দেখতে পেলেন, দুটি পক্ষীশাবক স্রোতের জলে ভেসে যাচ্ছে; দেখে তাঁর করুণার উদয় হোল, নদীতে সাঁতার কেটে তাদের ধরে আন্‌লেন, তারপর বৃক্ষকোটরে রেখে সেবাযত্ন করতে লাগলেন। একদিন তিনি পক্ষীশাবকের আহার সন্ধান করতে দূরে চলে গিয়েছেন, এমন সময় মনসার এক সাপ এসে তাদের খেয়ে ফেলল। তপস্বী ফিরে এসে যখন দেখলেন, তাঁর পালিত শাবক দুটি সাপে খেয়ে গিয়েছে, তখন তিনি শোকে উন্মাদ হয়ে গেলেন। তারপর এই প্রতিজ্ঞা করে প্রাণত্যাগ করলেন যে, তিনি পরজন্মে সাপের শত্রু হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি চম্পক নগরে এক সদাগরের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হল চন্দ্রধর।

পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সদাগর হলেন। তাঁর ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করল। ক্রমে তাদের বিবাহ করালেন। মনসা দেবী নিজের পূজো প্রচার করবার জন্য মর্ত্যে এলেন; দেখলেন, ধনে মানে প্রতিপত্তিতে চাঁদ সদাগরের তুল্য ব্যক্তি সমাজে আর দ্বিতীয় নেই। তিনি তাঁর পূজো পাবার অভিলাষ করলেন। চাঁদ সদাগরের পূর্ব জন্মের কথা মনে পড়ল—তিনি মনসাকে হেঁতালের লাঠি নিয়ে তাড়া করে গেলেন; তারপর ঘোষণা করে দিলেন যে, তাঁর রাজ্য-মধ্যে বাস করে কেউ সর্পদেবী মনসার পূজো করতে পারবে না। মনসা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেলেন, চাঁদের উপর কঠিন প্রতিহিংসা গ্রহণ করবার সংকল্প করলেন। তিনি চাঁদের বাগানবাড়ী বিনষ্ট করলেন, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাঁর ছয় পুত্রকে বিনাশ করলেন। তবুও চাঁদ অটল রইলেন; তিনি শিবের উপাসক, তিনিও প্রতিজ্ঞা করলেন, যে-হাতে তিনি শিব পূজো করেন, সেই হাতে চেঙমুড়ি কাণী মনসার পূজো করবেন না।

চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে চাঁদ সদাগর বাণিজ্য করবার জন্য যাত্রা করলেন। মাঝ সমুদ্রে মনসা আবির্ভূতা হয়ে বললেন, 'আমার পূজো কর, নতুবা তোর সর্বনাশ করব।' চাঁদ সদাগর মনসাকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। সমুদ্রে তুমুল ঝড় উঠল, চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবল, চাঁদ সর্বস্বান্ত হয়ে কোনমতে সমুদ্রের তীরে এসে প্রাণ বাঁচালেন। অপরিচিত দেশে ভিক্ষে করে তাঁর দিন কাটতে লাগল, বার বৎসর পর কোন রকমে দেশে ফিরে এলেন। তাঁর আর একটি পুত্র হল, নাম লখীন্দর। ক্রমে তার বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজন করতে লাগলেন; কিন্তু চাঁদ সদাগর জানতেন, বিয়ের রাত্রে সর্প-দংশনে তার মৃত্যু লেখা আছে। তিনি এক লোহার বাসর নির্মাণ করলেন। বেহুলার সঙ্গে লখীন্দরের বিয়ে দিয়ে বরবধূকে লোহার বাসরে এনে রাখলেন। কিন্তু লোহার বাসরের এক গোপন ছিদ্র-পথ দিয়ে সর্প প্রবেশ করে লখীন্দরকে দংশন করল; সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হলো। চাঁদ সদাগর ও তাঁর পত্নী

সনকা শোকে উন্মাদ হয়ে গেলেন। কিন্তু বেহুলা অচল অটল রইল। সে প্রতিজ্ঞা করল, স্বর্গরাজ্যে গিয়ে যে-ভাবেই হোক, স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আন্‌বে। এই উদ্দেশ্যে এক ভেলার উপর লখীন্দরের শবদেহ রেখে গাঙ্গুরের জলে ভাসিয়ে সে স্বর্গের পথে যাত্রা করল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ফেরবার জন্য কত অনুরোধ করল ; কিন্তু বেহুলা কারও কথা শুনল না। নদীস্রোতে ভাসমান ভেলার উপর তার দিনের পর রাত্রি কাটতে লাগল, লখীন্দরের শব পচে গলে গেল—কেবল অস্থি কয়খানা অবশিষ্ট রইল। ছয় মাস পর স্বর্গের ঘাটে গিয়ে তার ভেলা ঠেকল। স্বর্গের ধোপানী নেতার সাহায্যে বেহুলা দেবসভায় গিয়ে উপস্থিত হোল। সেখানে দেবতাদের নৃত্য দেখিয়ে সন্তুষ্ট করে সে তার স্বামীর ও ছয় ভাসুরের প্রাণ ফিরে পেল। সকলকে নিয়ে বেহুলা দেশে ফিরল, তার অনুরোধে চাঁদ সদাগর বাঁ হাতে মনসাকে একটি ফুল দিলেন, তাতেই মনসা খুসী হলেন।

লৌকিক দেবদেবী

বাংলা দেশের সকল স্তরের হিন্দু সমাজেই এমন বহু দেবদেবীর পূজোর প্রচলন আছে, যাদের কোন পরিচয় রামায়ণ, মহাভারত কিংবা কোন পুরাণের মধ্যে পাওয়া যায় না। বাংলার জন-মানস থেকে তার ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয়তায় তাদের উদ্ভব হয়েছে। তারপর অনেক ক্ষেত্রেই পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে তাদের একটা সামঞ্জস্য করে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে। তারাই লৌকিক (popular অথবা folk) দেবদেবী বলে পরিচিত। এই শ্রেণীর দেবদেবীর মধ্যেও দুটো প্রধান ভাগ আছে। প্রথমতঃ, যাঁরা পুরাণ-নিরপেক্ষ বাংলার জন-মানস থেকে উদ্ভূত হলেও সমগ্র বাংলা দেশ জুড়েই তাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছে, যেমন কৃষকের দেবতা শিব, সর্পের দেবী মনসা, গার্হস্থ্য সুখদুঃখের দেবী চণ্ডী, কুষ্ঠরোগের দেবতা ধর্মঠাকুর, বসন্ত রোগের দেবী শীতলা ইত্যাদি। কিন্তু আর এক শ্রেণীর দেবদেবী আছেন, যাঁরা গ্রাম-দেবতা মাত্র, বিশেষ একটি গ্রামের সীমা অতিক্রম করে তাদের অধিকার গ্রামান্তরেও বিস্তৃত হতে পারে নি, তাঁদের নামের সংখ্যা করা যায় না; যত গ্রাম, তত নাম। কিন্তু পূজোর উদ্দেশ্যে এবং দেবদেবীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রথমোক্ত শ্রেণীর দেবদেবীকে যদি লৌকিক দেবদেবী বলা হয়, শেষোক্ত শ্রেণীর দেবদেবীকে গ্রাম-দেবতা বলা যায়। লৌকিক দেবদেবীদের নিয়েই মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে, গ্রাম-দেবতাদের নিয়ে তা হয় নি।

ভারতীয় যে সকল প্রাগ্-বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দু সমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান। তা থেকে স্বভাবতঃই অনুমিত হবে যে, এ দেশের

প্রাগ্-বৈদিক সমাজে তৎকালীন শৈবধর্মের অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব ছিল। মহেঞ্জোদরোর সাম্প্রতিক আবিষ্কার হতেও এই বিষয় সমর্থিত হয়। সেইজন্যই মনে করা হয় যে, বর্তমানে ভারতের যে অঞ্চলে আর্যেতর জাতির লোক অধিক সংখ্যায় বসবাস করে, সেই অঞ্চলেই শৈবধর্মের এবং যে অঞ্চলে আর্যজাতির বংশধরগণ অধিক পরিমাণে বাস করে, সেই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলা দেশ হতে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে উদ্ভূত হয়েছিল, কালক্রমে তা বাংলা দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হবার আগেই তাকে প্রাগার্য (pre-Aryan) শৈব ধর্মের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। অতএব বাংলা দেশে প্রথম থেকেই যে শৈব ধর্মের প্রচার হয়েছিল, তার সঙ্গে আর্যেতর সমাজের উপাদান আগে থেকেই মিশ্রিত ছিল। শুধু তাই নয়, অনার্য দেবতা শিব ইতিপূর্বেই আর্য সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে স্বকীয় মহিমায় স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন।

বৈদিক রুদ্র দেবতার মধ্যেই অনার্য উপকরণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। বৈদিক দেব-সমাজের মধ্যেই এই অনার্য দেবতা নিজের স্থান করে নেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্যে রুদ্র দেবতার বৈদিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধের অনুকরণে তাঁর এক শান্ত সমাহিত শিবমূর্তির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত শীলমোহর-গুলোর মধ্যে যোগাসনারূঢ় এক দেবমূর্তির পরিচয় থেকে মনে হয় যে, যোগীন্দ্র শিবের পরিকল্পনা প্রাগার্য (pre-Aryan) সমাজ থেকে উদ্ভূত ; কালক্রমে তাও এসে পৌরাণিক পরিকল্পনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এইভাবে ভারতীয় পৌরাণিক সমাজ রুদ্র, শিব ও যোগী চরিত্রের মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করবার প্রয়াস পেয়েছে। তাই একদিকে এই দেবতা যেমন ঘোর, ভৈরব এবং রুদ্র, তেমনই অন্যদিকে আবার অঘোর, শিব এবং দক্ষিণ—আবার তিনিই যোগীশ্বর ও যোগীন্দ্র। পৌরাণিক সাহিত্যের ভেতর দিয়েই

প্রধানতঃ আর্যধর্ম বাংলা দেশে প্রচারিত হয়েছিল বলে এই দেবতার চরিত্রগত বিভিন্নমুখী এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথম থেকেই এই দেশে প্রচার লাভ করেছিল। সেইজন্য কোথাও তিনি মঙ্গলকারী দেবতা, আবার কোথাও তিনি রুদ্র ভয়ানক। শিবের এই দুইটি প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপরই বাংলার লৌকিক শৈব ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

বহিরাগত শৈবধর্ম বাংলার সমাজের উচ্চতর স্তরেই সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়েছিল, তা থেকেই ক্রমে তা নিম্নতর সমাজেও প্রসার লাভ করে। কিন্তু নিম্নতর সমাজের মধ্যে প্রচারিত হয়ে শৈবধর্ম তার পৌরাণিক আদর্শ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। নিম্নতর সমাজ নিজস্ব সংস্কারের ভিত্তির উপর উচ্চতর সমাজ থেকেই সর্বদা তার সকল বিষয়ে প্রেরণা লাভ করে থাকে ; কিন্তু প্রকৃত মানসিক শিক্ষার অভাবে যে সকল উপকরণ উচ্চতর সমাজ থেকে গৃহীত হয়, তার মধ্যে তাদের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হতে পারে না—নিম্নতর সমাজের সংস্কারানুযায়ী তারা নতুন রূপে পুনর্গঠিত হয়। অনেক সময় তা এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, তাদের মৌলিক পরিচয়ই উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। পৌরাণিক শৈবধর্ম যখন উচ্চতর হিন্দু সমাজ থেকে ক্রমে নিম্নতর সমাজের মধ্যেও প্রচার লাভ করল, তখন তা এইভাবে নতুন রূপ লাভ করল। তা বাংলা দেশের সর্বত্রই যে অভিন্ন হল, তা নয় ; কারণ, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করেই এই নতুন পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। এই জন্য তার মধ্যে আদর্শগত অনৈক্যও অনেক সময় গড়ে উঠেছিল। ক্রমে মূল পৌরাণিক আদর্শ থেকে এই সকল স্থানীয় পরিকল্পনা অত্যন্ত দূরবর্তী হয়ে পড়েছিল।

বাংলাদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তৃতির ইতিহাস আলোচনা করলে জানতে পারা যায় যে, উত্তর বিহার বা মগধ থেকে তার সংলগ্ন অঞ্চল উত্তর বঙ্গেই আর্য সভ্যতা সর্বপ্রথম বিস্তার লাভ করে। উচ্চতর সমাজ থেকেই তা সেই সময়কার উত্তর বঙ্গের অধিবাসী নিম্নতর

জাতির মধ্যেও প্রচারিত হয়। শৈবধর্ম বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করবার আগেই উত্তর বঙ্গে সাধারণ জন-সমাজের মধ্যে তা প্রচারিত হয়ে সেই অঞ্চলে একটি স্থানীয় রূপ লাভ করেছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিব একজন কৃষক। বলা বাহুল্য যে, উত্তর বঙ্গের সাধারণ কৃষক সমাজেই শিবের এই অভিনব পরিকল্পনা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কৃষক হলেও প্রত্যক্ষ কৃষিকার্যে তাঁর অসীম অনাসক্তি। অবশ্য এই অনাসক্তির ভাবটুকু তাঁর চরিত্রের উপর পৌরাণিক চরিত্রেরই প্রভাবের ফল। কৃষিকার্যে ঔদাসীন্যের জন্যই তিনি নিত্য সাংসারিক অভাব অনটনের যন্ত্রণা ভোগ করে থাকেন। এই অসচ্ছলতার জন্য তিনি কৃষিকার্যে মনোযোগী না হয়ে বরং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। এই ভাবে বাংলার কৃষকগণ একদিকে যেমন কৃষিকার্য দেব-বৃত্তি বলে নির্দেশ করে তার উপর এক অপরূপ গৌরব দান করেছিল, আবার অন্য দিকে তেমনি ভিক্ষাকার্যকেও দেব-বৃত্তি বলে উল্লেখ করে নিষ্ক্রিয় জীবনের মহিমা কীর্তন করেছিল।

পৌরাণিক অকিঞ্চন শিবের পরিকল্পনার উপরই ভিক্ষুক শিবের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, অবশ্য তার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম থেকে ভিক্ষু-জীবনের আদর্শও প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে অনুভব করা যায়। বলা বাহুল্য, তাদের সঙ্গে শিবের কৃষক-চরিত্রের কোন রকম সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না। কৃষিকার্য ব্যতীতও বাংলাদেশে শিবচরিত্রের উপর আরও কয়েকটি গুণ আরোপ করা হয়েছিল, তা তাঁর ভাঙ্ ও গাঁজায় আসক্তি। শিব কর্তৃক বিষপানের পৌরাণিক কাহিনীকেই সেকালের বাঙ্গালী কৃষকগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও রুচি অনুযায়ী এই ভাবে রূপান্তরিত করে নিয়েছিল ; এইভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে, বাংলার শিব একদিকে একজন অলস কৃষক, আবার অন্য দিকে গাঁজা এবং ভাঙে পরম আসক্ত।

এদেশে আর্য সভ্যতা বিস্তারের পূর্বে উত্তর বঙ্গে কোচ নামক এক জাতি বাস করত। কৃষিকার্যই তাদের প্রধান বৃত্তি ছিল। পৃথিবীর

বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক আদিম জাতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, যে-সকল জাতির মধ্যে কৃষিকার্য প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে কৃষিকার্যের জন্য এক দেবতার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে ইনি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা (Fertility god) বলে পূজিত হন। ইনি কখনও স্ত্রীরূপে, কখনও বা পুরুষরূপে পরিকল্পিত হন। উক্ত কোচ জাতির মধ্যেও এই শ্রেণীর এক দেবতার অস্তিত্ব ছিল। এখনও উত্তর বঙ্গে বিশেষতঃ দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমায় কৃষকদের মধ্যে মহারাজ নামক এক দেবতার পূজো হয়ে থাকে। অগ্রাণ মাসে নবান্নের সময় স্থানীয় কৃষকগণ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে এই দেবতার বারোয়ারী পূজো করে। তাদের বিশ্বাস, মহারাজের আশীর্বাদেই তারা কৃষিকার্যে সুফল লাভ করতে পারে। অতএব ইনি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা ছাড়া আর কিছুই ন'ন। তার মহারাজ নামকরণ বহু পরবর্তী। মনে হয়, এই অঞ্চলে আর্যসভ্যতা বিস্তৃতির পর স্থানীয় কৃষকদের এই উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা (Fertilitiy god) কোন কোন স্থানে মহারাজ বলে উল্লেখিত হলেও ব্যাপকভাবে শিব বলেই পরিচিত হতে থাকেন। সে'জন্য প্রাচীন বাংলার কবিগণ শিবকে সর্বত্রই কৃষিকার্যের সহায়ক বলে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উত্তর বঙ্গের মহারাজ ঠাকুর, পশ্চিম বঙ্গের ধর্ম ঠাকুর এবং শিব ঠাকুরের মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। তাঁদের পূজোপলক্ষে প্রায় অভিন্ন লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করা হয়ে থাকে।

কোচ কৃষক সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈব ধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বলে মনে হয়; কারণ, দেখতে পাওয়া যায় যে, বাংলার বহু দূরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যেও শিবকে কোচ রমণীদিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলার সর্বত্র প্রচলিত লৌকিক শিবের ছড়ায় কোচনী রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। অতএব মনে হয়, কোচ

জাতীয় কৃষকদিগের সমাজেই পৌরাণিক শিব সর্বপ্রথম এসে প্রবেশ লাভ করেন; তারপর সেখানেই স্থানীয় কোচদিগের সামাজিক জীবনের উপাদানে মিশ্রিত হয়ে তাঁর চরিত্র একটি স্থানীয় ও লৌকিক রূপ পরিগ্রহ করে; কালক্রমে তা বাংলার সর্বত্র প্রচার লাভ করেছে। কিন্তু বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে তা প্রচার লাভ করবার পরও কোচ-সংস্রবের লোক-রুচিকর উপকরণগুলো কখনো তাঁর মধ্য থেকে পরিত্যক্ত হয় নি। বিশেষতঃ সংস্কৃত শৈব পুরাণগুলোর মধ্যেও শিবচরিত্রের অনুরূপ দুর্নীতি-পরায়ণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে, দিগম্বর শিব এক ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করলে পর ঋষি-পত্নীগণ তাঁর সঙ্গে অশ্লীল রসপরিহাস করছেন। অতএব তাঁর উক্ত কোচ-রমণী সম্পর্কের পরিকল্পনায় কতকটা পৌরাণিক প্রভাব থাকাও আশ্চর্য নয়। কোচ-রমণীর সঙ্গে শিবের সম্পর্কের অর্থ এই যে, হিন্দুধর্মের মধ্যস্থতায় শৈব ধর্মের প্রভাব যখন কোচ সমাজের উপর বিস্তার লাভ করল, তখনও কোচ সমাজের মাতৃতান্ত্রিক ভিত্তি শিথিল হয়ে যায় নি—সামাজিক ও পারিবারিক পূজো-পার্বণে কোচ পুরুষদের পরিবর্তে কোচ-নারীরাই পৌরোহিত্য করত। এখনও উত্তর বঙ্গের পূর্ব-সংলগ্ন অঞ্চল গারো ও খাসি সমাজে যে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাতে পুরুষদিগের পরিবর্তে নারীরাই পৌরোহিত্য করে থাকে। উড়িষ্যার শবর জাতির মধ্যে পুরোহিত এখনো নারীই, পুরুষ নয়। কোচ নারীগণ আর্যেতর দেবতা শিবের পূজোয় বিশেষ উৎসাহ দেখাত। তা থেকে শিবের সঙ্গে কোচ-নারী সংস্রবের কথা কল্পিত হয়ে থাকবে। মাতৃতান্ত্রিক কোচ সমাজে নারীর নৈতিক আদর্শ খুব উচ্চ ছিল না বলেই এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই শিব-চরিত্রেও নৈতিক বিচ্যুতির কথা এসেছে।

পারিবারিক জীবনের সহস্র বন্ধনের মধ্যে নিবিড় সুখ উপভোগ করতে বাঙ্গালী চিরদিন অভ্যস্ত। দুঃখ-দারিদ্র্য ও ঐহিক অসচ্ছলতা কিছুতেই তার এই বন্ধন শিথিল করতে পারে না। এদেশের

নারীজীবনের আদর্শও স্বতন্ত্র। সহস্র দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব-অসন্তোষের মধ্যেও তাদের দাম্পত্য জীবন অশিথিল থেকে যায়। শিবের মত স্বামীই নারীর আশৈশব জীবনের কাম্য। নিজের স্বামীর মধ্যে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে তারা নারীজীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। সেইজন্য ব্যক্তি হিসাবে স্বামী যার যেমনই হোক না কেন, তার জন্য কারো মনে ক্ষোভ বোধ হয় না। এ'দেশের স্বামীও যে-কোন অবস্থার মধ্যে পড়েও ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়ে অতি সহজেই দাম্পত্য জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছে। বাঙ্গালী কবিগণ শিবকে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ স্বামী বলে কল্পনা করেছেন। গৃহধর্মের আদর্শই বাঙ্গালীর নিকট সর্বাপেক্ষা বড়; সেজন্যই তার পরিকল্পিত দেবতা আদর্শ গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক শিবের মত তিনি প্রমথনাথ হয়ে শ্মশান-বিহারী নন, বরং তিনি তার সম্পূর্ণ বিপরীত,—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবেষ্টিত গৃহী। যদিও তাঁরও আবাস কৈলাস বলেই উল্লেখিত হয়, তবুও অতি সহজেই অনুভব করা যায় যে, এই কৈলাস বাংলারই এক নিভৃত পল্লী ব্যতীত আর কিছুই নয়। দুই পুত্র, দুই কন্যা ও এক সর্বংসহা পত্নী নিয়ে এই পল্লীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।" (গ্রাম্য-সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী ৬, ১৩৪৭, পৃঃ ৬৪৮) একজন আধুনিক সমালোচকও বাংলার হরগৌরীবিষয়ক কাহিনী সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন যে, 'এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাস-জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরাণীর জীবন-কাহিনী।' গৃহধর্ম পালনের মধ্যেও যে আধ্যাত্মিক চরিতার্থতা সার্থক হতে পারে, এদেশের প্রাচীন কবিগণ তাঁদের

লৌকিক শিবের পরিকল্পনায় তা প্রমাণ করেছেন। অতএব বাংলার শিব পৌরাণিক আদর্শানুযায়ী যোগী নন, বরং আদর্শ গৃহী।

কৃষকের কল্যাণকর দেবতা রূপে উত্তর বঙ্গের কোচ সমাজে যে শিবচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিকল্পিত শিবের চরিত্রে তারই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ, এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মৌলিক জাতিগত পরিচয়ে পার্থক্য আছে। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল সাধারণতঃ রাঢ় নামে পবিচিত। এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই মৃগয়াজীবী কোল-মুণ্ডা জাতির এক শাখা বসবাস করছিল। উত্তর বঙ্গের কোচ জাতীয় আধিবাসীদের মত তারা কৃষিজীবী ছিল না। সেইজন্য স্বভাবতঃই কৃষিকার্যের সহায়ক কোন দেবতারও তাদের মধ্যে কোন স্থান ছিল না। কোল-মুণ্ডা জাতির প্রধান দেবতার নাম ছিল 'মরাং বুরো', ইনি পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা। ইনি মানবের মহা অনিষ্টকারী। উপযুক্ত পূজো না পেলে নানা দুর্বিপাক সৃষ্টি করে তিনি গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে ফেলেন। কালক্রমে হিন্দুধর্ম যখন এই কোল-মুণ্ডা জাতি অধ্যুষিত বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করল, তখন স্বভাবতঃ এদেশে এই অনার্যজাতি-প্রভাবিত হিন্দুসমাজের অন্যতম প্রধান দেবতা শিবকে এই প্রকার রক্তপিপাসু ও ভয়ঙ্কর বলেই কল্পনা করা হলো। অতএব তাকেও তারা তাদের মরাং বুরোর মত পশুবলি দিয়ে পূজো করে পরিতৃপ্ত করতে লাগল। এমন কি, এই অঞ্চলে পরবর্তী কালে আর্যসভ্যতার প্রভাব ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণের মধ্যে শিব সম্পর্কিত এই মনোভাবের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটল না। বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম—এই সকল অঞ্চলের বহুস্থলেই আজ পর্যন্তও বার্ষিক শিবপূজো বা চৈত্র সংক্রান্তির সময় শিবের সামনে পশুবলি দেওয়া হয়। এ অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক গ্রাম্য শিবমন্দিরের আঙ্গিনার মধ্যেই 'ভৈরব থান' নামক একটি স্থান আছে। আধুনিক কালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রভাব বশতঃ অনেক জায়গায় শিবের

সামনেই পশুবলি না দিয়ে ভৈরব থানে এনে পশুবলি দেওয়া হয়। তামিল দেশেও হিন্দু-প্রভাব বশতঃ বর্তমানে গ্রাম্য দেবতাদিগের সামনে পশুবলি দেবার প্রথা প্রায় উঠে গেছে। তবুও তাঁদের সামনে একটি পরদা টেনে দিয়ে তাঁদের আবরণ-দেবতাদের উদ্দেশ্যে এখনও পশুবলি দেওয়া হয়ে থাকে। ভৈরব বাংলাদেশে শিবের আবরণ দেবতার স্থান গ্রহণ করেছেন। বীরভূম জেলার বারমল্লিকা, পাইকর, দক্ষিণ গ্রাম প্রভৃতি গ্রামে এখনও শিবের সামনেই প্রতি বৎসর পশুবলির ব্যবস্থা করা হয়। শিব-চরিত্রের এই অভিনব পরিচয় কেবলমাত্র পৌরাণিক শৈবধর্মের যে বিরোধী তা নয়, তা বাংলা দেশেরও আর কোন অঞ্চলে দেখা যায় না।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম এদেশে প্রচার লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের বহু উপাদানও এসে লৌকিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হতে আরম্ভ করেছিল। পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনাও বুদ্ধদেবের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত। অতএব বাংলার তদানীন্তন বৌদ্ধসমাজ শিবের চরিত্রের মধ্যেই নিজেদের আদর্শের সন্ধান পেয়েছিল। জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনাদর্শ গৌতম বুদ্ধ ও পৌরাণিক শিব থেকে বিশেষ স্বতন্ত্র নয়, এইজন্যই কালক্রমে তদানীন্তন বাংলার বিরাট বৌদ্ধ ও জৈন সমাজ নিজেদের ধর্মীয় উপকরণ দিয়ে এ'দেশের শৈবধর্মকে অভিনবরূপে পুনর্গঠন করে নিয়েছিল। বাংলাদেশের তদানীন্তন আর একটি ব্যাপক প্রচলিত ধর্ম নাথধর্ম। শৈব কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের বাইরে তার উদ্ভব হলেও শৈবধর্মের ব্যাপক প্রসার বশতঃ কালক্রমে তার মধ্যে গিয়েও শৈবধর্মের উপকরণরাশি প্রবেশ লাভ করল। কালক্রমে নাথসিদ্ধাগণও শিবকে গুরু বলে স্বীকার করে নিলেন ; ক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও অনার্য——এই সকল ধর্মমত থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে বাংলার লৌকিক শৈবধর্ম এক অভিনব সঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করল।

লৌকিক শৈবধর্মের পরই লৌকিক শাক্ত ধর্মের বিষয় উল্লেখ করতে হয়। বাংলার লৌকিক শক্তি দেবতার মধ্যে সর্পদেবী মনসার

নামই প্রথম উল্লেখযোগ্য। তার বিষয় পূর্ববর্তী বক্তৃতায় বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করেছি বলে এখানে আর পুনরাবৃত্তি কর্‌তে চাই নে শিবের পরই চণ্ডীর কথা উল্লেখ করব।

বাংলার লৌকিক শক্তিদেবতাদিগের মধ্যে চণ্ডীর প্রকৃতিই সর্বাপেক্ষা জটিল। তার কারণ, বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ স্থানীয় অবস্থা থেকে অনেক সময় পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সকল স্ত্রী-দেবতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তাই কালক্রমে এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে এসে স্থান লাভ করেছে। পুরাণের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়, সকল শক্তি-দেবতাই কালক্রমে শিবের একমাত্র পত্নীরূপে পরিণতি লাভ করলেও তাঁদের উদ্ভবের ইতিহাস পরস্পর স্বতন্ত্রই ছিল। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' (প্রকৃতি খণ্ড ৫৭ অধ্যায়) শক্তিদেবতার এই বিভিন্ন নামগুলো পাওয়া যায়,—যেমন দুর্গা, নারায়ণী, ইশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সর্বাণী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্বতী, সনাতনী। তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, 'the critical eye will see that they are not merely names, but indicate different goddesses who owed their conception to difierent historical conditions but who were afterwards identified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus.'

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও এই প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক চণ্ডীর পূজো হয়ে থাকে, যেমন নাটাই চণ্ডী, ঘোর চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, শুভচণ্ডী (চলিত কথায় সুবচনী), খাড়া শুভচণ্ডী, রথাই চণ্ডী, উদ্ধার চণ্ডী, রণচণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, বসন চণ্ডী, অবাকচণ্ডী, কলাই চণ্ডী, ককাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী—মঙ্গলচণ্ডীর আবার কতকগুলো প্রকার ভেদ আছে, যেমন—বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী বা নিত্যা মঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী, উদয় মঙ্গলচণ্ডী, ভাউত্তা মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গল সংক্রান্তি ইত্যাদি। বর্ধমান জিলার মেমারি রেল স্টেশনের দুই মাইল

দূরে কলসপুর নামক গ্রামে শিবা চণ্ডী নামে এক দেবী আছেন; তিনি শৃগালের উপর আরূঢ়া। বর্তমানে প্রস্তর নির্মিত শৃগাল মূর্তিটি স্থানান্তরিত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে পূজিত হলেও দেবীর ধ্যানে 'বামপাদস্তু ফেরুপৃষ্ঠোপরি স্থিতাম্' বলে উল্লেখ করা হয়; তাতে বাংলার শৃগাল পূজো যে লৌকিক চণ্ডী পূজোর মধ্যে এসে কি ভাবে পরিণতি লাভ করেছে, তা বুঝতে পারা যায়।

চণ্ডীকে মঙ্গল বলবার উদ্দেশ্য এই যে, চণ্ডী ভীষণা প্রকৃতির (malignant) দেবী, তাঁর কাছ থেকে অমঙ্গলেরই আশঙ্কা বেশী —সেইজন্য তাঁকে প্রসন্ন রাখবার উদ্দেশ্যে কিংবা তাঁর অপ্রিয় নামটি এড়িয়ে চলবার প্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ একটি বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা তাঁর উল্লেখ করা হয়। একেই ইংরেজীতে euphemism বলে। বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে শীতলা বলে উল্লেখ করবার উদ্দেশ্যও তাই। উপরি-উদ্ধৃত লৌকিক স্ত্রী-দেবতাসমূহ এক চণ্ডী নামের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের প্রকৃতি পরস্পর স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক পট-ভূমিকা থেকে তাদের উদ্ভব হয়েছে।

বাংলার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের মধ্যে এখনো গভীর ভাবে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, উল্লেখিত স্ত্রী-দেবতাদের অনেকেই এখনও তাতে অনুরূপ উদ্দেশ্যে পূজিত হচ্ছেন। প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের সঙ্গে যখন বাংলার সমাজের আভ্যন্তরীণ যোগ নিবিড়তর ছিল, তখনই তা থেকে এই দেবতাদের পরিকল্পনা বাংলার উচ্চতর সমাজেও গৃহীত হয়েছে। আদিবাসী সমাজ থেকে যে দু' একটি এই শ্রেণীর দেবতা বা উপদেবতার পরিচয়ের এখনও সন্ধান পাওয়া যায়, নিম্নে তাদের উল্লেখ করা যাচ্ছে; বলা বাহুল্য বাংলাদেশে সংস্কৃতের প্রভাব বশতঃ এই সকল অনার্য দেবতার নাম পরবর্তী কালে এমন ভাবে সংস্কৃতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের মৌলিক পরিচয় প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে, তথাপি দু'একটি ক্ষেত্রে তাদের যে সন্ধান পাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধেই এখানে উল্লেখ করা যাবে।

চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত, অর্থাৎ কোন অনার্য ভাষা থেকে পরবর্তী কালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ করেছে। চণ্ডী শব্দটি সম্ভবতঃ অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে। দ্রাবিড় ভাষাভাষী দৃশ্যত আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতীয় ছোট নাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ নামক উপজাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক শক্তিদেবীর পরিচয় লাভ করা যায়। বাংলার লৌকিক দেবী চণ্ডীর পরিকল্পনা সেখান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হয়।

চাণ্ডী স্ত্রী-দেবতা, তিনি প্রসন্ন হলে পশু-শিকারে কৃতিত্ব ও যুদ্ধে জয় লাভ করা যায়। অবিবাহিত ওরাওঁ যুবকদের এই দেবতাই প্রধান দেবতা। গোলাকৃতি একখণ্ড স্বাভাবিক প্রস্তরের মধ্যে তার পূজো হয়। যখন ওরাওঁ যুবকগণ শিকারে বাহির হয়, তখন তারা চাণ্ডীশিলা নিজেদের সঙ্গে রাখে—তাদের বিশ্বাস তা সঙ্গে থাকলে শিকারে ব্যর্থকাম হবার আশঙ্কা নেই। প্রত্যেক ওরাওঁ পল্লীতে, সাধারণত কোন পর্বতের ঢালু জায়গায়, চাণ্ডী-টাঁড় নামে এক কিংবা একাধিক স্থান থাকে; সেখানে একখণ্ড প্রস্তরের মধ্যে চাণ্ডীর অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। একটি বড় চাণ্ডীশিলার চারদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক শিলা থাকে, তাদেরে চাণ্ডীর ছেলেপিলে বলা হয়। পশ্চিম বঙ্গে শিলারূপী গ্রাম্য দেবতার চারধারেও এই শ্রেণীর শিলাখণ্ড থাকে, তা আবরণ দেবতা নামে পরিচিত। ওরাওঁদের বিশ্বাস, চাণ্ডীশিলা বছরের পর বছর অলক্ষ্যে বাড়তে থাকে। চাণ্ডী সাধারণতঃ অবিবাহিত যুবকদেরই দেবতা, তারাই প্রধানত তাঁর পূজো করে।

চাণ্ডী মৃগয়াজীবীদেরই দেবতা। পশু-শিকারে সাফল্য কামনা করেই তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতে সুস্পষ্টই বর্ণিত আছে যে, এই দেবী পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং অস্পৃশ্য ব্যাধ সমাজই তাঁর অনুগৃহীত। তিনি ইচ্ছা করলে শিকারীর দৃষ্টি থেকে বনের পশু লুকিয়ে রাখতে পারেন—

অতএব তিনি প্রসন্ন থাকলেই মৃগয়ায় সাফল্য লাভ করা যায়। এই দেবতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যে, 'some of the spirits, however, such as Chandi, the Goddess of hunting and war, are remarkable for shape-shifting which is indeed a characteristic of the spirits and deities of Oraon pantheon,' অর্থাৎ কতকগুলো উপদেবতা, যেমন মৃগয়া ও যুদ্ধের দেবতা চাণ্ডী, বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে থাকেন বলে প্রসিদ্ধি আছে—ওরাওঁ দেবসমাজের দেবতা ও উপদেবতাদের তা একটি বৈশিষ্ট্য। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ-কাহিনীর দেবতা চণ্ডীও একাধিকবার রূপ পরিবর্তন করে ব্যাধ-যুবককে ছলনা করেছিলেন। প্রথমতঃ স্নুবর্ণ-গোধিকা ও পরে ষোড়শী যুবতী মূর্তিতে এই দেবী ব্যাধ যুবকের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে, ওরাওঁ সমাজের উপরি-বর্ণিত চাণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধকাহিনী-বর্ণিত চণ্ডীদেবীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই—উভয়েই অভিন্ন।

ছোটনাগপুরের মুণ্ডাভাষী মৃগয়াজীবী বীরহোড় জাতির মধ্যে মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গা নামক এক দেবতা আছেন। তাঁর কোন মূর্তি নেই। বীরহোড়গণ যে পর্ণকুটিরে বাস করে, তার নিকটবর্তী কোনও স্থানের বৃক্ষতলে এক কিংবা একাধিক প্রস্তরখণ্ড চাণ্ডীবোঙ্গা কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। গোষ্ঠিগতভাবে দল বেঁধে (communally) শিকারে বার হবার আগে চাণ্ডীবোঙ্গার কাছে শিকারের সকল সরঞ্জাম, যথা জাল, দড়ি, কুঠার, কাঠি ইত্যাদি স্তূপীকৃত করে এনে রাখা হয় এবং শিকারে সাফল্যের জন্য চাণ্ডীদেবী বা বোঙ্গার নিকট মোরগ বলি দেওয়া হয়। তারপর শিকার থেকে ফিরে এই 'চাণ্ডীতলা'য় এসেই শিকারে নিহত পশুর মাংস ভাগ করা হয়। মৃগয়াজীবী বীরহোড় জাতির চাণ্ডীই একমাত্র মৃগয়ায় সাফল্যদাত্রী দেবী। পালামৌ

জিলার অষ্ট্রিক্ভাষী করোয়া উপজাতির মধ্যে বহুবার চাণ্ডীদেবীর নাম শুনেছি।

বৈদিক দেবদেবীর মধ্যে চণ্ডী নামক কোন দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোন পুরাণে এই দেবীর কোথাও উল্লেখ মাত্র নেই। প্রাচীনতর সংস্কৃত অভিধানেও এই নামটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। কিন্তু দুর্গা, উমা, কালী, করালী, কাত্যায়নী, কন্যা, কুমারী, হৈমবতী, সতী, আত্মজা, গৌরী ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। এমন কি, 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' থেকে উদ্ধৃত শক্তিদেবতার নামের তালিকার মধ্যেও চণ্ডী নামটির উল্লেখ নাই, অর্থাৎ 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'ও দুর্গা নারায়ণী ইত্যাদি নামের সঙ্গে চণ্ডী নামটি স্থান পায় নি। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালে রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত পুরাণ, যেমন 'দেবী-ভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', 'হরিবংশ' প্রভৃতিতে চণ্ডীর নাম উল্লেখিত আছে। তাদের মধ্যে কোন কোন পুরাণ একেবারে অর্বাচীন না হলেও তাদের যে সকল অংশে চণ্ডী কিংবা চণ্ডিকার উল্লেখ আছে, তা যে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তা থেকেই মনে হয়, আদিবাসী সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়ে এই দেবী কালক্রমে উচ্চতর হিন্দু সমাজে প্রবেশ করেছেন; তারপর বৈদিক দেবী দুর্গা, উমা এঁদের দিয়ে কালক্রমে প্রভাবিত হয়ে তাদের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছেন। চণ্ডী শব্দটির গঠন দেখেই মনে হয় যে, দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষা থেকে তা আগত। মৌলিক শব্দটি সম্ভবতঃ চাণ্ডীই ছিল—ক্রমে অর্বাচীন সংস্কৃতে তা চণ্ডী, চণ্ডিকা, চণ্ডেশ্বরী, চণ্ডা ইত্যাদি রূপ লাভ করেছে, কিন্তু তারা মূলতঃ যে এক, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী যে ব্যাধ ও পশুকুলেরই দেবতা, কালকেতুর কাহিনী থেকে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। 'গোহিংসক' রাঢ় ব্যাধ-সন্তান কালকেতুই তাঁর প্রথম পূজারী। কালকেতুর বিক্রমে পরাজিত হয়েও পশুকুল চণ্ডীরই শরণাপন্ন হয়েছে। শূকর

মাংসের মত অস্পৃশ্য মাংসও চণ্ডীপূজারই উপকরণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই ভাবে অস্পৃশ্য ব্যাধ-সমাজে জন্ম লাভ করে ক্রমে আর্যসমাজের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এই দেবতার প্রভাব স্থাপিত হতে লাগল এবং ক্রমে পৌরাণিক একটি প্রসিদ্ধ স্ত্রীদেবতার চরিত্র পার্বতীর সঙ্গে এক হয়ে চণ্ডী পরবর্তী হিন্দুর দেব-সমাজে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিলেন। পরবর্তী কালে হিন্দু ভাস্কর্যে গঠিত কোন কোন চণ্ডী দেবীর মূর্তির মধ্যে পশুরাজ সিংহ, হস্তী ও গোধিকা ক্ষোদিত দেখে এই দেবতা যে মূলতঃ আরণ্য কোন জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে; বাংলার প্রাচীন (obsolete) ঐন্দ্রজালিক (magical) ছড়ায় চণ্ডীকে হাড়ীর ঝি বলে উল্লেখ করা হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মনসার উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছি যে, মনসার সহচরী নেতাকেও ধোপার ঝি বলে উল্লেখ করা হত। চণ্ডীকে হাড়ীর ঝি বলবার তাৎপর্য কি? পশ্চিম বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হাড়ী জাতি যে এই দেশের কোনও আদিম অনার্যভাষী জাতির শাখা থেকে উদ্ভূত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা থেকেই চণ্ডীর মৌলিক অনার্য সংস্রব সূচিত হয়। এখানে মনে হতে পারে যে, কোন হাড়ী জাতীয় লোকের কন্যা তার কতকগুলো অলৌকিক (mystic) শক্তির জন্য নিম্নশ্রেণীর সমাজে দেবী বলে বিবেচিত হতে থাকে, কালক্রমে সে স্ত্রীদেবী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন বলে কল্পিতা হয়; সেইজন্যই চণ্ডীকে সাধারণ সমাজে হাড়ীর ঝি চণ্ডী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ'কথা সত্য যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে যে দুটি স্বতন্ত্র কাহিনী আছে, তাদের মধ্যে কালকেতুব্যাধ-কাহিনীর চণ্ডী উক্ত ব্যাধ সমাজ থেকে আগতা হলেও, কালক্রমে বাংলার সমাজে চণ্ডী নামটি অন্যান্য সূত্র হতে আগত স্ত্রীদেবতার উপরও প্রয়োগ করা হতে থাকে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী বা ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে ব্যাধ ও পশুর সংস্রবহীন যে মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ আছে,

তিনি কোন্ সূত্র থেকে কবে এসে বাংলার সমাজে পূজিতা হচ্ছেন, তা খুব স্পষ্ট করে জানবার উপায় নেই।

এই ভাবেই কুষ্ঠ রোগত্রাতা দেবতা ধর্মরাজ ঠাকুর, বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলা এইসব নানা লৌকিক দেবদেবীর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এমনি বাঘেরও একজন দেবতা আছেন, তাঁর নাম দক্ষিণ রায়, কুমীরের দেবতার নাম কালুরায়। এই রকম যে কত আছে, তার অন্ত নেই।

মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তিনটি প্রধান ধারা, যেমন, বৈষ্ণব-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য; তাদের মধ্যে মঙ্গল-কাব্যের ধারাটিই সব চাইতে শক্তিশালী ছিল। লৌকিক দেবদেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্তন করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সুদীর্ঘ কল্পিত কাহিনীর সহায়তায় এগুলো রচিত হতো। কাহিনী কল্পিত হলেও বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের ছায়াতলে তা রচিত হতো বলে অনেক সময় তার চিত্র ও চরিত্রগুলো বাস্তব হয়ে ওঠবার সুযোগ পেত। সারা মধ্যযুগ ধরে বাস্তব জীবন-ধর্মী সাহিত্য রচনার অবকাশ কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্য সে যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মঙ্গলকাব্য রচনার ভেতর দিয়েই তার সাহিত্য মনীষার সার্থক বিকাশ করেছিলেন। চৈতন্য আবির্ভাবেরও প্রায় একশো বছর আগে থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্রের তিরোধান কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ এই চারশো বছর ধরে এ'গুলো রচিত হ'য়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন দেবতার নামে পরিচিত হ'য়েছে, যেমন মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল ইত্যাদি। কালক্রমে এ'গুলোর রচনায় কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে লাগল। সংস্কৃত পুরাণগুলো হিন্দুর ধর্ম ও নীতিকে সাধারণের কাছে সহজে পরিচিত করবার যে দায়িত্ব নিয়েছিল, মঙ্গলকাব্যগুলোও লৌকিক দেব-দেবীদের বাংলার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার সেই দায়িত্ব নিয়েছিল। অভিজাত সমাজ ও লোক-সমাজের মধ্যে ধর্ম এবং নীতিগত সামঞ্জস্য বিধানের যে কল্যাণকর দায়িত্ব সেদিন এই কাব্যগুলো গ্রহণ করেছিল, তার মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনের বহু অসন্তোষ সহজেই দূর হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলকাব্যগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে

উল্লেখিত হলো; তাদের ভিতর থেকেই এদের যথা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রথমেই দেবতার বন্দনা, তারপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণন, সৃষ্টি-রহস্য কথন, মনুর প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর বিবাহ, কৈলাসে হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, পার্বতী, চণ্ডী বা শিবের সম্পর্কিত অন্য কেহ, যেমন, মনসা প্রভৃতির নিজেদের পূজো প্রচারের চেষ্টা, নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে পূজো প্রচার, স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশুর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন—এই সব বিষয়েরই বৈচিত্র্য-হীন বর্ণনা সকল মঙ্গলকাব্যেরই বৈশিষ্ট্য।

নায়িকার 'বারমাসী' বর্ণনা বাংলার প্রাচীন কাব্যগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বারমাসীর বর্ণনায় প্রাচীন কবিগণ পরিবর্ত্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পটভূমিকায় নায়ক-নায়িকার সুখদুঃখের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। একমাত্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই যে এই বারমাসীর বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়, তা নয়। মনে হয়, মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের আগে থেকেই এই বিষয়ে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন লোক-গীতি প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। তারপর পরবর্তী যুগের এই শ্রেণীর কাব্যসাহিত্যকে আশ্রয় করে তা আরও পরিপুষ্টি লাভ করেছে। মধ্যযুগের কাব্যকাহিনীর মধ্যে তাদের যোগ খুব নিবিড় নয়। কোন মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যেই তাদের বর্ণনা অপরিহার্য বলতে পারা যায় না। এজন্য কোন কোন রামায়ণের অনুবাদে সীতার বারমাসী, বৈষ্ণব কবিতায় রাধিকার বারমাসী, চৈতন্য-জীবন-চরিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাসী, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় মহুয়ার বারমাসী ও মলুয়ার বারমাসী ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। এদের ক্ষেত্র ও বিষয়-গত বৈচিত্র্য এত অধিক যে, যে-কোন সাহিত্য অবলম্বন করেই তা প্রকাশ পেয়েছে। অতএব মঙ্গলকাব্যেরই তা কোন বিশিষ্ট লক্ষণ নয়। এই বারমাসীগুলোর বর্ণনায় যদিও কালক্রমে বৈচিত্র্যহীন গতানু-

গতিকতার আশ্রয় নেওয়া হত, তথাপি প্রথম যুগের বারমাসীগুলোর মধ্যে বাঙ্গালীর ব্যক্তি-জীবনের সুখদুঃখের অনুভূতি যে ভাবে মূর্ত হয়েছে, তার জাতীয় মূল্য অস্বীকার করতে পারা যায় না। এদের প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যেও যেমন বাংলার প্রকৃতিরই খুঁটিনাটি বাস্তব চিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়, তাদের পটভূমিকায় অবস্থিত নায়ক-নায়িকার অনুভূতিও তেমনই বাস্তব ও জীবন্ত বলে অনুমিত হয়। প্রকৃতির পটভূমিকায় মানব-মনের সুখ-দুঃখের বর্ণনার রীতি সংস্কৃত কাব্যেও কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য তার অপরিহার্য পাক-প্রণালীর বর্ণনা। উপযুক্ত কোন অবকাশ পেলেই এই সকল কাব্যের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই রন্ধন-কার্যের বিস্তৃত বর্ণনার অবতারণা করা হয়। এই সকল বর্ণনার মধ্যে কবিগণ বাস্তবতার প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। মধ্যযুগের আখ্যান-কাব্যের বাইরেই এদের উদ্ভব হয়েছিল; কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অবলম্বন করে তা আত্মপ্রকাশ করেছে।

বলাই বাহুল্য যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যে এই সকল বর্ণনা সর্বত্রই অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু যেহেতু মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-ভাগ গৌণমাত্র, তার পারিপার্শ্বিক বর্ণনাই মুখ্য, সেইজন্য কাব্যের মধ্যে তাদের স্থান দোষাবহ বলে মনে হয় না। কাহিনীর অগ্র-গতিতে এই সকল বৈচিত্র্যহীন দীর্ঘায়িত বর্ণনা বিশেষভাবেই বাধা সৃষ্টি করে; কিন্তু তথাপি কাব্য-কাহিনীর পরিণতির ওপর সেই যুগের শ্রোতৃমণ্ডলীর কৌতূহল নিবদ্ধ থাকত না; বরং কোন পারিপার্শ্বিক খণ্ড বর্ণনার মধ্যে যদি তারা নিজেদের বাস্তব রস ও রুচির অনুগামী দুএকটা কথা শুনতে পেত, তা হলে তাতেই তাদের কৌতূহল নিবদ্ধ হয়ে পড়ত।

মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নারীদের পতিনিন্দার বর্ণনা। তাতে বিবাহ-সভা কিংবা অন্যত্র কাব্যের নায়ককে দেখে বিবাহিত নারীগণ তার সঙ্গে নিজেদের পতিদিগের তুলনা করে নিজেদের

স্বামি-দুর্ভাগ্যের কথা পরস্পর আলোচনা করে থাকেন। এই তুলনামূলক আলোচনায় কাব্যোল্লিখিত নায়কের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও তা দিয়ে যে সামাজিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তা কোন দিক থেকেই প্রশংসার যোগ্য নয়। এই রীতিটি মূলতঃ সংস্কৃত হতে এসেছে বলে মনে হয়; বাণভট্ট-রচিত 'কাদম্বরী' নামক গদ্য-কাব্যে দেখতে পাওয়া যায় যে, গুরু-গৃহ থেকে ফিরে আসার পর রাজকুমার চন্দ্রাপীড়ের রূপ-যৌবন দেখে বিদিশা নগরের নারীগণ নিজেদের স্বামি-দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করছে। কিন্তু সেখানে বাণভট্টের বর্ণনা বাঙ্গালী কবিদের মত এত অসংযত ও স্থূল নয়।

প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে এই বর্ণনায় যে কদর্য মনোভাব কদর্যতম ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, পরবর্তী মঙ্গল-কাব্যগুলোর মধ্যে তার কিছু অভাব দেখা যায়। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের মঙ্গলকাব্য মাত্রই নীতির দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত; তার কারণ, চৈতন্যদেবের চরিত্রের মধ্যে যে উচ্চ নৈতিক গুণ ছিল, তা সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যের ভেতর দিয়ে সমগ্রভাবে বাংলার সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেকালে স্থূল গ্রাম্যজীবনের বাস্তব চিত্র অবলম্বন করে মঙ্গলকাব্যগুলো যে কুরুচি ও দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছিল, চৈতন্য-সাহিত্যেই সর্বপ্রথম তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। তারই ফলে চৈতন্য-পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলোর নৈতিক সুর উন্নততর হয়ে উঠেছিল। অতএব পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের এই শ্রেণীর বর্ণনাগুলোও বাস্তব ভিত্তির ওপর রচিত নয়, বরং কেবলমাত্র গতানুগতিকতার মুখরক্ষার জন্যই রচিত। বাস্তবতা যখন তার ভেতর থেকে পরিত্যক্ত হল, তখন ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এই শ্রেণীর রচনার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হতে লাগল।

বিবাহাচারের বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই বিষয়ক রচনায় বাংলার সমাজের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলো

সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে ; সুতরাং এই শ্রেণীর বর্ণনা কেবলমাত্র গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের বাঁধাধরা নিয়মানুবর্তী মাত্র নয়। বাংলার ইতিহাস নামে যে সকল গ্রন্থ আধুনিককালে শিক্ষিত সমাজের নিকট পরিচিত, তাদের মধ্যে এ' দেশের রাজনৈতিক বিবরণ ছাড়া বাঙ্গালীর অতীত সমাজ-জীবনের কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র রাজনৈতিক চিত্রের ভেতর দিয়ে কোন দেশেরই সমাজ-জীবনের আভ্যন্তরিক কোন পরিচয় লাভ করতে পারা যায় না। দেশের শুধু রাজনৈতিক ঘটনার উত্থান-পতনের বর্ণনাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য হতে পারে না—দেশের সাধারণ মানুষের অতীত পরিচয় যদি ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ না পায়, তবে সাধারণ মানুষও সে বিষয়ে কোনও কৌতূহল অনুভব করতে পারে না। সেজন্য আমাদের দেশের ইতিহাসের কেবলমাত্র শিক্ষাগত (academic) মূল্য ছাড়া আর কোনও মূল্য নেই। বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসের এই ত্রুটি দূর করবার পক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলো যে পরম সহায়ক হতে পারে, তাদের বিবাহাচারের বর্ণনাগুলো তার প্রমাণ। এই বিবাহাচারের বর্ণনাগুলো বাংলার সর্বত্র অভিন্ন নয়। তার অর্থ, মঙ্গলকাব্যের মৌলিক কাহিনী সম্পর্কে সর্বত্র' অভিন্নতা রক্ষা করা হলেও, তার বহিরঙ্গগত বিস্তৃত (details) পরিচয়ের ভেতর দিয়ে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সর্বত্র রক্ষা করা হয়েছে। কবিগণ নিজস্ব সমাজের মধ্যে যে সকল বিবাহানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদেরই উপকরণ তাদের কাব্য-রচনারও উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই বিষয়ে প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মর্যাদা রক্ষা করতেন ; সেইজন্য যে কবি যে অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই কবি সেই অঞ্চলেরই সামাজিক প্রথার এক একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অতএব বিভিন্ন কবির এই বিষয়ক রচনাগুলো একত্র সংকলিত করতে পারলেই তা থেকেই বাংলার বিশেষ স্তরের একটি সমাজের বিবাহাচারের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সমাজের

ক্রমপরিবর্তনের ধারা যাঁরা অনুসরণ করতে চান, তাঁদের কাছে এই শ্রেণীর তথ্য পরম মূল্যবান্। আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব কিংবা জাতি-তত্ত্বের আলোচনা আজও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি; সেজন্য তাদের মূল্য সম্পর্কে আজও কেউ সম্যক্ অবহিত হতে পারেন নি। কিন্তু একদিন যখন সেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, তখন মঙ্গলকাব্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

বিবাহের আচারগুলো অত্যন্ত রক্ষণশীল; কারণ, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ। প্রাচীন সমাজের বিশ্বাস ছিল যে, বিবাহের প্রচলিত আচারে কোনও ব্যতিক্রম ঘটলে সন্তান-লাভেও বিঘ্ন উপস্থিত হয়; অতএব তাদের মধ্য দিয়ে সমাজের রক্ষণশীলতার একটি পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বিবাহ সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান —তার ভেতর দিয়ে পারিবারিক জীবন-ধারা রক্ষা পায় এবং পরিবারকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর সমাজ-জীবন গড়ে উঠে। বিবাহাচার-গুলো মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তা থেকে বাংলার সমাজ সম্পর্কে বহু খুঁটিনাটি তথ্য অতি সহজেই সংগৃহীত হতে পারে।

বিশ্বকর্মার শিল্পকীর্তির বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তার মধ্য দিয়ে সেকালের বাংলার স্থাপত্য ও অন্যান্য বিবিধ শিল্পের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে থাকে। বিশ্বকর্মার পুরীনির্মাণের মধ্যে এদেশের স্থাপত্য-শিল্প, নগর-পত্তনের মধ্য দিয়ে নগর-সংস্থাপনা (Town planning), ডিঙ্গা নির্মাণের মধ্য দিয়ে সমুদ্রগামী নৌকা-নির্মাণ-কৌশল, কাঁচুলী, টোপর প্রভৃতি নির্মাণের ভেতর দিয়ে চারুশিল্প সাধনার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলার সদাগরদিগের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনায় যেমন একটি প্রাচীনতর ঐতিহ্যের অনুসরণ করা হয়েছে বলে অনুভব করা যায়, উল্লিখিত বিষয়গুলোর বর্ণনায় তার পরিবর্তে কবিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই ভিত্তি করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। প্রথমতঃ পুরীনির্মাণের কথাই

ধরা যাক। কোনও গতানুগতিক রীতি অনুসরণ করে এই বর্ণনার অবতারণা করা হয় নি। পুরী হলেই যে তা বিশাল এবং সুবর্ণ-হীরকাদি-মণ্ডিত হবে, তা নয়; বরং তার পরিবর্তে কোনও কোনও মঙ্গলকাব্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাদা দিয়ে এই পুরীর ভিত্তি পত্তন করা হয়।

বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরবাড়ী মাটির। মঙ্গলকাব্যের কবিদের কল্পনা কখনও আকাশ স্পর্শ করতে পারেনি, তা আকাশের দিকে মুখ তুলেও মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে, স্বর্গ রচনা করতে বসেও মর্ত্যের কাদামাটি তার উপাদান করে নিয়েছে। তাতে অমরাবতীর দেবপুরী সৃষ্টি ব্যর্থ হয়েছে সত্যি, কিন্তু বাংলার মাটির ঘরগুলো সৌন্দর্যে ভরে দিয়েছে।

পল্লীর সমাজ থেকেই মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছে, নাগরিক জীবনের সঙ্গে তা কোন যোগ স্থাপন করতে পারে নি। কিন্তু সে'জন্য সেকালের নাগরিক জীবনের সঙ্গে যে মঙ্গলকাব্যের কবিদের কোন পরিচয় ছিল না, এমন কথা বলতে পারা যায় না। মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে যে নগর-পত্তনের বর্ণনা করা হয়েছে, তাই তার প্রমাণ। তাদের বর্ণনার মধ্যে মধ্যযুগের বাংলার এক একটি নগর যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে—এই সকল রচনাও কবিদিগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত, তাতে কৃত্রিমতা কিংবা গতানুগতিকতার প্রভাব অনুভব করা যায় না।

অবশ্য এ'কথা সত্য যে, মঙ্গলকাব্যের পূর্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্য-গুলোর মত নগর-পত্তন কিংবা নগর-বর্ণনা তার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা যেতে পারে না।

আগেই বলেছি, বাংলার সদাগরদের উপকূল বাণিজ্যের (coastal trade) বিষয় নিয়ে মঙ্গলকাব্যের কাহিনী রচিত হয়েছে; এই সম্পর্কে এদের মধ্যে সমুদ্রগামী নৌকো বা ডিঙ্গি নির্মাণের বিস্তৃত বর্ণনা শুনতে পাওয়া যায়, এই রচনা থেকে বুঝতে পারা যায়, এই সব বর্ণনা এই সম্পর্কিত একটি প্রাচীন ঐতিহ্য

অনুসরণ করবার ফল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল নয়। কারণ, যে যুগে এই বর্ণনাগুলো রচিত হয়েছে, সেই যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগে বাংলার সদাগরদের উপকূল বাণিজ্য লোপ পেয়েছিল, সমুদ্রগামী নৌকা-নির্মাণেরও তখন আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। সেইজন্য এই বিষয়ক বর্ণনাগুলো এত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি।

প্রত্যেক শিল্পকর্মের গুরুই বিশ্বকর্মা—স্থাপত্য-শিল্প থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্মতম চিত্রকলাও বিশ্বকর্মারই কাজ। মঙ্গলকাব্যের সকল শিল্পকীর্তিই বিশ্বকর্মার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। সেইজন্য পুরী, নগর, নৌকা নির্মাণের মত কাঁচুলী, টোপর, ফলা প্রভৃতি নির্মাণ এবং তাদের চিত্রকরণের কার্যও বিশ্বকর্মারই কীর্তি বলে উল্লেখিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই তাদের বর্ণনা অপরিহার্য। প্রত্যেকটির না হোক, তাদের অন্ততঃ এক কিংবা একাধিক বিষয়ের বর্ণনা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই অবশ্য দেখতে পাওয়া যাবে।

সমুদ্রপথের বর্ণনা মঙ্গলকাব্য মাত্রেরই অপরিহার্য অঙ্গ। এই বর্ণনা পড়লে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, তা ভারত সমুদ্রের উপকূল বাণিজ্য পথ। সমুদ্রপথের বর্ণনার মধ্যে কালীদহের বর্ণনা এক অপরিহার্য বিষয়। কালীদহেই চণ্ডীমঙ্গলের 'কমলে কামিনী' বা সামুদ্রিক মরীচিকার আবির্ভাব হয়েছিল, তারই উত্তাল তরঙ্গে চাঁদ সদাগরের ভরাডুবি হয়েছিল, সমুদ্র ঝড়ে সর্বস্বান্ত সদাগরের করুণ চিত্রের পার্শ্বে মঙ্গলকাব্যের পশ্চিমবঙ্গের কবিগণ একটি হাস্যরসের চিত্রও পরিবেষণ করতেন, তা বাঙ্গাল মাঝিদের খেদ। তা থেকে বুঝতে পারা যায়, বহু প্রাচীন কাল থেকেই সমুদ্রগামী নৌকো চালনার কাজে পূর্ববঙ্গের নাবিকগণই অংশ গ্রহণ করে এসেছে। আজও তাদের এই বিষয়ক অভিজ্ঞতার পরিচয় সর্বজনবিদিত।

প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিই গ্রন্থমধ্যে আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তির একটি বিবরণ দিয়ে থাকেন। আত্মপরিচয় অংশে পিতা-পিতামহ মাতা-মাতামহ প্রভৃতির নাম এবং বাসস্থানের উল্লেখ থাকে

এবং গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ অংশে দেবতার স্বপ্নাদেশই যে কাব্য রচনার মুখ্য কারণ, তা উল্লেখ করা হয়।

এ'দেশের সমাজ জন্মান্তরবাদী। জীবনে যাঁরা মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করে থাকেন, তাঁরা সাধারণ মানুষ নন, অভিশপ্ত দেবতা, তাও এ'দেশের লোক বিশ্বাস করে থাকে। সেজন্য প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই নায়ক-নায়িকা যে স্বর্গচ্যুত দেবতা, তা বর্ণনা করা হয়। কাহিনীর সমাপ্তিতে তাদের স্বর্গারোহণের বর্ণনা শুনা যায়।

প্রহেলিকা বা ধাঁধাঁ লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ। জাতির বিবিধ লৌকিক রসোপকরণ অবলম্বন করে লোক-সাহিত্যের ভিত্তির উপরই মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে বলে লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট উপকরণ প্রহেলিকা বা ধাঁধাঁও মঙ্গলকাব্যের অপরিহার্য অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী মাত্রই নিতান্ত শিথিল বদ্ধ—কাহিনীগত এই শৈথিল্যের অবকাশে জাতির বিবিধ রসোপকরণ তার অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছে। মূল কাহিনীর ধারায় সম্পূর্ণ অসংলগ্ন বিবেচিত হলেও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রহেলিকা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই নারীর সতীত্বের পরীক্ষার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তা রামায়ণের সীতার অগ্নি-পরীক্ষার অনুকরণ-জাত, কিন্তু এ'কথা সত্য নয়। কারণ, মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার অনুরূপ কোন পরীক্ষার পরিবর্তে একাধিক পরীক্ষার উল্লেখ আছে। মনসা-মঙ্গলে বেহুলার অষ্টপরীক্ষার কথা উল্লেখিত হয়েছে। ইংরেজিতে তাকে chastity test বলে—মঙ্গলকাব্যে তা লোক-সাহিত্যেরই প্রেরণার ফল।

বিপন্ন নায়ককে দিয়ে দেবীর চৌতিশা স্তব বর্ণনা করানো মঙ্গল-কাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। ক থেকে আরম্ভ করে হ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণ ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক পদের আদিবর্ণরূপে ব্যবহার করে রচিত স্তবই চৌতিশা স্তব নামে পরিচিত। তাতে ক্রমান্বয়ে

চৌত্রিশটি অক্ষর ব্যবহার করতে পারা যায় বলে তাকে চৌত্রিশা বা চৌতিশা বলা হয়।

বলা বাহুল্য, তাদের রচনার ভেতর দিয়ে কোন কবিত্ব প্রকাশ পায় না, দেবতার প্রতি ভক্তির ভাবও যে তাদের ভেতর দিয়ে সার্থক বিকাশ লাভ করেছে, তাও মনে হতে পারে না—তাদের রচনার মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের নিষ্ফল আস্ফালন দেখতে পাওয়া যায়। যে যুগে মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে ভাবের দৈন্য এবং ভক্তির অভাব দেখা দিয়েছিল, সেই যুগেই তাদের মধ্য দিয়ে এই দৈন্য ও অভাব গোপন করবার এই প্রয়াস দেখা গিয়েছিল।

বাংলার সদাগরদিগের বৈদেশিক বাণিজ্যের সংস্কারের উপর মঙ্গলকাব্যের কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে—সেজন্য প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই বাণিজ্য-রীতির কিছু পরিচয় আছে। যে বিনিময় (barter) প্রথা দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য সেকালে নিয়ন্ত্রিত হোত, তার একটি বর্ণনা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই বিষয়ীভূত হয়েছে। তবে এই বর্ণনা সর্বদাই যে বাস্তব, তা স্বীকার করতে পারা যায় না—কারণ, তা অবলম্বন করে প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিই তাঁর পাঠকদের একটু কৌতুকরস পরিবেষণ করেছেন মাত্র।

যুদ্ধ বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। সকল মঙ্গল-কাব্যেই বিস্তৃত যুদ্ধ বর্ণনা আছে। তবে নারায়ণ দেব এবং কেতকা-দাসের মনসা-মঙ্গল ছাড়া আর কারো মনসা-মঙ্গলে যুদ্ধ বর্ণনা স্থান লাভ করে নি ; বীররসের সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস রসেরও তাতে পরিবেষণ করা হয়ে থাকে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে সকল বহির্মুখী যুদ্ধের বর্ণনা নিবিড় যোগ স্থাপন করে উঠ্‌তে পারে না বলে, তাদের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র গতানুগতিকতার পরিচয় প্রকাশ পায় ; নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতাই তাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

দেবীর জরতী বা বৃদ্ধার বেশ ধারণ করে নায়ক-নায়িকাকে ছলনা বা রক্ষা করা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যে Old Lady motif নামক একটি

সাধারণ বিষয় আছে—বাংলার লোক-সাহিত্যেও তার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। 'এক যে ছিল বুড়ী'—বহু লোক-কথারই ভূমিকা। আমরা সকলেই জানি চাঁদের মধ্যেও এক বুড়ী বসে চরকা দিয়ে সুতো কাটে। অতএব বৃদ্ধা লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট চরিত্র; সেই সূত্র থেকে তার কথা মঙ্গলকাব্যেও এসে প্রবেশ লাভ করেছে। লোক-কথার পরিকল্পনায় আপাতদৃষ্টিতে যে অসহায়, অশক্ত অথবা অক্ষম, সেই সর্বাধিক দৈবশক্তির অধিকারী হয়। 'Successsful youngest son' প্রভৃতি বিষয়ক লোক-কথার তাই মৌলিক উদ্দেশ্য। মঙ্গলকাব্যের জরতী চরিত্রের মধ্যেও সেজন্যই দৈবশক্তি আরোপ করা হয়ে থাকে। জরতী বেশ ছাড়াও দেবতাদের কাক ও মাছির—কোনও কোনও স্থলে শ্বেত কাক ও শ্বেত মাছির রূপ ধারণও মঙ্গলকাব্যের একটি অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অবশ্য শ্বেত কাক কিংবা শ্বেত মাছি বাস্তব জগতের কোন জীব নয়।

মশান বা শ্মশান বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত মহাকাব্যের মত বিবিধ রস পরিবেষণ করা হয়; মশান বর্ণনার ভেতর দিয়েই বীভৎস রসের বর্ণনা মুখ্য হয়ে উঠে। অবশ্য যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে প্রেতের হাট প্রভৃতি প্রসঙ্গ অবতারণার ভেতর দিয়েও বীভৎস রসের অবতারণা করা হয়; কিন্তু মশান বর্ণনার ভেতর দিয়ে তা আরও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। এই সকল বর্ণনাও গতানুগতিক এবং অত্যন্ত কৃত্রিম।

মঙ্গলকাব্যের আরও একটি বৈশিষ্ট্য নায়ক বা নায়িকার রূপ-বর্ণনা। মঙ্গলকাব্যগুলোতে রূপ বর্ণনাচ্ছলে যে উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো রূপ বর্ণনায় আদৌ সহায়তা করে নি। অনেক সময় তা অলঙ্কার শাস্ত্রের পথ ধরে এসেছে।

সাজ-সজ্জার বর্ণনা দেওয়াও মঙ্গলকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাজ-সজ্জার বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমরা সেকালের নর-নারীর পরিচ্ছদ ও আভরণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারি। মঙ্গল-কাব্যের রমণীরা পায়ে পাশুলি, কটিতে কিঙ্কিণী, কণ্ঠে শতেশ্বরী

হার, বাহুতে তাড়, হাতে শঙ্খ, কঙ্কণ, কনক মাদুলি ও অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক ব্যবহার করত। কর্ণাভরণ হিসেবে ব্যবহৃত হত তাটঙ্ক, কনকবৌলি, রামকড়ি, মদনকড়ি ও মকরকুণ্ডল। মঙ্গলকাব্যের পুরুষগণও অঙ্গে আভরণ ব্যবহার করত। মঙ্গলকাব্যে পরিচ্ছদের মধ্যে নানারূপ কাপড়ের উল্লেখ করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের নারীগণ গঙ্গাজল, মেঘডম্বুর, অগ্নিপাট, কমলা-বিলাস প্রভৃতি শাড়ী ব্যবহার করত। তারা খোঁপার মধ্যে মাণিক ও মালতীফুল দিত। কেশ-সংস্কারের জন্য আমলকী ব্যবহৃত হত।

দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকে দেবতার পদতলে নতশীর্ষ করানো মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মনসা-মঙ্গলে চাঁদ সদাগরকে, চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতিকে, ধর্মমঙ্গলে মহামদকে দেবদ্রোহী রূপে চিত্রিত করে শেষ পর্যন্ত তাদেরে দেবতার চরণতলে অবনত করানো হয়েছে। লাউসেন ধর্মপুত্র বলে ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মহামদকে কুষ্ঠরোগ দিয়ে আত্মসমর্পণ করানো হয়েছে।

দৈবকার্যে হনুমান ও বিশ্বকর্মার অবতারণাও মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মনসা-মঙ্গলে হনুমান মনসার সহয়তা করবার জন্য চন্দ্রধরের নৌকো ডুবানোর ভার নিয়েছে; চণ্ডীকাব্যেও হনুমান দৈবকার্যে সখের শ্রমিক সেজে বিশ্বকর্মার নির্মাণকার্যে সহায়তা করেছে; ধর্মমঙ্গলেও হনুমান ধর্মঠাকুরের অলৌকিক কর্মের সহায়তা করে ধর্মপুত্র লাউসেনকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছে। দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই লিখেছেন, 'কিন্তু বাল্মীকির এই মহাচরিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে শুধু একটি বানরে পরিণত হইয়াছে।'

গর্ভবর্ণনাও মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। মাসের পর মাস ধরে গর্ভলক্ষণগুলো কিরূপে সন্তান-সম্ভবা রমণীর শরীরে প্রকাশ পায়, কবিরা তার বিস্তৃত বর্ণনা দিতেন। তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জাতকর্মের উল্লেখ করাও মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। এইরূপ বর্ণনা উপলক্ষে কবিগণ জাতকর্মের সংস্কার-গুলোরও উল্লেখ করতেন।

দাম্পত্য কলহের বর্ণনা দেওয়াও মঙ্গলকাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। বৃদ্ধ স্বামীর স্কন্ধে যুবতী ভার্যার ক্রোধাগ্নি বর্ষণ, কুলীন স্বামীর হাতে কুলকন্যাদের নির্যাতন ও বিড়ম্বনার কথা বঙ্গসাহিত্যে কবিগণ দেবদেবীর নামে পরিবেষণ করতেন। হর-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সেকালের দাম্পত্য প্রেমের বিড়ম্বনার কথা বলেছেন।

শিবের উপাখ্যান বর্ণনা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই উপলক্ষে প্রধানতঃ কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' কাব্য অনুযায়ী হর-গৌরীর বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হোত। মঙ্গলকাব্যে শিবের বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে রঙ্গরস পরিবেষণ করা হয়েছে। তা'তে বাঙ্গালী সংসারের একটা পারিবারিক জীবন-চিত্রের আভাসও পাওয়া যায়।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা, নানা কুসংস্কারের কথা, ভক্ষ্যভোজ্যের কথা, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা পরিবেষণ করাও মঙ্গল-কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সকল বর্ণনা থেকে সেকালের রীতিনীতি, সংস্কার-বিশ্বাস ও সামাজিক আচার-আচরণের কথা আমরা স্পষ্ট ভাবেই জানতে পারি।

সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দেওয়াও মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তা পৌরাণিক প্রভাবজাত; সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণগুলোতে পৌরাণিক, কতকটা লৌকিক, আবার কতকটা বৌদ্ধ প্রভাব মিশেছে। ফলে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা এক অদ্ভুত তত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছে। তথাপি এ কথা বলতে হয় যে, মঙ্গলকাব্যের এই সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্তনবাদের ধারার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকারের নির্ঘণ্ট রচনাও মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই নির্ঘণ্ট রচনা উপলক্ষে কবিগণ মানুষ, পশুপক্ষী, ফুল-ফল ও নানা দ্রব্যের তালিকা দিয়েছেন। সংস্কৃত কাব্যসমূহ যেমন বিভিন্ন সর্গে বিভক্ত থাকত, মঙ্গলকাব্যগুলোও বিভিন্ন পালায় বিভক্ত থাকত। তবে সংস্কৃত কাব্যে যেমন বিভিন্ন সর্গ বিভিন্ন ছন্দে রচিত হবার রীতি ছিল, মঙ্গলকাব্যে তা ছিল না। আনুপূর্বিক তা একই

পয়ার ছন্দে রচিত হত, কোথাও করুণ রস বর্ণনা করবার জন্য মাত্র লঘু কিংবা দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হোত। বিষয় বর্ণনার ছেদ বা অবকাশ অনুযায়ী যেমন সংস্কৃত কাব্যসমূহের সর্গবিভাগ হত, মঙ্গল-কাব্যের তা হ'ত না, গানের ব্যাবহারিক প্রয়োজনে তার পালা বিভাগ হোত। যেমন, চণ্ডীমঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গল গান দিনে এক পালা এবং রাত্রে এক পালা গীত হয়; তা দিবা পালা এবং নিশা পালা নামে পরিচিত। চণ্ডীমঙ্গল সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল যে, তা এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হয়ে আর এক মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রত্যহ দুই পালা করে গীত হবে, সেই জন্য চণ্ডীমঙ্গলের পালাগুলো দিনের নামে উল্লেখিত হোত: যেমন, মঙ্গলবারের দিবা পালা, কিংবা মঙ্গলবারের নিশা পালা ইত্যাদি। কিন্তু ধর্মমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল কিংবা শীতলা-মঙ্গল সম্পর্কে এই নিয়ম ছিল না বলে তাতে বিশেষ কোন বারের নামে পালার নাম না হয়ে বিষয়ের নামে পালার নাম হোত; যেমন, লাউসেনের জন্মপালা, ঢেকুর পালা কিংবা মনসা-মঙ্গলে মথন পালা, হুসন পালা ইত্যাদি। কোন কোন সময় মনসা-মঙ্গলের পালাকে মহাভারতের প্রভাব বশতঃ পর্বও বলত, যেমন হুসন পর্ব; কিন্তু কোন পালাকেই রামায়ণের অনুরূপ কাণ্ড বলে উল্লেখ করা হোত না।

কোন কোন মঙ্গলকাব্যে শেষ দিনের শেষ পালায় কাব্যের ফলশ্রুতি শুনতে পাওয়া যেত। চণ্ডীমঙ্গলের অষ্টম দিবসের পালাকে যে অষ্টমঙ্গলা বলত, চণ্ডীমঙ্গলের ফলশ্রুতি তারই অংশ। পুরাণের প্রভাব বশতঃই মঙ্গলকাব্যে ফলশ্রুতির কথা এসেছে; সে'জন্য প্রাচীনতর কোন কোন মঙ্গলকাব্যে তার বর্ণনা নেই। বলা বাহুল্য, এই সকল ফলশ্রুতির মধ্যে স্বর্গের প্রতি প্রলোভনের কথা আছে, তথাপি ব্রতকথার মত কোন কোন মঙ্গলকাব্যে অকিঞ্চিৎকর ঐহিক বস্তু সম্পর্কেও আশ্বাস শুনতে পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেক কবিই তাঁর বর্ণিত প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের শেষ দু'টি পদে ভণিতা ব্যবহার করে থাকেন, তা'তে নিজের সংক্ষিপ্ত নাম, কিংবা কোন উপাধি থাকলে তা ব্যবহৃত হয়। বাংলা

ভাষার জন্মলগ্ন থেকে বাংলা পদ্য রচনায় যে ভণিতা ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয়েছিল, চর্যাপদগুলোই তার প্রমাণ। সংস্কৃত কাব্যে ভণিতা ব্যবহারের রীতি নেই, অথচ জয়দেব তাঁর 'গীত-গোবিন্দ' নামক গীতিকাব্যে ভণিতার ব্যবহার করেছেন; সেজন্য 'গীত-গোবিন্দ' প্রথমতঃ সেই সময়কার বাংলা ভাষায় কিংবা অপভ্রংশে রচিত হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেছেন। 'গাথাসপ্তশতী'তে কবি হাল অপভ্রংশ ভাষায় ভণিতা ব্যবহার করেছেন, সুতরাং অপভ্রংশ ভাষার যুগ থেকেই এই রীতিটি এসে থাকবে।

মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁদের আশ্রয়দাতা এবং পৃষ্ঠপোষকদের নামও নিজের নামের সঙ্গে অনেক সময় ভণিতায় উল্লেখ করেছেন। কবিদের আশ্রয়দাতৃগণের নাম ভণিতায় উল্লেখ থাকবার ফলে অনেক সময় কবিদের কালনির্ণয়ে সহায়ক হয়েছে। অনেক সময় প্রত্যক্ষ ভাবে কোন প্রকার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করেও কোন কোন কবি কোন কোন রাজা বা বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন, তাতেও কবিদের কাল নিরূপণের সহায়ক হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও ভণিতার ব্যবহার হয় সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর ভণিতার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের ভণিতা ব্যবহারের পার্থক্য আছে। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ যেমন ভণিতায় নিজের নাম-ধামের সঙ্গে অনেকে তাঁদের মাতাপিতা, পত্নী, পুত্র-কন্যা পৃষ্ঠপোষকদেরও নাম উল্লেখ করে থাকেন, বৈষ্ণব কবিগণ তা করেন না, তাঁরা অত্যন্ত দীন ভাবে নিজেদের ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, এবং স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিয়ে ভগবানের দাসানুদাস সেবক রূপে তাঁরই লীলার অভিভূত দর্শকরূপে নিজেকে জ্ঞান করে ভণিতা দিয়ে থাকেন; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের ভণিতায় কবির অহমিকা মূর্ত হয়ে উঠে। মঙ্গলকাব্য ভণিতার দিক দিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা অনুবাদের সগোত্র—বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তার কোন যোগ নেই।

মঙ্গলকাব্যের ছন্দ-প্রকরণ বৈচিত্র্যহীন। তা'তে প্রধানতঃ তান-প্রধান ছন্দ অর্থাৎ পয়ার, ত্রিপদী—লঘু ও দীর্ঘ এবং একাবলী ছন্দ

ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় কোন্ ছন্দে পরবর্তী অংশ রচনা করবেন, তা কবি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের ভণিতায় প্রকাশ করে দেন। শ্বাসাঘাত-প্রধান বা স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার ত'তে বেশি নেই। প্রথম যুগের কবিদের মধ্যে কেউ কেউ তা কচিৎ ব্যবহার করলেও মধ্যযুগ জুড়ে তার ব্যবহার অল্পই দেখা যায়। তারপর একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের মধ্যে আবার তার প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বশতঃ কোন কোন মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীর মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। শেষ যুগের মঙ্গলকাব্য বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রের রচনায় বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দের ব্যাপক অনুকরণ-প্রিয়তা দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্য গানের উদ্দেশ্যে রচিত হোত বলে তার প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদেরই শীর্ষদেশে এক একটি ধ্রুব পদ বা ধুয়ার উল্লেখ থাকত। দোহারেরা তা গানের সময় বার বার গাইত। তা কাহিনী-নিরপেক্ষ থাকত এবং সমাজে বৈষ্ণব প্রভাব বশতঃ প্রধানতঃ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন পদই হত। দীর্ঘতর ধুয়াগুলোর একান্ত বৈষ্ণব ভাবানুগত্যের জন্য তাদেরে বিষ্ণুপদ বলত। এই শ্রেণীর ধ্রুবপদ বা বিষ্ণুপদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এসে উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতায় পরিণত হয়েছে। তা ছাড়াও ধুয়াগুলো শিবপদ, দেবীপদ, গৌরপদ, রামপদ ইত্যাদিও হোত। তা দিয়ে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-জীবনের ধর্মচেতনার ধারাটি সার্থকভাবে অনুসরণ করা যায়।

ভাব এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মঙ্গলকাব্যগুলোতে সাধারণতঃ বিশেষ কোন দেবতার মাহাত্ম্যপ্রচার, গার্হস্থ্য ধর্ম এবং পাতিব্রত্যের মহিমা কীর্তিত হোত। তাদের মধ্য দিয়ে অনেক সময় নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রের মহিমা প্রচারিত হয়েছে; যেমন, চণ্ডীমঙ্গলের অনার্য ব্যাধ-দম্পতি এবং ধর্মমঙ্গলের ডোম-ডোমনী কালু-লখাই ইত্যাদি; এক চাঁদ সদাগর ব্যতীত উচ্চ জাতির আর কোন চরিত্রের মহিমা প্রচার তাদের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় না—ধনপতি সদাগর অবশ্য চাঁদ সদাগরের ছায়াতলেই পরিকল্পিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলোর

প্রধান গুণ এই যে, তাদের মধ্যে পার্থিব জীবনের জয়গান শুনতে পাওয়া যায়। এই গুণেই তারা বিশিষ্ট সাহিত্যধর্মী। তারপর প্রত্যেক নীতিমূলক আখ্যান-কাব্যেরই যা বিশিষ্ট গুণ, অর্থাৎ পাপীর শাস্তি এবং ধার্মিকের জয়, শেষ পর্যন্ত তাও মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়ে দেখান হয়েছে। বিশ্বাস, ভক্তি এবং সহিষ্ণুতা পরিণামে জয়লাভ করে, এই বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের কল্যাণ নির্দেশ করে।

কাহিনীর উপসংহারে নায়ক-নায়িকার স্বর্গারোহণ বর্ণনা মঙ্গল-কাব্যের একটি অপরিহার্য বিষয়। স্বর্গারোহণ বর্ণনার পর কোন কোন মঙ্গলকাব্যের ফলশ্রুতি এবং কবির ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, তাকে অষ্ট-মঙ্গলা বলে। কাহিনীর সমাপ্তি যতই করুণ হোক না কেন, স্বর্গারোহণের ভিতর দিয়ে তার মধ্যেও একটা আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার সন্ধান করা হয়; সেজন্যেই তার অবতারণা হয়ে থাকে।

মঙ্গলকাব্যগুলো বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য (national poetry)। মধ্যযুগের বাংলার পরাজিত এবং অধঃপতিত সমাজ-জীবনের মনোভাব তাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তার দেবদেবী অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক্; সেদিন কাব্যের মধ্য দিয়ে যে আক্রোশ প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করবার উপায় ছিল না, তাই স্বেচ্ছাচারী দেবদেবীর নামে প্রকাশ করা হয়েছে। তা'তে দৈবের বিরুদ্ধে মানুষের যে সংগ্রামের কথা আছে, তা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের আত্মরক্ষার অক্ষম প্রয়াস মাত্র। তবু ব্যাপক সমাজ-জীবন তার আশ্রয় ছিল বলে, তার মধ্যে সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়।

যাত্রা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যাত্রা বল্‌তে দেবোৎসব মাত্রই বোঝাত। এই উৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গীত অনুষ্ঠিত হোত বলে সাধারণভাবে তাকে নাটগীতও বলত। সাধারণভাবে যাত্রাকে বাংলার লোক-নাট্যও (folk drama) বলা যায়।

জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাটগীত শ্রেণীর রচনা। সে কথা পরে বল্‌ব। যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের অনুষ্ঠান হোত বলে ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে কেবল-মাত্র নাটগীত বা গীতাভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না, তবু শব্দটি এই অর্থে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়; কারণ, তখন গীতাভিনয়ের মধ্যে নতুনত্ব লক্ষ্য করে তাকে 'নতুন যাত্রা' বলে সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে। 'নতুন যাত্রা' কথাটি থেকেই পুরাতন যাত্রা কথাটি স্বভাবতঃই এসে পড়ে; মনে হয়, মধ্যযুগে নাটগীত যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোত বলে তাকেও সাধারণভাবে 'যাত্রা'ই বলা হোত। কিন্তু তথাপি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন প্রকার অভিনয় অর্থেই যাত্রা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না— উৎসব অর্থেই যাত্রা শব্দ সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে। বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যভাগবত' নামক গ্রন্থে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে চৈতন্য-দেব তাঁর পার্ষদদের নিয়ে যে অভিনয় করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে, তাও যাত্রা বলে উল্লেখিত হয় নি, বরং তাকে 'অঙ্কের বিধানে নৃত্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাতেও সংস্কৃত নাটকের অঙ্ক-বিধানকেই মনে করা হয়েছে। তথাপি তা ভরত-মুনির নাট্যশাস্ত্র নির্দেশিত সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী অভিনয় ছিল না, বরং এই সম্পর্কিত লৌকিক ধারাকেই যে অনুসরণ করা হয়েছে,

তার বর্ণনা থেকেই তা বুঝতে পারা যায়। আগেই বলেছি, যাত্রা বা দেবোৎসবের মধ্যে ক্রমে গীত এবং অভিনয় ব্যাপার প্রাধান্য লাভ করবার ফলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল থেকেই যাত্রা শব্দটিতে কেবলমাত্র গীতাভিনয়কেই বুঝিয়ে থাকে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিনয়োপযোগী উপাদানের কোন অভাব ছিল না। জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ'কে কেউ কেউ প্রাচীন বাংলার যাত্রার অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলে মনে করেছেন। 'গীত-গোবিন্দ' সর্গবদ্ধ কাব্য হলেও তাতে যে রাগ ও তালের লিখিত নির্দেশ পাওয়া যায়, তা থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে, নৃত্য ও গীতের জন্যই তা ব্যবহৃত হোত এবং 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' কবি জয়দেবও এই উদ্দেশ্যেই তা রচনা করেছিলেন। প্রাচীন যাত্রা বা নাটগীত কি প্রকার ছিল, তা সুস্পষ্টভাবে জানবার উপায় নেই ; কিন্তু তা যে প্রকারেরই হোক, তা'তে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রার বীজ নিহিত ছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই ; কারণ, যাত্রার মধ্যে নৃত্য এবং গীতের ধারাটি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও অগ্রসর হয়ে এসেছে।

'গীতগোবিন্দে'র পরই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও বাহ্যতঃ 'গীতগোবিন্দে'রই আদর্শে রচিত, তার মধ্যে 'গীতগোবিন্দে'র বহু শ্লোকেরই বঙ্গানুবাদ থেকে তা প্রমাণিত হবে। তা'তে তিনটি চরিত্র প্রধান—শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও বড়াই। তাদের গীতি-সংলাপ নাটকীয় ভঙ্গিতেই রচিত। পাত্রপাত্রীর বেশ ধারণ করে উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনীত না হলেও কোন প্রকার নাটকীয় ভঙ্গিতেই যে তাকে রূপদান করা হত, তা অনুমান করতে বেগ পেতে হয় না। কারণ, তার মধ্যেই সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ উক্তি-প্রত্যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রার লক্ষণ তার মধ্যে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' ব্যবহৃত এই রীতিটি তৎকালীন একটি ব্যাপক প্রচলিত রীতিরই প্রতিনিধি মাত্র ; কারণ, পরবর্তী যুগের

বাংলা লোক-সঙ্গীতের ধারায় অনুরূপ রীতির বহুল প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়; তা কৃষ্ণধামালী নামে পরিচিত। এই সকল সঙ্গীত সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলে তা স্বভাবতঃই সাধারণের রুচি ও নীতিবোধের অনুগামী করে রচিত হোত এবং তাকে রূপদান করবার জন্যেও সাধারণের সহজবোধ্য প্রণালী গ্রহণ করবার আবশ্যক হোত। অতএব মনে হয়, পাত্রপাত্রীর বেশ ধারণ না করলেও অন্ততঃ অঙ্গভঙ্গি সহকারে তার উক্তি-প্রত্যুক্তি সাধারণের সাম্‌নে প্রকাশ করা হোত। তার মধ্যেও 'নতুন যাত্রা'র পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে থেকেই বাংলা দেশে যে সকল মঙ্গল ও পাঁচালী গান প্রচলিত ছিল, তাদের মধ্যেও নাটকীয় উপাদানের অভাব ছিল না। প্রাচীন মঙ্গল ও পাঁচালী গান যে কি প্রণালীতে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা হোত, তার সুস্পষ্ট বিবরণ কোথা থেকেও সংগ্রহ করবার উপায় নেই। তবুও মনে হয়, প্রাচীন পাঁচালী কিংবা মঙ্গল গান একজন মূল গায়েনের দ্বারা গাওয়া হোত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মত তা'তে পাত্রপাত্রীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হোত না। এখনও বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে শ্রীরাম-পাঁচালী বা রামায়ণ গান করবার যে প্রণালী গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাই প্রাচীন পাঁচালী বা মঙ্গল গান করবার প্রণালীর অনেকটা অনুরূপ বলে মনে হতে পারে। তা থেকে মনে হবে যে, প্রাচীন পাঁচালী এবং মঙ্গল গান অপেক্ষা উল্লিখিত দু'খানি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কাব্যেই নাটকীয় রূপ অধিকতর প্রত্যক্ষ। সেজন্য কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, একমাত্র কৃষ্ণ-সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নিয়েই প্রাচীন যাত্রা রচনা করা হোত। কিন্তু এ'কথা সত্য নয়। কারণ, প্রাক্‌ চৈতন্য-যুগ থেকেই এ'দেশের উপর বৈষ্ণবধর্মের প্রভাববশতঃ কৃষ্ণ-সম্পর্কিত বিষয়বস্তু জনসাধারণের স্বভাবতঃই অধিকতর প্রীতিকর হোত বলে, এই বিষয়ের উপরই গীত-রচয়িতাদের মনোযোগ অধিক আকৃষ্ট হয়েছিল সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও শাক্তধর্ম

সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করেও যে অনুরূপ রচনা সেযুগে প্রচলিত ছিল, তাও অনুমান করতে পারা যায়। বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী অবলম্বন করে উনবিংশ শতাব্দীতে যে ভাসান যাত্রা নামে এক শ্রেণীর যাত্রার ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল, তা এই বিষয়ক পূর্ববর্তী কোন ধারা অনুসরণ করেই রচিত হোত বলে মনে হয়। এই প্রকার রামযাত্রা এবং চণ্ডীযাত্রাও মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু এ'কথা সত্য যে, এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছুই বলবার উপায় নেই; কারণ, অন্ততঃ 'গীতগোবিন্দ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মতও এই সব বিষয়ের লিখিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং উনবিংশ শতাব্দীতে রামায়ণের দল ভেঙে রামযাত্রা, কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের দল ভেঙে চণ্ডীযাত্রার যে সকল দল সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানতে পারা যায়, তা থেকে তাদের পূর্ববর্তী অবস্থা কিছুই অনুমান করা যেতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গের গাজন এবং পূর্ববঙ্গের কুমারী মেয়েদের মাঘমণ্ডল ব্রতের কতকগুলো আচারের ভিতর দিয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর জাতীয় যে সকল ছড়া আজও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে যাত্রার কোনও যোগ আছে বলে মনে করা সমীচীন হয় না। অনুকরণ করবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবজ। সেজন্যে কোন বিষয় বুঝিয়ে বলতে হলে সে সহজেই অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ করে থাকে। এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর সেই প্রবৃত্তি থেকেই এসেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন করে লেখা পাঁচালী গানের রূপ দেখে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, পাঁচালী থেকেই যাত্রার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তা ভুল। প্রাচীন পাঁচালীর যে কি প্রকৃতি ছিল, অর্থাৎ মধ্যযুগে মনসার পাঁচালী, শ্রীরাম-পাঁচালী বা ভারত পাঁচালী যে কি প্রণালীতে গাওয়া হোত, তা জানবার কোন উপায় নেই। উনবিংশ শতাব্দীর যে পাঁচালীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, তার সঙ্গে প্রাচীন পাঁচালীর কোনই যোগ ছিল না। বরং কালক্রমে তার উপর 'নতুন যাত্রা'র প্রভাব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আখ্যান-

মূলক রচনা মাত্রকেই মধ্যযুগে পাঁচালী বলত ; সুদীর্ঘ রচনা মঙ্গল-গান, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদও যেমন পাঁচালী, অনতিদীর্ঘ লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য-বিষয়ক আখ্যায়িকা, যেমন—শনির পাঁচালী, সত্যপীরের পাঁচালী, ত্রিনাথের পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী প্রভৃতিও পাঁচালী। কিন্তু এদের সঙ্গে নতুন পাঁচালীর কোন সাদৃশ্য নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী সমসাময়িক হাফ-আখড়াই, দাঁড়াকবি, এমন কি, নতুন যাত্রার আদর্শেও পুনর্গঠিত হয়েছিল—তাতে পূর্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানের লড়াই হোত ; এমন কি, অনেক সময় পাত্রপাত্রীর সাজও গ্রহণ করা হোত। বলা বাহুল্য, তা সমসাময়িক অন্যান্য লৌকিক সঙ্গীতানুষ্ঠানেরই প্রভাবের ফল।

অতএব তা থেকে যাত্রার উৎপত্তি হয়েছে, এমন অনুমান করা সমীচীন হবে না। হাফ্-আখড়াই, দাঁড়া কবি, কবি ও নতুন যাত্রা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী এক নতুন পাঁচমিশেলী রূপ গ্রহণ করেছিল। চামর-মন্দিরার সাহায্যে দোহারের সহযোগিতায় একজন মাত্র গায়েন আসরে দাঁড়িয়ে সামান্য অঙ্গভঙ্গি করে এখনও যে রামায়ণ কিংবা মঙ্গলগান কোন কোন স্থানে গাইতে শোনা যায়, তাই দীর্ঘতর পাঁচালীগুলোর প্রাচীনতম প্রকাশ-ভঙ্গি ছিল বলে মনে হয় ; কিন্তু তাদের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীর কোন যোগ নেই। নতুন পাঁচালীতে দুই দলে 'সঙ্গীত-সংগ্রাম' হোত, প্রাচীন পাঁচালীতে তা হোত না ; এক দলই আনুপূর্বিক বিষয়-বস্তু পালায় পালায় বিভক্ত করে দিনের পর দিন গান গেয়ে যেত। প্রাচীন পাঁচালী বর্ণনাত্মক—লাচাড়ী এবং পয়ার ছাড়া তা'তে আর কোন রাগ-রাগিণী ছিল না ; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী প্রধানতঃ ভাবাত্মক ; সেজন্য রাগ-রাগিণীর নানা বৈচিত্র্যও তাতে দেখা দিয়েছিল। অতএব নতুন পাঁচালীর প্রকৃতি দেখে বাংলার প্রাচীন কিংবা নতুন যাত্রার সঙ্গে তার সম্পর্ক অনুমান করা যায় না।

তবুও একথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারা যায় না যে, যাত্রার মত এক শ্রেণীর লৌকিক নাটক (Folk drama) খুব

প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে চলে এসেছে। মধ্যযুগে তাকেই নাটগীত বলা হোত। এমন কি, স্পষ্টতঃই বুঝতে পারা যায় যে, ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে একটি প্রচলিত লোক-নাট্যের ধারাকেই সংস্কার করে তার একটি আদর্শ রূপ নির্দেশ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীনতর কাল থেকে প্রচলিত সেই লোক-নাট্যের ধারাটি লুপ্ত হয়ে যায় নি—তা কখনও লুপ্ত হয়ে যেতে পারেও না। ভরত-নির্দিষ্ট নাট্যশাস্ত্রের আদর্শ সমাজের উচ্চতর স্তরের নাট্যরচনায় নিয়োজিত হলেও, সমাজের নিম্নতর স্তরে সেই লোক-নাট্য রচনার ধারাটি বহুদূর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে অগ্রসর হয়ে এসেছে। এই সম্পর্কে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, সমগ্র ভারতব্যাপী সেই লোক-নাট্যের ধারাটি অভিন্ন ছিল না; কারণ, এই বিস্তৃত দেশের বিভিন্ন সমাজ-সংহতির ভিতর থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক-নাট্যের উদ্ভব হয়েছিল। যাত্রার অনুরূপ একটি ধারা হয়ত পূর্বভারতীয় অঞ্চলে নানা কারণে প্রাধান্য লাভ করে-ছিল, তাই কালক্রমে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মত গ্রন্থ অবলম্বন করে তার কতকটা পরিচয় প্রকাশ করেছে। আগেই বলেছি, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে যাত্রা শব্দটি দেবোৎসব ছাড়া অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হোত না, সেজন্যে অভিনয় অর্থে যাত্রার উল্লেখ মধ্যযুগের সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। দেবমাহাত্ম্য কীর্তন সম্পর্কে 'জাগরণ' কথাটির উল্লেখ আছে; যেমন, 'পূজিয়া ত ভগবতী করিল জাগরণে' ('শ্রীকৃষ্ণবিজয়') 'মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে' ('চৈতন্যভাগবত'); কিন্তু জাগরণ-গানের যে ধারা আজ পর্যন্ত চলে এসেছে, তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, যাত্রা থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল।

একদিকে 'গীতগোবিন্দ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও আরেক দিকে উনবিংশ শতাব্দীর নতুন রকমের যাত্রা—বাংলার লোক-নাট্যের এই দুই প্রান্তবর্তী দুটি নিদর্শনের ওপর লক্ষ্য রেখেই তার মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস রচনা করতে হবে। 'নতুন যাত্রা'র ভিতর থেকেই প্রাচীন

ধারাটিকে উদ্ধার করে বহুলাংশে তাকে যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাঁর নাম কৃষ্ণকমল গোস্বামী। অতএব একদিকে যেমন 'গীতগোবিন্দ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যে প্রাচীন যাত্রার প্রত্যক্ষ নিদর্শন কিছু কিছু বর্তমান আছে বলে মনে হতে পারে, তেমনই অন্য দিকে উনবিংশ শতাব্দীর কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নতুন ধরণের কৃষ্ণযাত্রার মধ্যেও তার অন্যান্য কোন কোন উপাদানের অস্তিত্ব অনুভব করা যেতে পারে। এই সকল নিদর্শন বিচার করলে কৃষ্ণযাত্রা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ ধারণায় এসে পৌঁছোনো যায়।

ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়-বস্তুই যাত্রার একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই সম্পর্কে যে সকল বিচ্ছিন্ন নিদর্শনের কথা উপরে উল্লেখ করলাম, তা সবই বৈষ্ণবধর্ম-সম্পর্কিত এবং কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। সেজন্য কৃষ্ণলীলা-সম্পর্কিত বিষয়-বস্তুকেই কেউ কেউ যাত্রার একমাত্র উপজীব্য বলে মনে করেছেন। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, কৃষ্ণলীলা বিষয়কে অবলম্বন করেই প্রাচীনতর যাত্রা রচিত হয়েছিল; কালক্রমে রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল সম্পর্কেও এই রীতি অনুসরণ করা হয়—তার ফলেই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা এবং ভাসান যাত্রার উদ্ভব হয়।

কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রায় যথার্থ নাটকীয় উপাদান (dramatic element) যে খুবই বেশি ছিল, তা নয়; শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন নানা প্রতিকূল ঘটনার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এই সকল প্রতিকূল ঘটনা সর্বদাই দৈবশক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হোত বলে তা যথার্থ নাট্যিক গৌরব লাভ করতে পারে নি। অতএব যথার্থ নাটক রূপে এই সকল যাত্রার ক্রমপরিণতি লাভ করা সম্ভব হয়নি। কৃষ্ণযাত্রার অন্যতম প্রধান ত্রুটি—তা'তে গদ্য সংলাপের অভাব। সেজন্য তার নাটগীত নামটি যথার্থই সার্থক। সঙ্গীতের পর সঙ্গীত যোজনা করে তার শিথিল কাহিনী সামনের দিকে এগিয়ে যেত; কাহিনী তার লক্ষ্য ছিল না, রসই ছিল তার লক্ষ্য

এবং তা সৃষ্টি করবার জন্য যতটুকু কাহিনী অপরিহার্য, তাই শুধু তা'তে অবলম্বন করা হোত। তাও তার নাটক-রূপে ক্রমপরিণতি লাভ করবার পক্ষে অন্তরায় ছিল।

তবে একথা সত্য যে, কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রার কাহিনীর মধ্যে নাট্যিক উপাদান খুব বেশি না থাকলেও, মঙ্গলকাব্য-বিষয়ক কাহিনীর মধ্যে যথার্থ নাট্যিক উপাদান ছিল; কৃষ্ণলীলার কাহিনী অপেক্ষা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অধিকতর মানবিক গুণ-সমৃদ্ধ। কিন্তু মনে হয়, স্বাধীন যাত্রার আকারে মঙ্গলকাব্যের কোন কাহিনী আপনা থেকে বিকাশ লাভ করে নি, কৃষ্ণলীলার অনুকরণে পরবর্তী কালে এই বিষয়ক যাত্রা রচিত হয়েছিল—সেজন্যে তাদের মধ্যে নাট্যিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও তা যথার্থ নাটক রূপে পরিণতি লাভ করতে পারে নি।

কৃষ্ণযাত্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার কাহিনীর ধারায় কোন বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় না, কিংবা কোন নাট্যিক ঔৎসুক্য (suspense) সৃষ্টি করবারও তা'তে কোন প্রয়াস নেই। একটানা গীতি-প্রবাহের বৈচিত্র্যহীন পথে তার কাহিনী এগিয়ে চলে এবং একটি পরিমিত ছেদে এসে তা থেমে যায়; তার গতি নাটকের কাহিনীর মত ক্ষিপ্র নয়, বরং তা মাহাত্ম্যপ্রচার-মূলক আখ্যায়িকার মত মন্দগতি। অতএব তা দিয়ে কোনদিনই নাটক সৃষ্টি সম্ভব হয় নি।

কৃষ্ণযাত্রাকে কেউ কেউ মধ্যযুগীয় ইউরোপের Mystery এবং Miracle Playর সঙ্গে তুলনা করেছেন। মধ্যযুগের Mystery ও Miracle Play থেকেই যেমন ইউরোপীয় সাহিত্যে আধুনিক নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলা দেশের কৃষ্ণযাত্রাও ক্রমে আধুনিক নাটকে পরিণতি লাভ করেছে, একথা কেউ কেউ মনে করে থাকেন; কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল। মধ্যযুগের ইউরোপে Renaissance এর ভিতর দিয়ে প্রাচীন কুসংস্কারের সহস্র নাগপাশ থেকে মুক্তি-লাভের ফলে তার আত্মবোধের যে আনন্দ জাতীয় জীবনের

সকল দিকেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তার নাট্যসাহিত্যের ভিতর দিয়েও তারই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু বাংলা দেশ ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসবার পরও সমগ্রভাবে যে প্রাচীন সংস্কারের সর্ববিধ দাসত্ব থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে, তা কিছুতেই মনে হতে পারে না। অর্থাৎ ইউরোপীয় সমাজের মত সর্বতোমুখী Renaissance বাংলার সমাজে আজও দেখা দেয় নি; অতএব অর্থহীন প্রাচীন সংস্কারের দাসত্ব-বন্ধন থেকে তার সম্পূর্ণ মুক্তি এখনও আসে নি। সুতরাং যে ব্যাপক সামাজিক এবং মানসিক পরিবর্তনের ফলে ইউরোপের Mystery ও Miracle Play-গুলো নাটকে পরিণতি লাভ করেছে, এ'দেশে তার অনুরূপ পরিবর্তনের অভাবে তার কৃষ্ণযাত্রারমত ধর্মবিষয়ক রচনা নাটকে রূপান্তরিত হতে পারে নি। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম যে নাট্যরচনা আবির্ভূত হল, তা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী থেকেই যাত্রার মধ্যে নতুন উপাদান প্রবেশ করতে আরম্ভ করে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লুপ্ত করে দিল। ধর্মভাবের বিকাশই কৃষ্ণযাত্রার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু এই সময় থেকে কৃষ্ণযাত্রায় ধর্মভাব হ্রাস পেতে লাগ্‌ল। তা অবশ্য যুগ-চেতনার ফল বলতে হবে। কারণ, দেখতে পাওয়া যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতচন্দ্রের মধ্যেই বাংলা সহিত্যে সর্বপ্রথম ধর্মবিষয়ে শৈথিল্যের ভাব দেখা দিয়েছে এবং তার পরবর্তী কাল থেকেই, বিশেষতঃ একদিকে ভারতচন্দ্রের সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলে ও অন্যদিকে প্রাচীন ধর্মাশ্রিত সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বসে পড়বার জন্য, যাত্রা থেকেই এই ভাব বিদূরিত হয়ে গেছে। তখন থেকেই কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য-সংলাপ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। এই সংস্কার বিষয়ে যিনি অগ্রদূত, তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর নাম পরমানন্দ অধিকারী। তিনি 'কালীয়দমন যাত্রা' রচনা

করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যদিও তাঁর রচনার পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয় নি, তথাপি জানতে পারা যায় যে, তাঁর মধ্যেই সর্বপ্রথম একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন বৈষ্ণব গীতির পরিবর্তে নাট্যিক ক্রিয়া (dramatic action) এবং সংলাপ (dialogue) প্রবেশ লাভ করেছিল। তারপর খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বিদ্যাসুন্দর এবং নল-দময়ন্তীর কাহিনী নিয়ে 'নতুন যাত্রা' রচিত হলো। এই যাত্রার মধ্যে মালিনীর নৃত্য একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। গোপাল উড়েকে এই বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক বলা হয়। ক্রমে অন্যান্য বিষয়ক যাত্রার কাহিনীর মধ্যেও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এই নৃত্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গীতের প্রবর্তন হয়। তার সূত্র ধরে ক্রমে ক্রমে 'নতুন যাত্রা'য় কালুয়া-ভুলুয়া, মেথর-মেথরাণী, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী, নাপিত-নাপিতানী প্রভৃতির অশ্লীল নৃত্যগীত প্রবেশ করে তাকে রুচির দিক দিয়ে বিকৃত করে তোলে। শিক্ষিত মন তখন থেকে তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁর তিনখানি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক যাত্রা রচনার ভিতর দিয়ে প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ব্যাপক ভাবে সমাজ থেকে মধ্যযুগসুলভ ধর্মভাব বিদূরিত হয়ে যাবার ফলে, এই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সার্থকতা লাভ করতে পারে নি—প্রায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই তার ধারাটি লুপ্ত হয়ে যায়। ক্রমেই বৈদেশিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের প্রভাব সর্বজয়ী হয়ে উঠতে লাগল এবং তার কোন কোন উপকরণ গিয়ে 'নতুন যাত্রা'র মধ্যে প্রবেশ করল—তখন যাত্রা আর এক নতুন পরিচয় লাভ করল—তা গীতাভিনয়।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কৃষ্ণযাত্রা পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস ফলপ্রসূ না হলেও কৃষ্ণযাত্রার অনুরূপ একান্ত সঙ্গীত-নির্ভর এক শ্রেণীর গীতিনাট্যরচনা সেযুগে আবির্ভূত হতে লাগল, তা সাধারণ ভাবে গীতাভিনয় নামে পরিচিত। কৃষ্ণযাত্রা একান্ত কৃষ্ণপ্রসঙ্গ-ভিত্তিক,

কিন্তু গীতাভিনয়ের মধ্যে সকল শ্রেণীর পৌরাণিক কাহিনীই অবলম্বন করা হোত। কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গীতের সুরে কোন বৈচিত্র্য ছিল না, প্রধানতঃ প্রচলিত কীর্তনের সুরেই তার সঙ্গীত আদ্যোপান্ত পরিবেষণ করা হোত, বাদ্যযন্ত্রের মধ্যেও মৃদঙ্গ ও মন্দিরাই তার অবলম্বন ছিল। কিন্তু গীতাভিনয়ের সঙ্গীতের ভিতর সে যুগের বিবিধ রাগরাগিণী ব্যবহৃত হোত, দেশী এবং বিদেশী সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হোত। সুতরাং তা কৃষ্ণযাত্রা অপেক্ষা অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠল। কৃষ্ণলীলার কাহিনী নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন এবং শিথিল বদ্ধ ছিল, সুপরিচিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গই তার উপজীব্য ; কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ক পুরাণকে অবলম্বন করবার ফলে গীতাভিনয়ে অতি সহজেই কাহিনীগত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হলো। বিষয়ের দৈন্য কৃষ্ণযাত্রার যে ত্রুটির কারণ হয়েছিল, তা গীতাভিনয়ের মধ্যে দূর হয়ে গেল, ক্ষীণতম বিষয়-বস্তুর পরিবর্তে বিস্তৃত কাহিনী গীতাভিনয়ের ভিত্তি হলো ; তা'তে কাহিনীর ক্রমবিকাশের ধারা ও চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ রচিত হলো। কেবলমাত্র অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তির পরিবর্তে সমাজ-জীবনের উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রচার গীতাভিনয়গুলোর লক্ষ্য হলো, সুতরাং তা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ব্যাপকতর আবেদন সৃষ্টি করবার সম্ভাবনা প্রকাশ করল। কৃষ্ণযাত্রাগুলো সংক্ষিপ্ত রচনা ছিল, কিন্তু গীতাভিনয়গুলো পঞ্চাঙ্ক নাটকের মত সুদীর্ঘ রচনা, অনেক সময় প্রয়োজন অনুসারে অঙ্কের মাত্রা আরও বেড়ে যেত এবং দীর্ঘ সময় ধরে তার বিচিত্র ঘটনার প্রবাহ অগ্রসর হয়ে যেত। সেজন্য অতি সহজেই কৃষ্ণযাত্রার পরিবর্তে তার প্রতিই সাধারণের আকর্ষণ দেখা দিল।

এ'কথা আগেই বলেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই নতুন যাত্রা শিক্ষিত জনসাধারণের সহানুভূতি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছিল। তার প্রধান কারণ, তার আঙ্গিকের কোন ত্রুটি নয়, বরং রুচির বিকার। এ'দিকে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের সখের রঙ্গমঞ্চগুলোতে যে সকল নাটক অভিনীত হচ্ছিল ; তা'তে

সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না বলে কোন নতুন কৌশল অবলম্বন করে জনসাধারণের মধ্যে নাট্যরস পরিবেষণ করবার প্রয়োজনীয়তাও কেউ কেউ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা বুঝলেন, সর্বসাধারণের মধ্যে নাটকের রস পরিবেষণ করবার পক্ষে 'নতুন যাত্রা'র আঙ্গিকই সর্বাপেক্ষা উপযোগী; অতএব তারই এক উন্নত রূপের ভিতর দিয়ে তাঁরা এই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যে অগ্রসর হলেন। তার মধ্যে কৃষ্ণযাত্রার ও 'নতুন যাত্রা'র গীত অংশকে সংক্ষিপ্ত করে তার স্থানে আধুনিক নাটকের অভিনেয় অংশের প্রাধান্য দেওয়া হল; সেজন্য তার নামকরণ করা হল গীতাভিনয়। প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রা কিংবা নতুন যাত্রার তা অবশ্যম্ভাবী ক্রমপরিণতি-রূপে অবির্ভূত হোল না, বরং প্রাচীন যাত্রা ও 'নতুন যাত্রা' উভয়েরই ভিত্তির ওপর ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকগুলোর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে তা সৃষ্ট হল। আঙ্গিকের দিক দিয়ে স্থূল দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া গেল যে, কৃষ্ণযাত্রা থেকে তার গীত, 'নতুন যাত্রা' থেকে তার নৃত্য এবং তদানীন্তন বাংলা নাটক থেকে তার সংলাপের অংশ গৃহীত হয়েছে। রসের দিক দিয়ে তা'তে প্রাচীন যাত্রার ভক্তি, 'নতুন যাত্রা'র আনন্দ ও ইংরেজী আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের কারুণ্য একসঙ্গে গৃহীত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই কবি, টপ্পা, কীর্তন, পাঁচালী, ঢপ্ প্রভৃতি সঙ্গীত মৌলিক-তার অভাবের জন্য জনসাধারণের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হোল। তখন এই সকল বিভিন্ন সঙ্গীতের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়গুলোর স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়ল—তারা ইতিপূর্বেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করছিল। তবে প্রায় এক শো বছর বাংলার রসিক সমাজের মধ্যে রস বিতরণ করে তারা যে রস-সংস্কার গড়ে তুলেছিল, তা তখনো সম্পূর্ণভাবে দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি; অতএব তারা অধঃপতনের যে স্তরেই নেমে যাক না কেন, তাদেরও পৃষ্ঠপোষক একটি সম্প্রদায় এদেশে তখনও বর্তমান ছিল। নব-পরিকল্পিত গীতাভিনয়ের মধ্যে এই সকল

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচিত্র উপকরণগুলো গিয়ে প্রবেশ লাভ করল এবং তা'তেই এই সকল বিলুপ্তপ্রায় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকদের রস-পিপাসা চরিতার্থ হোল। তা'তে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙ্গালী যে বিভিন্ন প্রকৃতির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেছিল, তাদের প্রায় প্রত্যেকটি রূপকেই কোন না কোন উপায়ে রক্ষা করা হোল। অবশ্য কবি-সঙ্গীতের মধ্যে ইতিপূর্বেই এদেশের সমসাময়িক রাগসঙ্গীতসমূহ প্রবেশ করেছিল; কবি-সঙ্গীতের ধারা খেউড়, আখড়াই, হাফ্ আখড়াই ও তর্জার ভিতর দিয়ে যখন সকল বিষয়ে অধঃপতনের শেষ স্তরে নেমে গিয়ে বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন দেশীয় সঙ্গীতের উচ্চতর ধারাগুলো গীতাভিনয়কে আশ্রয় করে কোনমতে আত্মরক্ষা কর্‌ল।

বাংলা লৌকিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে গীতাভিনয়গুলো ক্রমে এক নতুন প্রেরণার সঞ্চার করল, তার ফলে যাত্রা-রচনার ধারায় কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। গীতাভিনয়ের গীত এবং নৃত্য অংশ ক্রমে আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে আসতে লাগল এবং তাদের পরিবর্তে সংলাপ-অংশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে নাটকের যে বিকাশ দেখা গিয়েছিল, প্রধানতঃ তারই প্রভাববশতঃ গীতাভিনয়গুলো অধিকতর নাট্যধর্মী হয়ে উঠতে লাগল। সমসাময়িক বাংলা নাটকের মধ্যে সেক্সপীয়রের ক্রিয়া-বহুল নাটকগুলোর প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠল। তার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ, গুপ্ত-ষড়যন্ত্র, হত্যা, বিদ্রোহ ইত্যাদি বিষয় বাংলা নাটকের উপজীব্য হলো। গীতাভিনয়ের মধ্যে জাতীয় জীবনের আদর্শ প্রচার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং তা প্রচার করবারও একটি সুনির্দিষ্ট ধারা ছিল; সুতরাং প্রথমতঃ তারা যে আবেদনই সৃষ্টি করুক, ক্রমে তারা বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠতে লাগল।

এই যুগে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটকের রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব হয়, তাঁর রচিত পৌরাণিক নাটকগুলো দিয়ে সমসাময়িক যাত্রাগুলো প্রভাবিত হয়। তার ফলে নতুন একশ্রেণীর

যাত্রা রচিত হয়, তা সাধারণভাবে যাত্রা বলে পরিচিত হলেও পৌরাণিক যাত্রা কথাটি তাদের সম্পর্কে অধিকতর সার্থক বলে বোধ হতে পারে। 'নতুন যাত্রা'র মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের কোন স্পর্শ ছিল না, ধর্মবোধ-নিরপেক্ষ (secular) আনন্দ ও কৌতুক সৃষ্টিই তার লক্ষ্য ছিল; কিন্তু পৌরাণিক যাত্রার মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাসের ভাবটি আত্মপ্রকাশ করল। ভক্তির কথা হলেই কৃষ্ণ-ভক্তির কথা এসে যায়; কারণ, কৃষ্ণ-উপাসনা অবলম্বন করেই এই জাতির ভক্তির ভাব বিকাশ লাভ করেছে; সুতরাং পুরাণের যে অংশে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করেছে, পৌরাণিক যাত্রার তাই অবলম্বন হয়েছে। রামায়ণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদিই প্রধানতঃ পৌরাণিক যাত্রার ভিত্তি হয়েছে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক রচনার সমান্তরাল ভাবে পৌরাণিক যাত্রা রচনার ধারা অগ্রসর হয়ে গেছে; তা একদিক দিয়ে যেমন পৌরাণিক নাটকের অনুকরণের ফল, আবার অন্য দিক দিয়ে বাংলার সমাজের সমসাময়িক যুগের চিন্তা ও সাধনার বাহন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলো নাগরিক জীবনের মধ্যে সমসাময়িক বাংলার সমাজ জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচার করবার যে ব্রত গ্রহণ করেছিল, পৌরাণিক যাত্রাগুলো বাংলার সুদূর পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত পুরাণের বাণী প্রচার করবার সেই দায়িত্ব পালন করেছে। প্রাচীন পল্লী সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার ফলে সেখানে একদিন চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা বারোয়ারী তলায় যে আসর সহজেই জমে উঠে কথক ঠাকুরের মুখ থেকে পুরাণ-প্রসঙ্গ শুনতো, তা তখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, অথচ পুরাণ শোনবার যে সংস্কার এদেশের সমাজে গড়ে উঠেছিল, তা চরিতার্থ হবার আর কোন উপায় ছিল না; পৌরাণিক যাত্রাগুলো অতি সহজেই সেই স্থান অধিকার করে নিল। তারা বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের উচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রচার করতে লাগল। গিরিশচন্দ্র-প্রবর্তিত ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের

অনুকরণে তাদের সংলাপ প্রধানতঃ রচিত হোত, তবে গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তি কিংবা সর্বধর্ম-সমন্বয়বাদ সর্বদাই যে তাদের ভিতর দিয়ে প্রচারিত হোত, তা নয়; অদৃষ্টবাদ, কর্মফলে বিশ্বাস প্রভৃতির কথাও তাদের ভিতর দিয়ে শুনতে পাওয়া যেত। পৌরাণিক নাটকের মতই পৌরাণিক যাত্রাগুলোও কখনো বিয়োগান্তক হতো না, কাহিনী বিয়োগান্তক হলেও পরিণামে সকলের একটি মিলন দৃশ্য বা 'মেল্‌তা' দেখান হোত। সেই মিলন মর্ত্যলোকে সম্ভব না হলেও গোলোক কিংবা বৈকুণ্ঠ কিংবা শিবলোকেও নির্দেশ করা হোত। পৌরাণিক যাত্রাগুলো অনুসরণ করলেও বোঝা যায় যে, বাংলা নাটক যখন যে ভাব ও রূপ পরিগ্রহ করেছে, যাত্রাও তাই অনুসরণ করেছে। কারণ, দেখা যায় যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক রচনার যুগের অবসান হয়ে যখন ঐতিহাসিক ও দেশাত্মবোধক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়, সেই যুগেই যাত্রা রচনার ক্ষেত্রেও এক শ্রেণীর নতুন যাত্রার আবির্ভাব হয়—তা 'স্বদেশী যাত্রা' নামে পরিচিত।

খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই লর্ড কার্জন কৃত বঙ্গবিচ্ছেদের প্রতিবাদ স্বরূপ বাংলা দেশে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তার ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। একদিন সমাজ-সংস্কার ও ভক্তিভাবের প্রচার তার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু এই সময় দেশাত্মবোধ-প্রচারই তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠল। এই দেশাত্মবোধ প্রচার করতে গিয়ে বাংলা দেশের অতীত ইতিহাস থেকে বীর চরিত্রের অনুসন্ধান করে স্বাধীনতা রক্ষায় তাদের ত্যাগ, দুঃখ ও আত্মবিসর্জনের কথা তা'তে নানাভাবে বর্ণনা করা হোতে লাগল। এমন কি, যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কেবলমাত্র পৌরাণিক নাটক রচনার মধ্যে তাঁর জীবনের প্রায় সমগ্র অংশই নিয়োজিত রেখেছিলেন, তিনিও তাঁর চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করে তাঁর জীবনের সায়াহ্নে নতুন বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করতে আরম্ভ করলেন। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলোও সমসাময়িক বাংলার

সমাজের মধ্যে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করল। বাংলার যাত্রাগুলো স্বভাবতঃই তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারল না। আগেই বলেছি, সমসাময়িক নাটক থেকেই যাত্রাগুলো সর্বদা প্রেরণা লাভ করেছে ; সুতরাং তখনও দেশাত্মবোধক নাটকগুলোর অনুকরণে যাত্রা রচিত হোতে আরম্ভ করল। একদিন যাত্রার আসর কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণ, ভীমার্জুনই অধিকার করেছিল ; কিন্তু নতুন যুগে প্রবেশ করে ঐতিহাসিক চরিত্রও তার লক্ষ্য হয়ে উঠল। এই ঐতিহাসিক চরিত্রের সূত্র ধরেই ক্রমে তা'তে সামাজিক চরিত্রের আবির্ভাবের সূচনা দেখা দিল। তখন আর কেবল পৌরাণিক চরিত্র নয় ; এমন কি, ঐতিহাসিক চরিত্রও নয়, আমাদের চারদিককার সমাজের নরনারীও তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল। স্বদেশী যুগের যাত্রায় প্রধানতঃ ঐতিহাসিক চরিত্রই স্থান লাভ করলেও স্বদেশী আন্দোলন ক্রমে স্থিতি লাভ করে যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হোল, তখন তা'তে সাধারণ মানুষের নানা সমস্যার কথাও নানাভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। একদিন এই শ্রেণীর যাত্রায় মহাপুরুষের জীবন-কথা কীর্তিত হয়েছে ; কিন্তু ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের জীবনও তার বিষয়ীভূত হল।

এই যুগে একজন শ্রেষ্ঠ যাত্রা-রচয়িতার জন্ম হয়, তাঁর নাম মুকুন্দ দাস। তিনি বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশী যাত্রার লেখক। শুধু তাই নয়, তিনি সুগায়ক, উত্তম অভিনেতা ও স্বয়ং যাত্রাদলের পরিচালক ছিলেন। যাত্রাগানের ভিতর দিয়ে দেশাত্মবোধের বাণী তিনি বাংলার দূরতম পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। কেবল রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামই তাঁর যাত্রা রচনার বিষয় ছিল না, সমাজ-সংস্কারও তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশী যাত্রার ধারা এক প্রকার লুপ্ত হয়ে গেছে। কেবলমাত্র স্বদেশী যাত্রাই নয়, যাত্রার ওপর একদিকে কোলকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ ও অন্য দিকে চলচ্চিত্রের প্রভাব পড়তে লাগল ; তার ফলে যাত্রা বর্তমানে সকল বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। তবে যাত্রার অনেক উপকরণ বাংলা নাটকের মধ্যে এখনও বেঁচে আছে।

স্বদেশী যাত্রা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা থেকে ভক্তির ভাব দূর হয়ে গেল ; এমন কি, এতদিন পর্যন্ত যে রামায়ণের দলে একজন মাত্র গায়েন ৩।৪ জন দোহারের সহায়তায় রামায়ণের এক একটি অংশ দিনের পর দিন পরিবেষণ করে যেত, তাঁর সেই দল ভেঙে গিয়ে রামযাত্রার দল গঠিত হল। তা'তে হনুমানের বেশ ধারণ করে অভিনেতাকে আসরে আবির্ভূত হতে হোত। ভক্তির ভাব দূর হয়ে গিয়ে তার মধ্যে কৌতুকের ভাব প্রাধান্য লাভ করল। এইভাবে চণ্ডীমঙ্গলের দল ভেঙে চণ্ডীযাত্রার দল তৈরী হল। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীরই সর্বাপেক্ষা দুর্গতি দেখা দিল। কাহিনীর কারুণ্য ও উচ্চ নৈতিক আদর্শ বিসর্জিত হয়ে তার যাত্রারূপ ভাসান-যাত্রা হাস্যরসের ভাণ্ডার হয়ে উঠল। তার চরিত্রগুলো অক্ষম অভিনয় ও অযোগ্য বেশভূষা দিয়ে কাহিনীকে কদর্য শৈবালে আচ্ছন্ন করে দিল। অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষিত দর্শকের মন তাদের ওপর নিতান্ত বিরূপ হোয়ে উঠল।

সাম্প্রতিক কালে যাত্রার পুনরাবির্ভাব হয়েছে বলে মনে হতে পারে ; কিন্তু আঙ্গিক এবং বিষয়-বস্তুর দিক থেকে তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। এখন যাত্রার বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ সামাজিক ; সেইজন্য এগুলোকে সামাজিক যাত্রা বলা হয়। কোন কোন সময় অর্থনৈতিক বিষয়ও তার অঙ্গীভূত হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে যে সকল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা প্রাধান্য লাভ করেছে, সাম্প্রতিক যাত্রার মধ্যেও তার প্রভাব দেখা যায়। যাত্রা চিরকালই সমসাময়িক জন-রুচি অনুসরণ করেই বিকাশ লাভ করেছে, সাম্প্রতিক কালেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না ; তবে আধ্যাত্মিক বিষয় এখনও কোন কোন সময় তার অবলম্বন হয়ে থাকে। আঙ্গিকের দিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সকল উপকরণই তা থেকে লুপ্ত হয়েছে। সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চের প্রভাব তা'তে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

বাংলা নাটকের উদ্ভব

আধুনিক বাংলার নাটক ও নাট্যশালার উদ্ভবের সঙ্গে একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী রুশদেশীয় মনীষীর নাম যুক্ত হয়ে আছে; তিনি গেরাসিম স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফ (Geracim Stepanovich Lebedeff)। তিনি ১৭৪৯ সন থেকে ১৮১৭ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এক অত্যন্ত উদার মনোভাব নিয়ে তিনি আধুনিক ভারতের সর্বপ্রথম রুশ-ভারতীয় মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করেছিলেন, রুশদেশে ভারতীয় জ্ঞান-বিদ্যার বিষয় অনুশীলন করবার প্রথম সোপান রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়িক বুদ্ধিও ছিল না, বরং তিনি প্রকৃত সত্যসন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে ভারতীয় তত্ত্ব এবং তথ্য সেদিন স্বদেশবাসীর কাছে যথাযথভাবে পরিবেষণ করে রুশ দেশের নিকট ভারতবর্ষকে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর বিস্তৃত জীবনের বহুমুখী কর্মধারার পরিচয় দেওয়া এখানে অনাবশ্যক, কেবলমাত্র বাংলা নাটক ও নাট্যশালার উদ্ভবের মূলে তাঁর যে বিশিষ্ট দান ছিল, তাঁরই কথা এখানে কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

গেরাসিম লেবেডেফ ১৭৮৫ সনে সর্বপ্রথম এসে ভারতের উপকূলে পৌঁছোন। প্রথমতঃ দু'বছর মাদ্রাজ শহরে অতিবাহিত করে ১৭৮৭ সনে তিনি কোলকাতায় এসে উপস্থিত হন। তারপর সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল একাদিক্রমে তিনি কোলকাতা শহরেই বাস করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের কোলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক রাজধানী শহররূপে গড়ে উঠ্ছে। গেরাসিম তার সেদিনকার সাংস্কৃতিক জীবনের রূপটি গভীর ভাবে লক্ষ্য করে তার পরিপুষ্টিকল্পে স্বোপার্জিত অর্থ ও শ্রম নিয়োগ করবার কাজে অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং এই বিষয়ে যে সব

দুঃসাহসিক কাজে অগ্রবর্তী হয়ে গেলেন, বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা তাদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান।

একজন রুশদেশের প্রতিভাবান্ অধিবাসী কেন যে নাগরিক জীবনের সাংস্কৃতিক রূপকে দৃঢ়মূল করবার উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে প্রথমই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়েছিলেন, তা রাশিয়ায় এসে নিজের চোখে রাশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের রূপটি প্রত্যক্ষ না করলে বুঝতে পারা যায় না। রাশিয়ার নাগরিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নাট্যশালা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যশালা মস্কোর বলশয় থিয়েটার, মস্কো আর্ট থিয়েটার, লেনিনগ্রাডের কিরোভ থিয়েটার সবই রাশিয়ার জাতীয় সংস্কৃতির পরম গৌরব। সুতরাং লেবেডেফ যখন কোলকাতায় এসে তার সেদিনকার সাংস্কৃতিক রূপটি প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তার মধ্যে অন্য সব দেশীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দেখতে পেলেন সত্য, কিন্তু লেবেডেফের নিজস্ব জাতীয় গৌরব যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং যার সঙ্গে স্বভাবতঃই তার অন্তরের সুনিবিড় যোগ ছিল, তার কোন দেশীয় রূপ এখানে দেখতে পেলেন না। কোম্পানির থিয়েটার কোলকাতায় সেদিন ছিল সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে বাঙ্গালী সমাজের কোন সম্পর্ক ছিল না; ইংরেজ অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহায়তায় ইংরেজি নাটক তা'তে ইংরেজ দর্শকের সামনে অভিনীত হোত, তা'তে দেশীয় জনসাধারণ প্রবেশাধিকার পেত না। সুতরাং তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবার তাদের কোন উপায় ছিল না। একটি অত্যন্ত উদার দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে লেবেডেফ্ তা লক্ষ্য করলেন এবং নিজে রুশ দেশীয় হয়েও এবং রুশ দেশ নাট্য সংস্কৃতিতে এত সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়ে নিজস্ব সকল জাতীয় অভিমান বিসর্জন দিয়ে দু'খানি ইংরেজি নাটক নিজের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে বাংলায় অনুবাদ করতে অগ্রসর হলেন। তারপর বাঙ্গালীর জন্য নিজস্ব একটি নাট্যশালা নির্মাণ করে তার ভিতরে বই দুইখানি অভিনয় করবার দুরূহ সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। কেবলমাত্র বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের

পরিপুষ্টির সহায়তা ছাড়া এই বিষয়ে আর তার কোন ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় স্বার্থ ছিল না। বিজয়ী জাতি ইংরেজের বিজিত জাতি বাঙ্গালীর ওপর যেমন একটি স্বাভাবিক প্রভুত্ববোধ ছিল, গেরাসিমের স্বভাবতঃই তা ছিল না; নিজের সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলেই দেশান্তরের সংস্কৃতি-রূপের একটি বিশেষ দৈন্য দূর করবার জন্যই তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন না, বরং কোম্পানীর শাসক সম্প্রদায়ই ব্যবসায়ী ছিল; সুতরাং কেবলমাত্র সংস্কৃতির স্বার্থ রক্ষার জন্য গেরাসিম যে ভাবে এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করেছিলেন, ইংরেজের সেদিন সেই ভাবে এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করার সাধ্য ছিল না। তাই গেরাসিমের এই বিষয়ক আগ্রহ যেমন আন্তরিক হয়ে উঠবার সুযোগ পেল, তা অন্য কোন দিক থেকে হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

গেরাসিম স্বয়ং বেহালা বাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ইতিপূর্বেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ভারতবর্ষেরও কোন কোন অংশে তাঁর এই বিষয়ক গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর মধ্যে অন্য একটি পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল। কারণ, বাংলাদেশে এসে তার ভাষা, সাহিত্য এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে তিনি এমন কোন কোন বিষয়ের সন্ধান পেলেন, যা থেকে তিনি তার সাংস্কৃতিক জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে একটি বিশ্বাস গড়ে তুলেছিলেন। তাই তিনি একটি অত্যন্ত দুরূহ কার্যে সেদিন অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। গেরাসিম কোলকাতা এসে প্রথম থেকেই বাংলা ভাষা শিখতে লাগলেন; সাধুভাষা এবং চলতি ভাষা উভয় রীতির সঙ্গেই তিনি পরিচিত হলেন। তারপর ক্রমে সংস্কৃতও শিখলেন। সংস্কৃত ভাষা শিখে এ দেশের জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পুরাণগুলোও কিছু কিছু পড়লেন। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনি সে-যুগের ইংরেজ রাজকর্মচারী ছিলেন না, সুতরাং রাজকর্মচারীরা সেদিন দেশীয় পণ্ডিত লোকদের কাছ থেকে যে ভাবে সুবিধা গ্রহণ করবার সুযোগ নিতেন, তিনি সে ভাবে তা

নিতে পারেন নি; তাঁকে নিজের প্রচুর অর্থব্যয় করে নানা অসুবিধার ভিতর দিয়ে এই দুরূহ জ্ঞানান্বেষণের কার্যে অগ্রসর হতে হয়েছিল। এই কার্যে যে সব পণ্ডিত সেদিন তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গোলোকনাথ দাস, জগমোহন বিদ্যা-পঞ্চানন এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকেই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁরা শিক্ষক ও অধ্যাপকের কাজ করতেন। সুতরাং দেখা যায়, গেরাসিম ভারতীয় বিষয়-সমূহ অধ্যয়ন করতে গিয়ে এই বিষয়ে সব চাইতে নির্ভরযোগ্য অবলম্বনকেই আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে নিজের অধ্যবসায় যুক্ত হয়েছিল বলে এই সকল বিষয়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অধিকার লাভ করেছিলেন।

বাংলা ভাষায় যখন গেরাসিমের যথেষ্ট অধিকার হয়েছে বলে তাঁর মনে হলো, তখন তিনি 'দি ডিস্‌গাইজ' এবং 'দি লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' নামে দু'খানি ইংরেজি প্রহসন বাংলায় অনুবাদ কর্‌লেন। ইংরেজি ভাষা থেকে নাটক দু'খানি নির্বাচন করার মধ্যেও তাঁর চরিত্রের বিশেষ একটি দিকের পরিচয় পাওয়া গেল; তাঁর যদি নিজের জাতি ও ভাষা সম্পর্কে কোন গোঁড়ামি থাকত, তবে তিনি স্বচ্ছন্দেই কোন রুশ নাটকের বাংলা অনুবাদ কর্‌তে পারতেন এবং সে-কাজ তার পক্ষে আরও সহজ হোত। কারণ, উক্ত নাটক দু'খানির মূল ইংরেজি ভাষা এবং বাংলা ভাষা কিছুই তাঁর নিজস্ব ভাষা নয়। সুতরাং রুশ ভাষার মূল গ্রন্থ হলে তিনি যে সুযোগ পেতেন, ইংরেজি মূল থেকে তিনি তা পেতে পারেন নি। এই বিষয়ে তাঁর যে একটি অত্যন্ত উদার এবং সংস্কারমুক্ত মনোভাব ছিল, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। *The Disguise* নামে যে ইংরেজি নাটক তিনি অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেছিলেন, তা কোন সুপরিচিত ইংরেজ নাট্যকারেরও রচিত নয়, *The Love is the Best Doctor*-ও তাই; তবে কেউ মনে করেছেন, তা' ফরাসী প্রহসন রচয়িতা মলিয়ারের কোনও রচনা হতে পারে; কিন্তু তাঁর অনুবাদখানি পাওয়া

যায় নি' বলে এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বল্‌বার উপায় নেই। *The Disguise* নাটকটির বাংলা অনুবাদ থেকে দেখতে পাওয়া যায়, তিনি যে কেবলমাত্র আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, তা নয়। এক দেশের রস-বস্তু অন্য দেশের ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করার মধ্য দিয়ে যে তার সার্থকতা তা নয়, তা যদি দেশের রস-সংস্কারের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হয়, তবেই তার সার্থকতা দেখা দিতে পারে; এই উদ্দেশ্যেই তিনি সমসাময়িক কোলকাতার নাগরিক সমাজের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে তা'তে কতকগুলো দেশীয় প্রকৃতির চরিত্র সন্নিবিষ্ট করেছেন। মূল কাহিনীটি প্রহসন শ্রেণীর ছিল বলে নতুন চরিত্র-গুলোও প্রহসনধর্মী করে পরিকল্পনা করেছেন। চৌকিদার, খুনিয়া, মুহুরি, 'গাউয়্যা', 'বাজিয়্যা', 'নাচিয়্যা' নাটকের এই সকল লঘু চরিত্র সেদিনকার কোলকাতার সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় সৃষ্ট হয়েছে।

গেরাসিম লিখেছেন যে, নাটক দু'টি অনুবাদ করবার পর, তিনি দেশীয় পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে তাঁদেরে তাঁর রচনা শোনান এবং তাঁরা তা গভীর ভাবে বিচার করে তাঁদের অনুমোদন জানান। When my translation was finished I invited several learned Pandits who persued the work very attentively,........ After the applause of the Pundits............

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, গেরাসিমের আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাঁর অনুবাদ-কার্যের মধ্যে তাঁর আত্মবিশ্বাসের শক্তি যত সক্রিয় ছিল, বাংলা ভাষার জ্ঞান তত গভীর ছিল না; অবশ্য তা থাক্‌বার কথাও নয়। তাঁর *The Disguise* নাটকের বাংলা অনুবাদের যে কোন অংশ লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, তা আদর্শ বাংলা গদ্য ভাষায় রচিত নয়। গেরাসিম এই বিষয়ে নিজের বুদ্ধি দিয়ে যতদূর পরিচালিত হয়েছেন, দেশীয় পণ্ডিতদের উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে ততদূর পরিচালিত হন নি। তাঁর অনুবাদের একটু দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যাবে।

প্রথমতঃ তিনি *The Disguise* শব্দটির বাংলা অনুবাদ সাধারণ কথা 'ছদ্মবেশ' শব্দটির পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন, 'কাল্পনিক সংবদল'। তারপর ইংরেজি Act শব্দটির সাধারণ সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত 'অঙ্ক' শব্দটি গ্রহণ না করে, তিনি তার পরিবর্তে 'ক্রীয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। Scene শব্দটিকে 'ব্যক্ততা' বলে অনুবাদ করেছেন। তারপর তাঁর অনুবাদের ভাষারও এই নিদর্শন পাওয়া যায়—

[নানান বাজিয়্যারা ভিন্য ভিন্য পোসাখেতে আর আর মখসের কাব্য করেন জানালার সম্মুখে।]

ভাগ্যবতি : [বাজীয়ারদিগকে কয়।] মহাসএরা, এই ভাল! ঠাকুরানি তুষ্ট হইয়াছেন স্থনিয়া আর উঁনি বলেন আমার-(তোমার)-দিগকে জাইতে। স্থভ হউক। [বাজীয়ারা গেল।] ভাল, আমি প্রাত্থনা করি জে এই আয়জন ফুরিয়াছে। আমি নিতান্ত উঁতপাতগ্রহস্ত ছিলেম। সে কি নিমিত্থে! কিবল একটি মনুস্যর কারন। পশ্চাত তারে পাইলে কিছু মল্য তবে ঠাহঁরিবেন না! একটি স্বামির নিমিত্থে। ও কি দুর্দসা এ, তা আমি জানি বিলক্ষণ রুপে। রাম বল! রক্ষা পাই—কি চমৎকার আকার এ আসিতেছে এখানে এবং কথা কহিতেছে আপনা-আপনি। এ বুঝী —। জা হউক, আমি সাহস করিয়া খানিক দেখি উহাকে, সতর্ক হই উহাকে।

[ভাগ্যবতি (ঘোম্‌টা দিয়া লুকায়) ঘোম্‌টা টেনে দীলে। প্রবেস হইল রামসন্তোষ গোঁপের সহিত, জামা গায়, তোগ, টুপি পাখনা দেয়া। মৌজে বেড়ায়।] —১।১

তখনও বাংলা সাহিত্যে গদ্যভাষার জন্ম হয় নি, এ কথা সত্য; কিন্তু তথাপি সাধারণের জন্য মৌখিক প্রচলিত যে গদ্যভাষা ছিল, তার সঙ্গেও তার কিছুমাত্র যোগ স্থাপিত হতে পারে নি। সুতরাং দেশীয় পণ্ডিত সমাজ যে গভীর ভাবে বিচার করে এই রচনা অনুমোদিত করেছিলেন, তা মনে করা কঠিন হতে পারে। কারণ, তা'তে ইংরেজি শব্দ-বিন্যাস রীতি (Syntax) অনুযায়ী যে সকল বাক্য

রচনা করা হয়েছে, তা' দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সমর্থন করবার কথা নয়। তখনও সাহিত্যিক গদ্যভাষার উদ্ভব না হলেও দলিল এবং চিঠিপত্রে এক শ্রেণীর যে গদ্য ভাষার ব্যবহার হোত, এই গদ্য তার কোন ধর্মই স্বীকার করে নি। সুতরাং পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদনের কথা উল্লেখ করা হলেও এই অনুবাদ যে গেরাসিমের নিজস্ব রচনা, তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং তার কৃতিত্ব কিংবা ব্যর্থতার সকল দায়িত্বও তাঁরই; দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর এ' বিষয়ে কোন দায়িত্ব আছে বলে মনে হয় না।

অনুবাদের এই ভাষা থেকে বুঝ্‌তে পারা যায়, কোন লিখিত আদর্শের অভাবে তখনকার কোলকাতার সাধারণ লোকের মুখে গদ্য ভাষা শুনেই গেরাসিম বাংলা কথ্যভাষার আদর্শ রূপটির সন্ধান করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি'। সে বিষয়ে আরও নানা অসুবিধাও সেদিন ছিল। কোলকাতা অঞ্চলেও অখণ্ড একটি আদর্শ কথ্যভাষার রূপ তখনও গড়ে উঠেনি। সেইজন্য গেরাসিম তা' অনুসরণ করবার সুযোগ পান নি। তবে কথ্যভাষায় নাটকীয় সংলাপ রচনার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তা তিনি উপলব্ধি করে, এই বিষয়ে তাঁর যতটুকু জ্ঞান ছিল, ততটুকুই তিনি কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে জ্ঞান যে তাঁর নিতান্ত পরিমিত ছিল, তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

যদিও গেরাসিম লিখেছেন যে, নাটক দু'টি অনূদিত হবার পর তাঁর বাংলা শিক্ষক গোলোকনাথ দাস *The Disguise* নাটকের অনুবাদটি মঞ্চস্থ করবার পরামর্শ দেন, তথাপি মনে হয়, মঞ্চস্থ করবার সঙ্কল্প নিয়েই গেরাসিম তাঁর অনুবাদ দু'খানি রচনা করেছিলেন, নতুবা কেবলমাত্র নাটক দু'খানি তাঁর পক্ষে সেদিন অনুবাদ করবার কোন অর্থ থাকৃতে পারে না; বিশেষতঃ সে অনুবাদ যখন মুদ্রিত হবারও কোন উপায় ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত তা হয়ও নি। সুতরাং এ কথা মনে করা যায়, নাটক দু'খানি মঞ্চস্থ করার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের অনুবাদ করেছিলেন; এ বিষয়ে গোলোকনাথের কথা যে

তিনি উল্লেখ করেছেন, তা তাঁর লৌকিক সৌজন্য প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

The Disguise নাটকের অনুবাদটির অভিনয় হবার আয়োজন হতে লাগল। তখন ১৭৯৫ সনের নভেম্বর মাস। কোলকাতায় তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি নিজস্ব রঙ্গালয় ছিল। কোম্পানির মালিকেরা গেরাসিমের এই প্রচেষ্টাকে তাঁদের প্রতিযোগিতা-মূলক অনুষ্ঠান বলে মনে করলেন। সুতরাং নিজেদের ব্যবসায়ের দিক থেকে তাঁরা তার উদ্দেশ্যকে অভিনন্দিত করে নিতে পারলেন না, বরং এই বিষয়ে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে লাগলেন। অভিনয়ের জন্য যে অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল, তা তিনি তখনকার গবর্ণর জেনারেলের কাছ থেকে সংগ্রহ কর্‌লেন; কিন্তু নিজের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হবার আগ পর্যন্ত অন্য রঙ্গমঞ্চের অভাবে তিনি কোম্পানির রঙ্গমঞ্চটি ভাড়া নিয়ে নাটক অভিনয় করবার যে সঙ্কল্প করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয়ে গেল। কোম্পানির রঙ্গমঞ্চের কর্মকর্তারা তাঁকে রঙ্গমঞ্চ ভাড়া দিতে অস্বীকৃত হলেন এবং যাতে তাঁর সঙ্কল্প সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হয়, তার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু গেরাসিমের চরিত্র অন্য উপাদানে গঠিত ছিল, তিনি কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করলেন না; নিজের রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের কাজ দ্রুততর করে তুল্‌তে লাগলেন। অবশেষে তাঁর স্বপ্ন সফল হলো। তিনি বাংলাদেশে বাংলা নাটকের জন্য রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন করলেন। কোলকাতার অধুনা বিলুপ্ত ২৫নং ডুমতলা ষ্ট্রীটে (বর্তমান এজরা ষ্ট্রীট) Bengallie Theatre প্রতিষ্ঠিত হল এবং ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর তা'তে বাংলায় রচিত বাঙ্গালী অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে আধুনিক বাংলার প্রথম নাটকের অভিনয় হলো। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার রঙ্গমঞ্চ আজ যে মর্যাদায়ই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতটুকু এইভাবে যে একজন বিদেশী আমাদের জাতির সামনে সর্বপ্রথম দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তা' বিশেষ ভাবে স্মরণ করবার যোগ্য।

নিজের চেষ্টায় ও যত্নে তৈরী বেঙ্গলী থিয়েটারে গেরাসিম দুই রাত্রি তাঁর অনূদিত 'কাল্পনিক সংবদল' (*The Disguise*) নাটকটির অভিনয় করালেন। দ্বিতীয় অভিনয় হলো প্রথম অভিনয়ের প্রায় চার মাস পর—২১শে মার্চ, ১৭৯৬ সন। প্রথম দিনের অভিনয়ে নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশিত হতে পারেনি ; মাত্র একটি অঙ্ক অভিনীত হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে তিনটি অঙ্ক অভিনীত হয়ে নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পেল। তার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে দেশীয় এবং বিদেশীয় পুরুষ এবং মহিলা যেমন ছিল, তার বাদ্যভাণ্ডে (Orchestra)-র মধ্যেও দেশীয় এবং বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। দেশীয় এবং বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্র দিয়ে বাদ্যভাণ্ড (Orchestra) রচনা করবার প্রয়াসও এ দেশে এই প্রথম। পরবর্তী কালে যাত্রা এবং রঙ্গমঞ্চে এই ধারা বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্তও তা অব্যাহত আছে।

দু'দিনের অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গেরাসিম নাটকটি পুনরায় অভিনয় করবার সঙ্কল্প করে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলেন, তা'তে তিনি এমন আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, 'for the express purpose of enlivening the scene will be introduced some select Bengallie songs, adopted to, and accompained by European Instruments : and since he has enlarged the peformance to three complete acts, and taken particular pains to instruct all the actors and actresses in their assigned parts, he humbly confides that increased amusement will be now afforded to every auditor. এই বিজ্ঞপ্তির গেরাসিম কৃত একটি বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রতিপক্ষের শত্রুতার জন্য গেরাসিমের এই নাটকটির তৃতীয় বার অভিনয়ের প্রয়াস ব্যর্থ হোল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রঙ্গমঞ্চের

দৃশ্যপট যিনি আঁকতেন, তিনি এক গুপ্ত অভিসন্ধি নিয়ে গেরাসিমের দলে যোগদান করলেন, তারপর তার কৌশলে গেরাসিমের দলের সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী একে একে তাঁর দল ছেড়ে চলে গেল। তাদের এভাবে দল ছেড়ে যাবার কোন অধিকার ছিল না; কারণ, তারা সবাই গেরাসিমের সঙ্গে চুক্তিপত্রে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং গেরাসিম এ'দের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেখানেও কোম্পানির রঙ্গমঞ্চের উদ্যোক্তাদের চক্রান্তে কোন ইংরেজ ব্যবহারজীবীই রুশ নাট্যানুরাগীর পক্ষ সমর্থন করে মকদ্দমা চালাতে রাজি হলো না। গেরাসিম নিরুপায় হয়ে পড়লেন; নিজের ঐকান্তিক যত্ন এবং চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র ইংরেজের ষড়যন্ত্রে সেদিন তাঁর সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়ে গেল। তিনি আর্থিক দিক থেকেও গভীর ক্ষতিগ্রস্ত হলেন; যে সকল মঞ্চোপকরণ বহু মূল্য দিয়ে তিনি ক্রয় করেছিলেন, কিংবা বহু ব্যয় করে নিজে তৈরী করেছিলেন, তা' তিনি সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেন। কোম্পানির হীন ষড়যন্ত্রের জন্যে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিরাট সম্ভাবনা সেদিন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। নিঃস্ব এবং ভগ্নোদ্যম হয়ে গেরাসিম সেদিন লণ্ডনের রুশ রাজদূতের কাছে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবার জন্য যে করুণ আবেদন জানিয়ে ছিলেন, তার সেই আবেদন-পত্রের আংশিক বঙ্গানুবাদ এই প্রকার:

'আপনার অনুগ্রহ পেলে আমি লোভী ও কুখ্যাত ব্যবসাদার ও নীচস্বভাব (ইংরেজ) রাজকর্মচারীদের কবল থেকে রক্ষা পাই। এই কর্মচারীদের মিথ্যা ও কুৎসিত আচরণ অন্য দেশের মানুষ ও দেবতার নিকট সমানই ঘৃণার বিষয়।......আমি আমার পিতৃভূমির প্রতি অনুরাগ বশতঃ বাংলা ভাষায় যে গ্রন্থ রচনা করেছি, এবং বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যে সব বাংলা গ্রন্থের অনুবাদ করেছি, তা আমাকে আপনার পুত্র জ্ঞান করে আমার দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করতে আপনি সাহায্য করবেন'। ('দেশ, সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৬২ সাল দ্রষ্টব্য।)

গেরাসিমের মত একজন স্বার্থবুদ্ধিহীন শিল্পীর মনে সেদিন কোম্পানির ইংরেজ শাসক ও ব্যবসায়ীদের হৃদয়হীন ব্যবহার যে কি কঠিন আঘাত দিয়েছিল, তা তাঁর এই পত্রটির আরও নানা অংশ থেকে জানতে পারা যায়।

গেরাসিম বাংলা ভাষার অনুশীলন করতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি কেবলমাত্র যে নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, 'তা' নয়; তিনি একটি উন্মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে সেদিনকার বাংলা ভাষার সকল বিষয়ই গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তখনও মধ্যযুগের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি অন্নদা-মঙ্গল রচয়িতা ভারতচন্দ্রের কাব্যের অপ্রতিহত প্রভাব, তিনি তাঁর কাব্যখানিও রুশভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তার পুঁথি মস্কোর Central State Historical Archives of the USSR-এ সংরক্ষিত আছে। গেরাসিম একখানি ব্যাকরণের বই লিখেছিলেন, তার নাম *The Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* (১৮০১), একখানি জাতিতত্ত্ব মূলক বই লিখেছিলেন—*An Impartial contemplation of the East Indian System of Brohmins* (১৮০৫), *A collection of Indosthani and Bengali Aryas* (?)। তিনি বাংলা পাটিগণিতের একটি রুশ অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন; তা লেনিনগ্রাডের প্রাচ্য বিদ্যাভবনের (Oriental Institute) ভারতীয় বিভাগের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। মস্কো State Historical Archives-এ তাঁর স্বহস্তলিখিত বহু কাগজপত্র রক্ষিত আছে। এই রুশ মনীষী আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপনের মুহূর্তে তাঁর উদার দৃষ্টি, সুগভীর বৈদগ্ধ এবং সংস্কার-মুক্ত শিল্পিমন নিয়ে যে এ'দেশের মাটিতে এসে পদার্পণ করেছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁর শক্তি এবং সাধনাকে নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়েও নিয়োজিত করেছিলেন, সেজন্য আমাদের প্রত্যেক দেশবাসীই তাঁর কাছে গভীর এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

কিন্তু গেরাসিম সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে যদি তাঁর পথে চলবার সুযোগ পেতেন, তাঁকে যদি তাঁর সঙ্কল্প অসম্পূর্ণ রেখেই ভগ্নোদ্যম হয়ে দেশে না ফিরতে হোত, তবে তিনি সেদিন থেকেই বাংলা নাটক রচনা ও তার অভিনয়ের যে ধারা রচনা করবার সুযোগ পেতেন, তা অব্যাহত ভাবে পরবর্তী কাল পর্যন্তও চলে আসতে পারত। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ ছিল বলেই তিনি বাংলা নাটক রচনা কিংবা তার অভিনয়ের বিষয়ে এদেশে কোন উত্তরাধিকার সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি; তাঁর ধারা অল্পদিনেই লুপ্ত হয়ে গেল এবং বহুকাল পর্যন্ত তার নাম বাঙ্গালী পণ্ডিত সমাজ বিস্মৃত হয়ে রইল। মাত্র সাম্প্রতিক কালে তাঁর সম্পর্কে নানা মূল্যবান্ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় যে নাটক রচনার ধারা প্রচলিত ছিল, বাংলা দেশও তার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না; কিন্তু তা' সত্ত্বেও দেখতে পাওয়া যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নতুন করে যে বাংলা নাটক রচনার ধারা প্রবর্তিত হলো, তার সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এমন কি, বাংলা দেশেও লোক-নাট্য রচনার যে ধারা প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন বাংলা নাটক কোন সম্পর্ক স্থাপন করে উঠ্‌তে পারে নি। ইংরেজী নাটক, বিশেষতঃ সেক্সপীয়রের নাটকগুলোর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম হয়েছিল, একথা সত্য; কিন্তু তা হলেও ক্রমে লোক-নাট্যের বহু উপকরণ গিয়ে তার মধ্যেও প্রবেশ করেছিল। তবে সংস্কৃত নাটকের কোন প্রভাবই তার মধ্যে অনুভব করা যায় না। ইংরেজির সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে সেদিন বাংলা নাটক রচনার সূচনা হলেও সেদিন সংস্কৃত নাটক অনুবাদ রচনারও একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তার ফলেই সে যুগে প্রায় সকল সংস্কৃত নাটকেরই বাংলায় অনুবাদ এবং তাদের মধ্যে কোন কোন নাটকের অভিনয় পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজির অনুবাদই হোক, কিংবা

সংস্কৃতের অনুবাদই হোক, তাদের কারো মধ্য দিয়ে মৌলিক নাটকের রস ফুটিয়ে তোলা আদৌ সম্ভব হয় নি। এই যুগে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে এদেশে সংস্কৃত নাটকের পুনরভ্যুদয় দেখা দিয়েছিল মাত্র। কোন কোন নাট্যকার সংস্কৃত নাটকের রসপাত্রে বাংলা নাটক পরিবেষণ করতে গিয়ে বাঙ্গালী জীবনের কোন কোন বিচ্ছিন্ন দিককে সার্থক বস্তুরূপ দান করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ একান্ত মূলানুগ হওয়ার ফলে, তা বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তে যথার্থ নাট্যরস জাগ্রত করতে সক্ষম হয় নি। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় শখের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা নাটকের অভাব অনুভূত হয়। এই অভাব পূর্ণ করবার জন্য প্রথমতঃ সংস্কৃত নাটকেরই দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ দিয়ে এই অভাব যে পূর্ণ হতে পারে না, তাও অল্প দিনের মধ্যেই সকলে অনুভব করতে সক্ষম হলেন। সেজন্য কেউ কেউ মৌলিক নাটক রচনা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এইভাবে মৌলিক নাটক রচনার দুটি ধারার উদ্ভব হলো—প্রথমতঃ পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে একটি ধারা এবং দ্বিতীয়তঃ সে সময়কার সমাজের সাময়িক ত্রুটি-বিচ্যুতি অবলম্বন করে অপর একটি ধারা। প্রথমোক্ত শ্রেণীর নাটকের মধ্যে গুরু-বিষয়ের অবতারণা থাকলেও, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর নাটক নিতান্ত লঘু-বিষয়ক ছিল; তা সাধারণতঃ প্রহসন বলেই পরিচিত হোত। এই সকল নাটক ও প্রহসনের মধ্যে জীবনের যে রূপ প্রতিবিম্বিত হোত, তা বহুলাংশে কৃত্রিম এবং অতিরঞ্জিত হলেও তাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সজীব প্রাণের স্পন্দনও মধ্যে মধ্যে অনুভব করা যেত।

সামাজিক নাটক বলতে সেই যুগে কেবলমাত্র প্রহসন ও সামাজিক অব্যবস্থার চিত্র মাত্র ছাড়া আর কিছুই বুঝাত না। তার কারণ, ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে আসবার প্রথম অবস্থায় এদেশের সমাজের সংহত রূপটির উপর কঠিন আঘাত লেগেছিল। তা'তে সমাজের বাইরের দিকটি উচ্ছল হয়ে উঠে তার অন্তরের রসরূপটিকে

আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ; সেজন্য তখন বাংলার সমাজের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে তা থেকে তার রস-পরিচয়টি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। সমাজ বল্‌তে তখন সমাজের ত্রুটিগুলোই সর্বপ্রথম চোখের উপর ভেসে উঠ্‌ত। রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলার প্রত্যেক মনীষী বিভিন্ন দিক থেকে বাংলার সমাজের ত্রুটিগুলো জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তার ফলে এদেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই সেগুলো নিয়ে নানা দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। বাংলার প্রথম যুগের নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে তারও অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা কেবলমাত্র বাংলার সমাজের দোষত্রুটিগুলো অবলম্বন করেই যে প্রথম যুগের বাংলার সামাজিক প্রহসন বা নাটকগুলো রচিত হোত, তা নয়—প্রায় একশো বছর পাশ্চাত্ত্য সাহচর্যের ফলে পাশ্চাত্ত্য সমাজের যে সকল দোষত্রুটি বাংলার সমাজদেহে প্রবেশ করেছিল, তাদের কুফলগুলোও ইতিমধ্যেই জনসাধারণের দৃষ্টিতে প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাও তখন বাংলার সামাজিক প্রহসনগুলোর অবলম্বন হলো। বলা বাহুল্য, এই সকল বিষয়বস্তু নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার প্রয়াস প্রথম অবস্থায় অনেক দিন পর্যন্ত দেখা যায় নি। কতকগুলো অতিরঞ্জিত চিত্রের সহায়তায় প্রধানতঃ কথোপকথনের ভঙ্গিতে বিষয়গুলো পরিবেষণ করা হতো—তাদের মধ্যে যেমন বাস্তবকে বহুদূর অতিক্রম করে যাবার প্রবণতা দেখা যেত, তেমনই তাদের রূপায়ণেও যথেষ্ট শৈথিল্য প্রকাশ পেত। অতএব কোন দিক দিয়েই তারা সাহিত্যিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি। সুতরাং বাংলা নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় তারা স্থান পাবার কতদূর যোগ্য, তা বিবেচনার বিষয়।

কিন্তু সেই যুগে রচিত কয়েকখানি সামাজিক নাটক বা প্রহসনের এই প্রকার অতিরঞ্জিত চিত্রের মধ্যেও যথার্থ বস্তুরস পরিবেষণ এবং চরিত্রসৃষ্টির আভাস দেখতে পাওয়া যায়। তা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রয়াস

মাত্র—তাদের ধারা পূর্বাপর রক্ষা পায় নি; কিংবা রক্ষা পেলেও তা বহুদূর অগ্রসর হতে পারে নি। কোন সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শের অভাবে সে যুগের প্রত্যেক নাট্যকারই কেবলমাত্র নিজস্ব প্রেরণা অনুযায়ী নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন; মুখ্যতঃ কেউ কারও পুচ্ছগ্রাহিতা করবার উদ্দেশ্যে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন নি। কিন্তু সেযুগেই কালক্রমে যখন দু'জন প্রতিভাবান্ শিল্পীর নাট্যরচনার আদর্শ সমাজের লক্ষ্যগোচর হয়ে পড়ল, তখনই এই পুচ্ছগ্রাহিতার সূত্রপাত হলো; কিন্তু এই পুচ্ছগ্রাহিতার প্রবৃত্তি প্রথম যুগের নাট্যসাহিত্যে নিতান্ত পীড়াদায়ক হয়ে না পড়লেও, তার পরবর্তী যুগের নাট্য-সাহিত্যকে আবিল করে তুলেছিল।

প্রথম যুগের অধিকাংশ নাটকই অভিনীত হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে নি। বিশেষতঃ যে কয়খানি নাটক এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিল, তাদের দর্শক-সমাজ নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ছিল বলে সাধারণ সমাজের উপর তাদের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা অনুমান ভিন্ন বলবার উপায় নেই। অতএব দেখতে পাওয়া যায়, যতদিন পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা না হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত বাংলার নাটক ব্যাপকভাবে বাংলার সমাজের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, কেবল মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের মনস্তুষ্টি করেছে মাত্র। অতএব সেই যুগের নাটকের জন্য সমাজের সাধারণ লোক কোন সাড়া অনুভব করতে পারে নি। তা ধনীর নির্দেশমত রচিত হয়েছে, তাঁদের অনুমোদন লাভ করে অভিনীত হয়েছে, তাঁদের অর্থব্যয়েই মুদ্রিত হয়েছে এবং তাঁদের বন্ধু-স্বজনের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছে। সেই যুগে যে সকল নাট্যকার ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারেন নি, তাঁদের সকল প্রয়াসই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। অতএব সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগ বলে নির্দেশ করতে হয়।

তারাচরণ শিকদার প্রণীত 'ভদ্রাজুর্ন' নামক নাটকখানিই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক বলে গ্রহণ করা হয়ে

থাকে। তার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য দেখতে না পাওয়া গেলেও, তার কাহিনীর মধ্যে যে নাটকীয় গুণ আছে, তা তার পরবর্তী অনেক নাটকের মধ্যেই নেই। এই নাটকখানির ভূমিকায় তারাচরণের একটি উক্তি থেকে জানতে পারা যায় যে, তাঁর পূর্বে বাংলা ভাষায় মৌলিক কোন নাটক না থাকলেও সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি অনুবাদ প্রচারিত হয়েছিল; তিনি লিখেছেন, 'এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বঙ্গভাষায় তার কয়েকখানা গ্রন্থের অনুবাদও হয়েছে।' কিন্তু এই অনুবাদগুলো মুদ্রিত হয়ে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল কি না, এই উক্তি থেকে তা জানবার উপায় নেই।

প্রধানতঃ কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণের বৃত্তান্তটি অবলম্বন করে তারাচরণ তাঁর 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনা করেন। কিন্তু বাঙ্গালীর সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের বাস্তব উপকরণ অবলম্বন করে সর্বপ্রথম বাংলা নাটক রচনার কৃতিত্ব রামনারায়ণ তর্করত্নেরই (১৮২২-৮৬) প্রাপ্য। তিনি বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের একজন সুনিপুণ পর্যবেক্ষক ছিলেন। তাঁর সামাজিক নাটকগুলোর নর-নারীর চরিত্রসমূহ আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত। যে সহানুভূতি-গুণের জন্য লেখকের সাহিত্য-সৃষ্টি সার্থক হয়, রামনারায়ণের মধ্যে তা পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল। প্রথম বাংলা মৌলিক উপন্যাস তখনও প্রকাশিত হয় নি। অতএব রামনারায়ণই সর্বপ্রথম আধুনিক বাংলায় সাধারণ বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনকে সাহিত্যে স্থান দেবার গৌরব লাভের অধিকারী হয়েছেন।

বাঙ্গালীর জীবন যে নাট্যাকারে গ্রথিত হয়ে রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়ে সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে, রামনারায়ণই সেই সম্ভাবনা জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর পূর্ববর্তী কোন বাংলা নাট্যকারেরই প্রভাব পরবর্তী কালে অন্য কারও ওপর বিস্তৃত হতে পারে নি; কিন্তু রামনারায়ণই সর্বপ্রথম নাটক রচনার প্রেরণার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তা'তেই উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সমসাময়িক কালে অনেকেই নাটক রচনায়

আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেই জন্যই নাটকের, বিশেষতঃ তাঁর সামাজিক নাটকের দোষ-গুণ বিচারের মধ্যেই তাঁর নাটকের মূল্য বিচার না করে, বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনার যে প্রেরণা তিনি দিয়েছিলেন, তার ফলাফলের উপরও তাঁর কৃতিত্ব অনেকখানি বিচার করে দেখবার আবশ্যক হয়।

রামনারায়ণের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৩) বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম যথার্থ সামাজিক নাটক—নাট্যাকারে রচিত সামাজিক কিংবা দার্শনিক প্রবন্ধ মাত্র নয়। বিষয়বস্তুর গুণেই যে তা সর্বপ্রথম বাঙ্গালীর কাছে নাটক বলে সমাদর লাভ করেছিল, তা নয়—তার মধ্যে এমন কতকগুলো বিশিষ্ট নাটকীয় গুণের পরিচয় লাভ করা যায়, যা ইতিপূর্বে এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে আর দেখা যায় নি। এই গুণ বহুলাংশে অপরিণত এবং অপরিস্ফুট হলেও তাদের মধ্যেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সূচনা দেখতে পাওয়া গেল—এই হিসাবে 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' বাংলা নাট্য সাহিত্যের সর্বপ্রথম বিস্ময়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম সামাজিক নাটক 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকেই চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। সেই প্রয়াস যতই অপরিস্ফুট হোক, তথাপি তার অস্তিত্ব অনুভব করতে বেগ পেতে হয় না। অবশ্য একথা ঠিক যে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে তার কোন চরিত্রই সর্বাঙ্গীণ ও সুসম পরিণতির পথে অগ্রসর হতে পারে নি, কতকগুলো বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের মধ্যে তা ছড়িয়ে আছে। তবু তা শুধুমাত্র কতকগুলো কৃত্রিম পুত্তলিকার মত অভিনয় করে যায় নি—নাট্যকারের মানবিক অনুভূতির সুকোমল স্পর্শে তাদের প্রাণস্পন্দনটি অনুভব করা যায়। নাট্যকার যে বেদনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তা মানবিক অনুভূতির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত হয়েছে, কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে তা ব্যক্ত হয় নি এবং এখানেই রামনারায়ণের মৌলিকত্ব।

রামনারায়ণের নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙ্গালী কুলীন সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ এবং বাস্তব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই বিষয়ে রামনারায়ণের একটি প্রধান কৃতিত্ব সম্পর্কে সকলেই সাধারণতঃ বিস্মৃত হয়ে থাকেন ; তা এই যে, আধুনিক যুগে তিনিই সর্বপ্রথম বাঙ্গালীর ঘরের কথা সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এই যুগে তার পূর্বে বাঙ্গালীর ঘরের কথা কেবল নাট্যসাহিত্যে কেন, অন্য কোন প্রকৃতির সাহিত্যের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করতে পারে নি। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের আদিযুগে যে কয়েকজন নাট্যকার বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের উপাদানকে তাঁদের রচনায় স্থান দিয়েছিলেন, রামনারায়ণ তাঁদের সকলের অগ্রবর্তী। শুধু বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের নিত্য পরীক্ষিত বাস্তব উপাদান মাত্রই নয়, তাঁর রচনার মধ্যেই সর্বপ্রথম বাঙ্গালীর নিজস্ব মুখের কথাও শুনতে পাওয়া যায়। স্ত্রী ও ইতর জাতীয় চরিত্রগুলোর কথ্যভাষার ভিতর দিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম একটি বাস্তব রূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন এবং এই বিষয়ে তিনি ছিলেন পরবর্তী কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পথ প্রদর্শক। এটা তাঁর পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের কথা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলা দেশে যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়, তার মধ্যে কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান অন্যতম। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ তৎকালীন বহু গদ্য লেখকের রচিত প্রবন্ধাদির ভিতর দিয়ে কৌলীন্য প্রথার দোষত্রুটিগুলো উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই বিষয়টিকে রামনারায়ণই সর্বপ্রথম তাঁর নাটকের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর প্রবর্তিত পথে পরে বহু খ্যাত বা অখ্যাতনামা নাট্যকার অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন। এমন কি, কিছুকাল অবধি 'কুলীন কুল-সর্বস্ব'-এর ভাষা বাংলা সামাজিক নাটকের আদর্শ ভাষা হয়ে ছিল।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে এ'কথাও স্বীকার করতে হয় যে, বাংলার প্রথম সামাজিক নাটকটি প্রকৃতপক্ষে একটি চিত্র—নাটক হিসাবে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। চিত্র যতই নিপুণভাবে অঙ্কিত হোক না

কেন, পূর্ণ নাটকের সম্মান কখনই পেতে পারে না। অবশ্য এই বিষয় নিয়ে স্বাধীন নাটক রচনা করা রামনারায়ণের উদ্দেশ্য ছিল না, সমাজের একটি যথার্থ বাস্তব রূপ প্রকাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি।

রামনারায়ণের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'নব-নাটক'ও প্রথম নাটকখানির মতই পারিতোষিক প্রাপ্ত রচনা। সমাজের বহুবিবাহ-প্রথার কুফল অবলম্বন করে তা রচিত। এই নাটকের ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ নেই; কারণ, তা রচিত হবার পূর্বে মধুসূদনের সব কয়খানি নাটক-প্রহসন এবং দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' ও 'নবীন তপস্বিনী' প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাই বোধ হয় 'নব-নাটক'-এর পরিণতি বিষয়ে, কাহিনী পরিকল্পনায়, ভাষা ব্যবহারে এবং আঙ্গিক সৃষ্টিতে দীনবন্ধু এবং মাইকেলের দূরাগত সুস্পষ্ট প্রভাব একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। তবে রামনারায়ণ তাঁর এই দ্বিতীয় সামাজিক নাটক রচনায় যতটা মধুসূদন-দীনবন্ধুর সমসাময়িক প্রভাব অনুভব করেছেন, তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিজের পঠিত সংস্কৃত নাটকের সংস্কারকে কাজে লাগিয়েছেন। 'নব-নাটক'-এ সংস্কৃত নাটক অনুযায়ী নান্দী ও প্রস্তাবনার ব্যবহার তারই প্রমাণ।

'নব-নাটকে'র মধ্যে রামনারায়ণ ইংরেজি নাটকের অনুকরণে অঙ্কের অন্তর্গত করে গর্ভাঙ্কের (scene) ব্যবহার করেছেন, 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকে তা করেন নি। এই বিষয়ে যে তিনি মাইকেল-দীনবন্ধুকে অনুসরণ করেছেন, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব'-কে একটি সমাজ-চিত্র বা সামাজিক নক্সা বলা হলেও 'নব-নাটক' নাটকের মর্যাদা লাভের অধিকারী।

রুচির দিক দিয়ে সমসাময়িক সামাজিক নাটকগুলো হতে 'নব-নাটকে'র সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করা যায়। এই বিষয়ে 'নব-নাটক' 'কুলীন কুলসর্বস্ব' হতেও উন্নততর। ভাষায় ও ইঙ্গিতে অটুট সংযম 'নব-নাটকে'র একটি বিশিষ্ট গুণ; অথচ তা সত্ত্বেও তা নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধনেও সার্থক হয়েছে। এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে পরবর্তী কালে

যে সকল সামাজিক নাটক রচিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশের মধ্যেই রুচির এই সংযম রক্ষিত হতে পারে নি। এই রুচি-রক্ষা প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, রামনারায়ণের 'নব-নাটক' জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালায় বহুবার অভিনীত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী হরণের সুপরিচিত কাহিনী আশ্রয় করে রামনারায়ণ 'রুক্মিণী-হরণ' নামক একখানি ক্ষুদ্র পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব মুক্ত তাঁর একখানি তা মৌলিক মিলনান্তক নাটক।

পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করে রামনারায়ণ 'ধর্মবিজয় নাটক' ও 'কংসবধ নাটক' নামে আরও দুখানি নাটক রচনা করেছিলেন। তিনি 'স্বপ্নধন' নামে একখানি রোমান্টিক নাটকও রচনা করেন। দুটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজপুত্র ও রাজকন্যা স্বপ্নদর্শন হতে কি ভাবে পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছিল, তাই এই নাটকের উপজীব্য।

রামনারায়ণ কয়েকখানি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রহসনও রচনা করেছিলেন, যথা, 'যেমন কর্ম তেমনি ফল,' 'উভয়-সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান'। তাদের মধ্যে সেই সময়কার সমাজ-জীবন সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ করেছেন, দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটক-প্রহসনে ইতিপূর্বেই তার পথ প্রদর্শন করে গেছেন।

বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ; এমন কি, কতকগুলো বিষয়ে তাঁকে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই সম্পর্কে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, তাঁর নাট্যরচনার শ্রেষ্ঠ গুণ নির্দিষ্ট ও কতকগুলো অপরিসর ক্ষেত্র অবলম্বন করেই প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্রভাবে নাটক রচনায় তাঁর অনেক ত্রুটি। কিন্তু একটি নাটক নিয়ে সমগ্রভাবে বিচার করবার পরিবর্তে যদি তাঁর কোন কোন রচনার অংশ-বিশেষ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তা হলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, তাঁর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্ভাবনা বর্তমান ছিল। বাংলা নাটক রচনার যথোপযুক্ত আদর্শ সম্মুখে না থাকার জন্যই তিনি তাঁর সেই

সম্ভাবনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিভার আর একটি প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, তিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোন বস্তুকে অতিক্রম করে যখন অপ্রত্যক্ষলোকে কল্পনার চক্ষু বিস্তার করতেন, তখনই তাঁর দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে আসত।

দীনবন্ধুর বহু দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম কতকগুলো পূর্ণাঙ্গ সামাজিক চরিত্রসৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করেছেন। বাঙ্গালীর জীবনেও যে নাট্যসাহিত্যের পরম মূল্যবান্ উপাদান বর্তমান ছিল, তা দীনবন্ধুর পূর্বে এমন পূর্ণাঙ্গরূপে চোখে আঙ্গুল দিয়ে আর কেউ দেখাতে পারেন নি। তাঁর নিমচাঁদ, অভয়কুমার, কামিনী এ'রা আমাদের ঘরের লোক হয়েও যেভাবে নাট্যমঞ্চের ওপর দিয়ে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করেছে, তা থেকেই সেদিন বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, বাঙ্গালীর জীবনেও মূল্যবান্ নাটকীয় উপাদান বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

একটি সমসাময়িক ঘটনার ওপর নির্ভর করে দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীল-দর্পণ' রচিত হয় (১৮৬০)। নাটকখানি প্রকাশিত হবার পূর্বেই তার বিষয়টি অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া টেকচাঁদ ঠাকুর রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের (১৮৫৭) ভিতরও তার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই বিষয়ে দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও কম ছিল না। বাংলার কৃষকদের উপর ইংরেজ নীলকরদিগের অত্যাচারের জীবন্ত বর্ণনা নিয়েই 'নীল-দর্পণ' নাটক রচিত হয়েছিল।

'নীল-দর্পণ' যে উদ্দেশ্যমূলক নাটক, লেখক ভূমিকায় নিজেই তা উল্লেখ করেছেন। প্রকাশিত হবার সময় তা'তে গ্রন্থকারের কোন নাম ছিল না; কারণ, দীনবন্ধু নিজে শুধু যে সরকারী কর্মচারী ছিলেন, তাই নয়—ডাকবিভাগের পরিদর্শকরূপে কাজ করতে গিয়ে তাঁকে অনেক সময় ইংরেজ নীলকরদের সংস্পর্শে আসতে হতো। সেইজন্য প্রত্যক্ষভাবে যাতে তাদের অপ্রীতিভাজন

না হয়ে পড়েন, সেইজন্যই তাঁকে এই পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল।

'নীল-দর্পণ' প্রকাশিত হবার এক বৎসরের মধ্যেই তা ইংরেজিতে অনূদিত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করেন। 'নীল-দর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্‌ সাহেব। 'নীল-দর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদ এ'দেশে ও ইংলণ্ডের শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট অচিরেই উপস্থাপিত করা হলে তার ইংরেজি অনুবাদের মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মানহানির মকদ্দমা দায়ের করা হয়। রেভারেণ্ড্ লঙ্‌কে মানহানির অপরাধে দোষী স্থির করে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে তাঁর প্রতি এক মাসের জন্য কারাবাস এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়। পরম বিদ্যোৎসাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ এক হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ লঙ্‌ সাহেবের হাতে দেন। লঙ্‌ সাহেব তাঁর প্রদত্ত অর্থে অর্থদণ্ড পরিশোধ করে একমাসের জন্য কারাবরণ করলেন। এই অভাবনীয় ঘটনায় 'নীল-দর্পণে'র নাম অল্পকালমধ্যেই অপ্রত্যাশিতরূপে প্রচার লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র 'নীল-দর্পণ'কে মার্কিন উপন্যাস *Uncle Tom's Cabin*-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।

বিশেষ দেশে ও কালে সীমাবদ্ধ এবং বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন এক জনসমাজের প্রতি সত্যকার সহানুভূতি নিয়ে 'নীল-দর্পণ' রচিত হলেও তার মধ্যে যে শিল্পগুণেরও পরিচয় পাওয়া যায়, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বর্ণিতব্য বিষয়বস্তুর প্রতি লেখকের আন্তরিক সহানুভূতি থাকলে বস্তুতান্ত্রিক (realistic) সাহিত্য সার্থকতা লাভ করে। দীনবন্ধু বিশেষ করে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিক। আগেই বলেছি, যে-সকল ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যকে অবহেলা করে আদর্শ সৃষ্টি করতে গেছেন, সেখানেই তাঁর ব্যর্থতা এসেছে। 'নীল-দর্পণে'র যে সকল চিত্রে দীনবন্ধু বস্তুতান্ত্রিকতার মর্যাদা রক্ষা করে চলেছেন, সে সকল চিত্রেই তাঁর শিল্পগুণের পরিচয় পাওয়া যাবে।

সমগ্রভাবে 'নীল-দর্পণে'র কাহিনী বিচার করে দেখ্‌লে তা'তে অনেক দোষ-ত্রুটি লক্ষিত হবে সত্য, কিন্তু তার মধ্য থেকে কোন কোন চিত্রকে স্বতন্ত্র করে দেখলে তাদের সৃষ্টিসৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। তার মধ্যে এমন কতকগুলো চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়, যা সর্বতোভাবে বাঙ্গালী জীবনের নিজস্ব ক্ষেত্র থেকেই পরিকল্পিত এবং সম্পূর্ণ বাস্তবতার উপাদানেই গঠিত। বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস এর পূর্বে আর দেখা যায় নি। বাঙ্গালী জীবনের মধ্যেও যে একটা গুরুতর সুখদুঃখবোধের চৈতন্য সুপ্ত ছিল, দীনবন্ধু তাঁর 'নীল-দর্পণে'র ভিতর দিয়ে তাই প্রথম বিস্তৃতভাবে জাগ্রত করলেন। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের সমস্যা গভীর-ভাবে চিন্তা করবার প্রেরণা দীনবন্ধুই সর্বপ্রথম আমাদের দিয়ে গেলেন।

দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' যখন প্রকাশিত হয়, তখন পর্যন্তও বাংলা গদ্য ভাষার আদর্শ স্থির হয় নি। মাত্র দু'বছর আগে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যুগান্তকারী পুস্তক 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়েছে। তার ভাষা তখন পর্যন্তও বাংলা গদ্যে ব্যবহার্য ভাষা বলে গৃহীত হয় নি ; অতএব দীনবন্ধু এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন আদর্শের অনুসরণ করবার সুযোগ পান নি। সেজন্য তিনি সে সময়ে গদ্যরচনার দুইটি রীতিই তাঁর গ্রন্থমধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত চরিত্রগুলোর জন্য তিনি সাধু ভাষা বা পণ্ডিতি বাংলা ও নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত চরিত্রগুলোর জন্য কথ্য ভাষা বা আলালী ভাষা ব্যবহার করলেন।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩)। নাটকখানি প্রিয় সুহৃদ্‌ বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করা হয়েছে। 'নীল-দর্পণ' দীনবন্ধুর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় ও সুদূর-প্রসারী করেছিল। নিজের শক্তির উপর তখন নাট্যকারের কিঞ্চিৎ আস্থা জন্মেছে। বস্তুতঃ, এই নাটকখানি দীনবন্ধু সাহিত্যিক বুদ্ধি-প্রণোদিত হয়েই লিখেছেন ; প্রথম নাটকের মত উত্তেজনামূলক আবেগপ্রধান সমসাময়িক ঘটনা

অবলম্বন করে রচনা করেন নি। হাস্যরসিক দীনবন্ধু এখানে কিছু সাহিত্যিক রস পরিবেষণ করতে চেয়েছেন। দীনবন্ধু যে সেক্সপীয়র এবং সংস্কৃত সাহিত্যের রোমান্টিক কাব্যাদর্শ দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এই নাটকে তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। দীনবন্ধু প্রধানতঃ হাস্যরসিক। হাস্যরসসৃষ্টিতেই তাঁর প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ হয়েছে। হাস্যরসিক দীনবন্ধু এবং কল্পনাবিলাসী দীনবন্ধু এই নাটকে একত্র অবস্থান করেছেন।

'নবীন তপস্বিনী'র আখ্যানভাগের পরিকল্পনায় মৌলিকতার পরিচয় বেশি নেই। নাট্যকাহিনীর একভাগে রোমান্স কল্পনা এবং অন্যভাগে হাস্যরস। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তি, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরাজীগ্রন্থ এবং প্রচলিত খোসগল্প থেকে সার সংগ্রহ করে দীনবন্ধু তাঁর অপূর্ব চিত্তরঞ্জক নাটকের চরিত্র সকলের সৃষ্টি করতেন।' 'নবীন-তপস্বিনী'তে তার সার্থক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

'লীলাবতী' দীনবন্ধুর তৃতীয় নাটক (১৮৬৭) ; তা মিলনান্তক। এই নাটকখানি রচনার আগে দীনবন্ধুর ছুখানি প্রসিদ্ধ প্রহসন ছাপা হয়ে গিয়েছে—'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) ও 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)। অতএব দীনবন্ধু তখন তাঁর প্রতিভার মধ্য-গগনে বিরাজিত। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'লীলাবতী' তাঁর এই মধ্যাহ্ন-প্রতিভার দীপ্তি প্রকাশ করতে পারে নি—তার দোষত্রুটি অনেক।

উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধু উল্লেখ করেছেন, 'অপরিমিত-আয়াস-সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি।' এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্বভাব-কবির মত স্বভাব-নাট্যকার বলে কোন কথা যদি ব্যবহার করা যায়, তবে তা দীনবন্ধুর ওপর প্রযোজ্য। দীনবন্ধু স্বভাব নাট্যকার এবং নাটকের বিশেষ একটা দিকই তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার অনায়াসসৃষ্টি বলে মনে হবে। তাঁর প্রতিভা আয়াস-লব্ধ নহে, সহজ লব্ধ ; অতএব যে

নাটক তিনি 'অপরিমিত আয়াস-সহকারে' রচনা করেছেন বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন, সেই নাটক যে তাঁর প্রতিভার অনুগামী নয়, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। প্রহসন-গুলোই দীনবন্ধুর অনায়াস-সৃষ্টি ; গুরু-বিষয়ক নাটকগুলোই তাঁর 'অপরিমিত-আয়াস-সহকারে' রচিত ; সেইজন্যই দীনবন্ধুর প্রহসনগুলো সহজ ও নাটক-গুলো কৃত্রিম বলে মনে হবে। তবে 'আয়াস-সহকারে' যে সত্যকার উচ্চাঙ্গের নাটক রচিত হয় না, তা নয় ; যাঁরা সতর্ক ও সজাগ শিল্পী তাঁদের আয়াস-সৃষ্টি উচ্চতম মর্যাদা লাভের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু দীনবন্ধুর প্রতিভা সেই স্তরের ছিল না ; দীনবন্ধুর শিল্প ও রসবোধ তাঁর স্বভাবেরই অঙ্গ ছিল, তার সঙ্গে তিনি তাঁর বহিরায়ত্ত শিক্ষা, সংস্কার ও সাধনার সার্থক সামঞ্জস্য স্থাপন করে নিতে পারেন নি। যেখানে দীনবন্ধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে কেবল-মাত্র কল্পনাকে আশ্রয় করেছেন, সেখানেই নাট্যকার হিসাবে তিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন। 'লীলাবতী' নাটকের ভিত্তি প্রধানতঃ দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে বলে নাটক হিসাবে তা ব্যর্থ হয়েছে; তা ছাড়া তাতে ব্যবহৃত ভাষা এবং সুদীর্ঘ সংলাপ এই নাটকের গুরুতর ত্রুটি।

দীনবন্ধু মিত্রের সর্বশেষ রচনা 'কমলে কামিনী' নাটক (১৮৭৩)। এই নাটকের উদ্দেশ্য (motto) রূপে নাট্যকার সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক হতে দুইটি বীররসাত্মক ইংরেজী পদ উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পাওয়া যাবে যে, নাটকের মধ্যে বীররসের পরিবর্তে অন্য বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছে ; হয়ত নাট্যকার এক উদ্দেশ্যে 'কমলে কামিনী' নাটক রচনা আরম্ভ করেন, শেষ পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্যে আর রক্ষা পায় নি। নাটকখানি 'বিদ্যা-দয়া-দাক্ষিণ্য-দেশানুরাগাদি বিবিধ-গুণরত্ন-মণ্ডিত পণ্ডিত-মণ্ডলি সমাদর-তৎপর রাজশ্রী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর'কে উৎসর্গী-কৃত। উৎসর্গপত্রে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন,—'কমলে কামিনী' অপরের যেমন হউক, আমার বিলক্ষণ আদরের পাত্রী"। এই নাটক-

খানির আলোচনা সম্পর্কে নাট্যকারের এই উক্তিটির ওপর বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সর্বশেষ রচনা বলেই হোক, কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, এর প্রতি দীনবন্ধুর বিশেষ মমত্ববোধ ছিল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আসামে লুসাই অভিযান উপলক্ষে সামরিক ডাকবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিরূপে দীনবন্ধু দক্ষিণ আসাম-অঞ্চল ভ্রমণ করবার সুযোগ পান, তার ফলে মণিপুর ও কাছাড় দেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন; মণিপুরীদিগের বিচিত্র জীবন তখন তাঁকে আকৃষ্ট করে থাকবে। কিছুদিন পর দীনবন্ধু স্বদেশে ফিরেই এই নাটকখানি রচনা করেন। তার মধ্যে মণিপুরী রাসলীলার যে বর্ণনা আছে, তা তাঁর এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। দীনবন্ধু যখন তাঁর এই নাটক রচনা করেন, তখন তাঁর প্রতিভা অস্তমিত হয়েছে।

'নবীন তপস্বিনী' রচনার তিন বৎসর পরে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রকাশিত হয়। নাটকটি দুটি অঙ্কে পরিসমাপ্ত একখানি সামাজিক প্রহসন। সামাজিক কোন কৌতুককর ঘটনা, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র বা কোন রীতিনীতি নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করবার প্রথা বাঙ্গালা গদ্যসৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই চলে আসছে। এইরূপ সামাজিক চিত্ররচনা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহিত্যসৃষ্টিতে রূপ লাভ করেছে। কিন্তু সমাজ-সমালোচনামূলক এই সমস্ত ব্যঙ্গচিত্রে যে অপূর্ব নাটকীয় রসবস্তু আছে, মাইকেলের আগে তার মধ্যে আর কারও দৃষ্টি পড়ে নি। প্রকৃত প্রহসনসৃষ্টিতে মধুসূদন অসামান্য সাফল্য লাভ করলেও তিনি তা'তে যে সংস্কারমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা'তে তার সৌন্দর্য-সৃষ্টি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু দীনবন্ধুর সৃষ্টিতে এরূপ কোন মনোভাবের পরিচয় নেই। প্রহসন-সৃষ্টিতে দীনবন্ধুর সামনে মধুসূদনের আদর্শ বর্তমান থাকলেও, দীনবন্ধুর সৃষ্টি-কল্পনা মাইকেল থেকে ভিন্নতর। প্রাচীন ও

নব্যসম্প্রদায়ের প্রতি মাইকেলের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও বিদ্বেষ নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে ফুটে উঠেছে এবং তার ফলে তাঁর প্রহসনগুলো প্রথমে মঞ্চস্থ করতে অনেক বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু দীনবন্ধু তাঁর প্রহসনকে সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর অপূর্ব সহমর্মিত কৌতুককে কৌতুক রূপে, ব্যথাকে ব্যথা রূপেই প্রকাশ করতে পেরেছে। কোন প্রকার উচ্ছ্বাস বা নীতি-প্রবণতা এসে রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত জন্মায় নি, কিংবা তাঁর রচনাকে নিতান্ত লঘু পরিহাস-রসিকতায় পর্যবসিত হতে দেয় নি। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ই তার প্রথম প্রমাণ।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নামক প্রহসনখানি প্রকাশিত হয়। উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এই দু'খানি প্রহসন অভিন্ন হলেও বিষয়-বিন্যাসে দীনবন্ধু তাঁর রচনায় কতকটা মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

'নীল-দর্পণে'র মত 'সধবার একাদশী'ও উদ্দেশ্যমূলক নাটক। তার উদ্দেশ্যরূপে নাট্যকার প্রারম্ভেই কয়েকটি ইংরেজি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন, তাদের মধ্যে এলিবু ব্যারেটের 'Touch not, taste not, smell not, drink not anything that intoxicates' উক্তিটি নাটকের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। দীনবন্ধুর যে অনুভূতিশীল হৃদয় একদিন পল্লীর নীল-চাষীদিগের দুঃখ-দুর্দশা দেখে কাতর হয়েছিল, তাই সমসাময়িক নাগরিক সভ্যতার এক কদর্য রূপ দেখে সেদিন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল। 'সধবার একাদশী'র মধ্য দিয়ে তারই অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস ইতিপূর্বেই এদেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দীনবন্ধু তারই সূত্র ধরে সেকালের শিক্ষিত নব্য বাংলার একটি জঘন্য দুর্নীতির ও তার শোচনীয় পরিণামের প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছিল, তা আমাদের

বিচার্য নয়; সাহিত্যিক রচনা হিসেবে তা কতদূর সার্থকতা লাভ করেছে, তাই আমাদের বিচারের বিষয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপান যে অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করে শিক্ষিত সমাজের নৈতিক ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছিল, সমসাময়িক সাহিত্য থেকেই তার পরিচয় লাভ করতে পারা যাবে—সেই ইতিবৃত্তের এখানে পুনরাবৃত্তি করতে চাই নে। প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তিই তার প্রতিকারের নানাবিধ উপায় সন্ধান করছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই সমবেতভাবে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার উদ্দেশ্যে কতকগুলো সাধারণ প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্যারীচাঁদ সরকার প্রতিষ্ঠিত Temperance Society বা সুরাপান-নিবারণী-সমিতি অন্যতম; এই সমিতির কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য তখন দেশের শিক্ষিত সমাজের আলোচনার বিষয় ছিল। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবার অল্পকাল পরই রচিত হয়। বলা বাহুল্য, এই সমিতির এবং দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ অভিন্ন।

'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ যা, তা রুচির অভিযোগ। অবশ্য এই বিষয়ে মতানৈক্য চিরদিনই থাকবে। কারণ, পাঠকের ব্যক্তিগত নীতি ও রুচিবোধ দিয়েই তার নৈতিক মূল্য বিচার করা হয়। তথাপি স্বীকার করতেই হয় যে, সমাজের এক পাপ দূর করতে গিয়ে আর এক পাপের প্রশ্রয় দিলে কোন লাভই হয় না; তাই একমাত্র নিমচাঁদের চরিত্রের জন্য দীনবন্ধু কৃতিত্বের অধিকারী হলেও এই প্রহসন সর্বতোভাবে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে নি।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধুর 'জামাই-বারিক' প্রহসনটি প্রকাশিত হয়। তার উদ্দেশ্য হিসাবে নাট্যকার প্রথমেই দু'টি ইংরেজী পদ উদ্ধৃত করেছেন,

'Of all the blessings on earth the best is good wife,
A bad one is the bitterest curse of human life,'

পদটির দ্বিতীয়াংশের ট্র্যাজিডির বিষয়টি নাট্যকার প্রহসনের কার্যে লাগিয়েছেন। দীনবন্ধুর স্বাভাবিক হাস্যরস-প্রবণতার গুণে জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয় নিতান্ত লঘু হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করায় কতকগুলো ত্রুটিও এতে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সেইজন্য তা প্রহসন হলেও তা'তে দীনবন্ধুর অপরাপর নাটকের মতই নাট্যিক ঘটনার ক্রমবিকাশ ও চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়—তা কেবলমাত্র একটি সামাজিক চিত্র বা নক্সা নয়।

'নীল-দর্পণ' নাটকের মানহানির মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ১৮৬১ সনের ২৭শে আগস্ট শোভাবাজারের নাটমন্দিরে এক সভা হয়। কয়েকজন স্বার্থান্ধ দেশীয় লোকের সহায়তায় কোলকাতার ইংরেজ বণিক্‌গণ তার এক বিরুদ্ধ সভার আয়োজন করেন। এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে ঐ সময়ে দীনবন্ধু 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' নামে একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা করেন। প্রহসনটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, মাত্র দু'টি ক্ষুদ্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ। তা'তে ইংরেজের খোসামোদকারী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ সম্পর্কে নাট্যকারের ক্রোধ প্রকট হয়েছে।

দীনবন্ধুর পর থেকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে রোমান্টিক ধারার প্রবর্তন হলো, বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের রূপ তার মধ্যে ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটক

কিছুকাল ধরে বাংলা নাটক তার গতানুগতিক বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করে নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধান করছে। আগে যে সকল নাটক রচিত হয়েছিল, তা প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কারমূলক ও দেশাত্ম-বোধক; কিন্তু আজ এই ধারাটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে বলা যেতে পারে। পৌরাণিক বিষয় যে এর একটা প্রধান অংশ অধিকার করেছিল, তাও আজ আর নেই। অথচ এমন একদিন ছিল, যেদিন বাংলায় পৌরাণিক নাটকের মত এমন জনপ্রিয় আর কিছুই ছিল না—কিন্তু সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে; অতএব এক কথায় বলা যেতে পারে যে, এতদিন বাংলা নাটকের যা-কিছু উপজীব্য ছিল, তা প্রায় সমূলেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। যদি তাই-ই হয়, তবে এ' কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলা নাটক সাম্প্রতিক কালে নতুন রূপ লাভ করছে; প্রায় একশো বছর ধরে যে সংস্কার তার অন্তর ও বাহির আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, তার মধ্য থেকে তা আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আজ বাংলা নাটক রচনায় কোন কৃতিত্ব কিংবা নিষ্ফলতা যাই-ই দেখা দিক না কেন, তার জন্যে, তার প্রায় একশো বছরের ঐতিহ্য কোন দিক দিয়েই দায়ী নয়।

বাংলা নাট্যসাহিত্য যে একান্ত সাম্প্রতিক কালেই তার নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তা নয়—তার পূর্ববর্তীকালেও রবীন্দ্র নাট্য-সাধনার ভিতর দিয়ে তার ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, কাব্য কিংবা কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারা অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটলেও, নাটকের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম নাটক

রচনা করেছিলেন, তখন বাংলা নাটক রচনার যে একটা আদর্শ সম্মুখে ছিল না, তা নয়—কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করেই নিজের সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে গেলেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটলো। কিন্তু অতি আধুনিক কালে বাংলা নাটক যেভাবে ঐতিহ্যের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তার প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একান্ত আত্মভাব-পরায়ণ (subjective) কাব্য-সাধনার ধারাকে আশ্রয় করেই তাঁর নাট্যরচনার ধারার সৃষ্টি করলেন, তার সঙ্গে বাঙ্গালীর বহির্মুখী সমাজ-জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত গৌণ ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটেছে, তা কারও নিতান্ত আত্ম-কেন্দ্রিক অনুভূতি আশ্রিত বলে নির্দেশ করবার উপায় নেই,—বহির্মুখী সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ধারা অনুসরণ করেই তা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে যেমন যথার্থ নাটকীয় উপকরণ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়েছিল, সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে তা হয় নি। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের সম্মুখে যে জীবন আছে, তা বহুলাংশে যেমন সত্য, তেমনই প্রত্যক্ষ। সেইজন্য রবীন্দ্র-নাটকের ঐতিহ্যচ্যুতি এবং সাম্প্রতিক নাটকের ঐতিহ্যচুতি সম্পূর্ণ অভিন্ন প্রকৃতির বলে নির্দেশ করা যেতে পারে না।

একথা কারও মনে হতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই বাংলা দেশে যে দেশাত্মবোধের জন্ম হয়েছিল, তার মধ্য দিয়েও বাংলা নাটক তার পূর্ববর্তী ধারার সঙ্গে সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু একথা সত্য নয়। তা যুগের পরিবর্তন মাত্র, ঐতিহ্যের বিচ্ছেদ নয়; রবীন্দ্র-নাটক কিংবা সাম্প্রতিক নাটকের সঙ্গে তার যেমন বিচ্ছেদ ঘটেছিল এবং ঘটেছে, তা সে প্রকৃতির নয়। নাটকের তখন কেবলমাত্র বিষয়বস্তুরই পরিবর্তন হয়েছিল, আঙ্গিকের কোন পরিবর্তন হয় নি। সাম্প্রতিক কালে বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকেরও পরিবর্তন হয়েছে—রবীন্দ্র-নাটকেও এমনি অন্তর ও বহিরঙ্গগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, সাম্প্রতিক কালেও

তাই হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের ধারা অনুসরণ করে সাম্প্রতিক নাটকের পরিবর্তন আসে নি, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার পরিবর্তন হয়েছে। সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে সেই পরিবর্তন কবে কোন্ দিক থেকে কি ভাবে এলো, তাই আজ আমার বক্তব্যের বিষয়; এই সঙ্গে তার গতি এবং প্রকৃতি আমি যথাসম্ভব অনুধাবন করবার প্রয়াস পাবো।

বিশ শতকে পদার্পণ করা মাত্র বাংলা নাটক যে স্বদেশী আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছিল, তার মূলে আদর্শবাদের প্রেরণা যতদূর কার্যকরী ছিল, বাস্তব সমাজ-জীবনের প্রেরণা তত কার্যকরী ছিল না। দেশাত্মবোধের অনুভূতি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল রূপেই বিকাশলাভ করেছিল; পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোতে যেমন তা সামগ্রিক জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে সংযুক্ত, আমাদের দেশে তা তেমন নয়। সেইজন্য সে যুগে বাংলা নাটকের ভিতর দিয়ে যে উত্তেজনাই প্রকাশ পাক, তা কিছুতেই জাতির জীবনের অন্তস্তল স্পর্শ করতে পারে নি। সুতরাং তার অভিব্যক্তি যেমন আকস্মিক হয়েছিল, তেমনই তার ফলও ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল; দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলো অনুসরণ করলেই এ'কথা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে তাঁর রচনার মধ্যে যে উত্তেজনার পরিচয় পাওয়া যায়, তার শেষভাগের রচনার মধ্যে তা পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, নাট্য-রচনার বিষয়ের মধ্যেই তখন তাঁর পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যে সংস্কার গড়ে উঠেছিল, তা' তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন নি বলেই নতুন বিষয়-বস্তু নিয়ে রচিত নাটকেরও অন্তর ও বহিরঙ্গগত পরিচয়ে তার প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব সে যুগের নাট্যরচনায় সুদূরপ্রসারী হয়েছিল; ভাব, আদর্শ এবং বিষয়-বস্তু নির্বাচনে দীর্ঘদিন যাবৎ তারই অনুসরণ চলছিল। এমন সময় অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং বঙ্গবিভাগ ঘটে গেল।

স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবিভাগ সংঘটিত হবার কিছুকাল আগে থেকেই বাংলার সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছিল; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের যোগদানের পর থেকেই এই অবস্থার সৃষ্টি হতে আরম্ভ করেছিল। ব্রহ্মদেশে মিত্রশক্তি জাপানের কাছে পরাজয় স্বীকার করে এসে ভারতের পূর্বসীমান্ত রক্ষা করবার যে 'কৌশল' অবলম্বন করল, তার ফলে বাংলাদেশের সমাজ বিধ্বস্ত হয়ে গেল—পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসীর দৈহিক মৃত্যু হলো এবং অবশিষ্ট জনসাধারণেরও নৈতিক মৃত্যু হলো। বাংলার সামাজিক জীবনের ইতিহাসে এর মত বিপর্যয় তার আগে ঘটেছে বলে শুনতে পাওয়া যায় নি। সুতরাং সাহিত্যে যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা আর বিচিত্র কি?

আমরা জানি, বাংলা নাট্যসাহিত্য প্রথম থেকেই যুগাশ্রয়ী; বিশেষ যুগকে অতিক্রম করে চিরকালের রাজ্যে তা প্রথম থেকেই উত্তীর্ণ হতে পারে নি; সুতরাং যখন একটা যুগান্তকারী অবস্থার সৃষ্টি হলো, তখন তা স্বভাবতঃই তার দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হলো। অন্য কোন বিষয়ের জন্যে না হলেও বাংলা নাটকের দিক দিয়ে এ দেশের সমাজ-জীবনে এই প্রকার একটা যুগান্তকারী ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি, উনিশ শতকের প্রথম থেকে আরম্ভ করে পর্বে পর্বে বাংলা সাহিত্যে নতুন নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারায়ও যুগের পরিবর্তন হয়েছে সত্য; কিন্তু পূর্ববর্তী ধারার সঙ্গে তার ব্যবধান সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত এত সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। বিশেষতঃ তার আঙ্গিক সাম্প্রতিক কালের আগ পর্যন্ত আনুপূর্বিক প্রায় অভিন্নই ছিল। সুতরাং একটা সম্পূর্ণ যুগান্তকারী ঘটনা না হলে তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনদিনই আনুপূর্বিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারত না। সাম্প্রতিক কালের সূচনায় বাংলার সমাজ-জীবনে সেই পরিবর্তনই দেখা দিয়েছিল। একান্তভাবে জীবনকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করে বলেই সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যে একটা অখণ্ডতা দেখা যায়।

কারণ, জীবনের শাশ্বত গুণের ওপর ভিত্তি করলেই, যুগ থেকে নতুন যুগে উত্তীর্ণ হয়েও তার মৌলিক বিষয়ের কোনও বিকার ঘটতে পারে না; কিন্তু যেখানে তা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র ওপরের স্তরকেই আশ্রয় করা হয়, সেখানেই তার একটা অখণ্ড ধারা সৃষ্টি হতে পারে নি, নতুন নতুন যুগে তার নতুন নতুন রূপ দেখা যায় মাত্র। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারাতেও একটা অখণ্ড যোগসূত্র সর্বদা যে উদ্ধার করা যায় না, তার প্রধান কারণই এই যে, তা কোন কালেই একান্তভাবে জীবনের আনুগত্য স্বীকার করে নি। জীবন-সূত্রেই সাহিত্যের অখণ্ডতার সৃষ্টি; যেখানে জীবনের এই অনুভূতি নেই, সেখানে এই অখণ্ডতাও সৃষ্টি হতে পারে না। সাম্প্রতিক বাংলা নাটক যে পূর্ববর্তী ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তার প্রধান কারণ, তা যে প্রধানতঃ বহির্মুখী বিষয় আশ্রয় করেছিল, তা যে-যুগের বিষয় ছিল, সেই যুগের অবসানেই তার মূল্য হ্রাস পেয়েছে। যে ঘটনারাশির ভিতর দিয়ে এই দেশের সমাজ সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছে, একান্ত ভাবে তারই ফলাফলের ওপর তার সব ঔৎসুক্য আজ কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জাতির মনে এ আশঙ্কা কোনদিন কোনভাবেই দেখা যায় নি যে, এ দেশ কোন কারণে কোনদিন বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। বহুদূরদর্শী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কোনদিন যে দেশবিভাগ সম্ভব হতে পারে, স্বপ্নেও এই আশঙ্কা কোনদিন দেখা যায় নি। আগে থেকে তার কোন প্রস্তুতি ছিল না, তার পরিণাম সম্পর্কেও আগে থেকে কোন অস্পষ্ট ধারণাও ছিল না। আগে থেকে সমাজের চিন্তা এই ধারায় কোন দিনই অগ্রসর হয় নি বলে, তা যখন একান্তই সত্য হয়ে উঠল, তখন তার সম্মুখীন হয়ে কোনও পূর্বপরিকল্পিত পথে সমাজ অগ্রসর হয়ে যাবার সুযোগ লাভ করলো না; তখন এ দেশের সমাজে যা সংঘটিত হলো, তা বিমূঢ়-বুদ্ধি জাতির পরিণাম-চিন্তাহীন এবং অর্থহীন আকস্মিক অঙ্গ

আস্ফালন মাত্র। এই অবস্থা স্থায়ী হতে পারে না, একথা সত্য; কিন্তু তা সত্ত্বেও বুঝতে পারা যায় যে, সুদীর্ঘ সাধনা দিয়ে গড়া সমাজের একটি স্থির লক্ষ্যও তা দিয়ে আবিল হয়ে উঠ্‌তে পারে। যত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হোক না কেন, সমাজের এই অবস্থাও একদিন কেটে যায় এবং তার মধ্যে বিনষ্ট আদর্শের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তা না হয়, ততদিন পর্যন্ত সমাজ-জীবনের ওপরের স্তরে এই সাময়িক বিক্ষোভ যদি জাতির সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়, তবে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে তা যথার্থ শক্তি সঞ্চার করতে পারে কি না, তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন ও বিভাগোত্তর সাম্প্রতিক যুগের সমাজে জীবনের শাশ্বত এবং চিরন্তন উপকরণের ওপরের স্তরে যে বহুমুখী বিষয়ের জঞ্জালরাশি স্তূপীকৃত হয়েছে, তার ভিতর দিয়ে তার গভীরতম স্তরে গিয়ে পৌঁছান কতদূর সম্ভব এবং কতখানি প্রতিভার প্রয়োজন, তা বিশেষ বিচার-সাপেক্ষ।

সামগ্রিক ভাবে বাংলার সমাজ-জীবনের ওপর এত বড় বিক্ষোভ ইতিপূর্বে আর দেখতে পাওয়া যায় নি। বাংলার নীল-বিদ্রোহই হোক, স্বদেশী আন্দোলনই হোক, কিংবা অসহযোগ আন্দোলনই হোক, সাম্প্রতিক দেশ-বিভাগের মত তারা এত বিরাট সামাজিক বিক্ষোভ এদেশে আর কোন দিন সৃষ্টি করতে পারে নি। দীর্ঘকালের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে একটা সমাজের আত্ম-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়; সুতরাং তা সহজে ভাঙ্গতেও পারে না; কিন্তু তাও যখন ভেঙ্গে পড়ে, তখন বিরুদ্ধ শক্তির আঘাতে তার আত্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে যায়। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কোন দেশে হয়ত এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যেতে পারে; কিন্তু তার সঙ্গে বাংলা দেশের বিপর্যয়ের পার্থক্য আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন মানুষ মরে, তখন সে নিজে কিংবা সমাজের অন্য কেউই তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভিসুবিয়সের অগ্নি উদ্‌গীরণের ফলে পম্পাই নগর ধ্বংস হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক মরেছিল; এই ধ্বংসক্রিয়া যেমন মানুষের ক্রিয়া নয়, তেমনিই

সেদিন যারা বেঁচেছিল, তারাও তাদের প্রতিবেশীদের মৃত্যু রোধ করতে পারে নি। সেখানে দৈবনির্ভরতার সৃষ্টি হয়; কিন্তু বাংলার এই অভিশাপ মানুষেরই সৃষ্টি, নিজের স্বার্থের বশবর্তী হয়ে একদল মানুষ অসহায় দুর্বল অন্য আর একদলের প্রাণ হরণ করেছে, কেউ কাউকেই রক্ষা করতে এলো না; সুতরাং আগেই বলেছি, যে মরল, তার দৈহিক মৃত্যু হোলেও এই নির্বিচার মৃত্যুর যারা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা, তাদেরও নৈতিক মৃত্যু হলো। সমাজ-জীবনাশ্রিত মানুষই সাহিত্যের মানুষ, নীতি দিয়ে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়, স্বেচ্ছাচারিতা দিয়ে নয়। সুতরাং মনুষ্যত্ব বিসর্জনই সামাজিক মানুষের মৃত্যু। অতএব নৈতিক মৃত্যুও মানুষ হিসেবে মৃত্যু। মানুষ ও মনুষ্যত্বের নির্বিচার হত্যা যে সমাজের চোখের ওপর অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে তার প্রত্যক্ষ সমাজজীবন-ভিত্তিক নাট্যসাহিতের মধ্য দিয়ে উচ্চ আদর্শের কোন্ বলিষ্ঠ শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতে পারে? এই ভাবে মানুষের শক্তির ওপরই অবিশ্বাস এসে পড়লে, শুধু নাট্যসাহিত্যেই কেন, সাহিত্যের আর কোন বিভাগেই উচ্চতর কোন সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে না।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্যে ব্যক্তিচরিত্রের বলিষ্ঠতার পরিবর্তে গোষ্ঠীজীবন যে অধিকতর প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, তার প্রধান কারণ তাই। বিগত উনিশ শতকে সমাজ-জীবনের মধ্য থেকে ব্যক্তিচরিত্রগুলো যেভাবে স্বতন্ত্র হয়ে আসতে পারত, সাম্প্রতিক সমাজে তা হবার উপায় নেই। এখন সমাজের যে পরিচয়, তা গোষ্ঠীগত ভাবেই প্রকাশ পায়, সমস্যা এখন আর ব্যক্তি কিংবা ব্যষ্টির নয়; আগে যে সমস্যাগুলোর উল্লেখ করেছি, তা গোষ্ঠীরই সমস্যা ছিল। উনিশ শতকে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, পরমহংস ও বিবেকানন্দের মত এক-একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব সমাজের মধ্য থেকে মাথা তুলে উঠতো। সেই আদর্শ সম্মুখে রেখে সে যুগে যে নাটক রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের প্রতিবিম্বরূপে এক একটা বলিষ্ঠ নায়ক-চরিত্র সৃষ্টি হবার সুযোগ

পেয়েছে। এমন কি, মধ্য যুগেও যে আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হয়েছিল, তার মধ্যেও প্রায় সর্বত্রই চৈতন্য-চরিত্রের অনুরূপ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক নাটকের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তা'তে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন একক নায়ক-চরিত্রের পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করবার পরিবর্তে গোষ্ঠী-জীবনের সামগ্রিক পরিচয়ই মুখ্য স্থান লাভ করে। এই কথাটি বিশেষ ভাবে বোঝবার প্রয়োজন আছে; কারণ, ব্যক্তির পরিবর্তে গোষ্ঠীজীবনই যদি সমাজের এই প্রকার লক্ষ্য হয়ে ওঠে, সমগ্র সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগেরই বাহন যদি নাটক হয়, তা হলে জীবনের কোন গভীর বিষয়ের পরিবর্তে কেবলমাত্র ওপরের স্তরেই তার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কঠিন সত্যের সম্মুখীন হয়ে বাঙ্গালীর জীবন থেকে ভাব কিংবা কল্পনা-বিলাসিতা দূর হয়েছে সত্য, কিন্তু রূঢ় বাস্তবকে নাটকে রূপায়িত করতে হলে এবং নাটকের বিশিষ্ট আঙ্গিক অনুসরণ না করলে তার যথার্থ শক্তি অনুভব করা যায় না। কিন্তু আজকের জীবনের যে সমস্যা, তা ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেণীর; সেইজন্যে নাটকেও যে বিষয় রূপায়িত হয়, তাও ব্যক্তিকে আশ্রয় করতে পারে না, শ্রেণীকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পায়।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে জীবনের অর্থনৈতিক দিকটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। একান্ত ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা নিয়ে সংগ্রাম এবং জীবনের বহির্মুখী অর্থনৈতিক দৈন্য নিয়ে সংগ্রাম এক নয়—প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সংগ্রামশীল চরিত্রের কোন সঙ্গী নেই, নিজের দুঃখভোগের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে তার বিপরীত, এখানে তার সঙ্গীর অভাব নেই; সুতরাং সে অতি সহজেই এখানে অন্যের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়; প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য আনুপূর্বিক রক্ষা পেতে কোন বাধা হয় না। এই চরিত্রই যথার্থ নাটকীয় চরিত্র বলে গণ্য হবার যোগ্য, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর চরিত্রের সেই যোগ্যতার অভাব আছে।

সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে প্রধানতঃ যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তা বহির্মুখী বিষয়কে এই ভাবে অবলম্বন করে বলে ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের সংঘর্ষ সৃষ্টি হবার পরিবর্তে তা শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংগ্রামে পরিণত হয়। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে প্রায়শঃই যে শ্রমিক ও মালিকের সংঘর্ষের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, তাও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ নয়, বরং শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষ। তা শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর বহির্মুখী অর্থনৈতিক সংঘর্ষ বলেই তার মধ্য দিয়ে নীতির কথা যত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ব্যক্তি-জীবন তত স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না।

কর্মে এবং চিন্তায় বাংলার সমাজ আজ 'নোঙর ছেঁড়া নৌকো'র মত অকূলে ভাসছে—তার কোন লক্ষ্য নেই, তীরের কোন ঠিকানা নেই। এই অবস্থা যতদিন চলতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বহির্মুখী সমস্যারই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, একথা সত্য। কিন্তু এই সমস্যার মধ্যেও যে ব্যক্তি-মানবটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় নি, তা স্পষ্ট করে কেউ উপলব্ধি করতে পারছে না; সেই জন্যে সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে জীবনের কোনও সমস্যারই সমাধান এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি, যে সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে, তা ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেণীরই সমস্যা। কিন্তু ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব সমস্যাই নাটকের সমস্যা, শ্রেণীর আশ্রিত হয়েও যে ব্যক্তিত্ব অবিনশ্বর, তার উপলব্ধিতেই নাটকের সার্থকতা।

এই আলোচনা থেকে এ'কথা বুঝ্‌তে পারা গেল যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঙ্গালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক জগতে প্রচণ্ডতম বিপর্যয় এনে দিয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর পঞ্চাশ লক্ষ নরনারীর বলি গ্রহণ করলো। কালো বাজারের তামসরন্ধ্র দিয়ে নির্লজ্জ নিষ্ঠুর লোভের বীভৎস বন্যা বয়ে চল্‌ল। পূর্ব সীমান্তে জাপানী আক্রমণের প্রেতচ্ছায়া নাম্‌ল। উন্মত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আগস্ট আন্দোলনকে বর্বরতম অত্যাচারে স্তব্ধ করে দিতে চাইল। ফসল বিহীন প্রান্তরে বিকীর্ণ হয়ে রইল বাঙ্গালী কৃষকের কঙ্কাল,

বাংলার কুলবধূ অন্নাভাবে অন্তঃপুর পরিত্যাগ করল, কোলকাতার নিষ্প্রদীপ রাত্রি পাপ ও অন্যায়ের ওপর অন্ধকারের অবগুণ্ঠন মেলে রাখলো। আর মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী ক্রোধ, গ্লানি এবং অপমানের দুঃসহ জ্বালায় জ্বলতে লাগ্‌ল। বাংলা সাহিত্যে এই অন্তর্যন্ত্রণা বিম্বিত হলো—বাংলা নাটকও যুগের দাবিকে আর অস্বীকার করতে পারল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বাত্মক বিপর্যয় পূর্ণতর বাস্তবতা এবং সমকালীন সমস্যা-সংঘাতের প্রত্যক্ষতর অভিব্যক্তি দাবি কর্‌ল। ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সমস্ত পূর্ব সংস্কারকে ভেঙ্গেচুরে গতানুগতিক নাটকীয়তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে জীবনকে নগ্ন নিরাবরণরূপে উপস্থাপিত করবার প্রেরণায় শৌখিন তরুণ নট ও নাট্যসম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল। তার সঙ্গে কতকটা রাজনৈতিক চেতনাও মিলল—তা গণ-আন্দোলনের উপলব্ধি। শ্রমিক ও কৃষকের অধিনায়কত্বে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ইতিবৃত্ত রচিত হবে, পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণবাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী এক স্বাধীন সর্বশৃঙ্খল-মুক্ত মানবতার প্রতিষ্ঠা হবে—সমগ্র দুঃখ ও দুর্গতির মধ্যেও এই বিশ্বাস তরুণ নাট্যামোদীদের দৃষ্টিকে অনুরঞ্জিত করে তুলল।

ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চও এই নবপ্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে পারত—তাই স্বাভাবিকও ছিল। কিন্তু মঞ্চ প্রযোজকেরা পেছিয়ে রইলেন দুটো কারণে। প্রথমতঃ বাস্তবতা-মুখ্য কোন দুঃসাহসিক নাট্য-প্রয়াসকে মঞ্চস্থ করবার মত কল্পনাশক্তি তাঁদের ছিল না এবং তার অর্থকরী সাফল্য সম্পর্কেও তাঁরা নিশ্চিত হতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ তারা রাজরোষের আশঙ্কাও করতেন। অপ্রিয় সত্যের খাতিরে বল্‌তেই হবে, লক্ষ্ণৌতে অস্ত্রধারী গোরা সৈন্যের আক্রমণের মুখেও যে বাঙ্গালী নটেরা নির্ভয়ে 'নীল-দর্পণ' মঞ্চস্থ করেছিলেন, সেই গৌরবের উত্তরাধিকার তারা রক্ষা করতে পারেন নি। বরং নানাভাবে তাঁরা বহুদিন পর্যন্ত নতুন নাট্য আন্দোলনের বিরোধিতা করেই

এসেছেন। আজ পর্যন্তও তাঁরা ব্যবসায়ী গতানুগতিকতা থেকে বিশেষ মুক্ত হয়েছেন, তা বলা যায় না।

ব্যবসায়ী মঞ্চ পিছিয়ে রইল বটে ; কিন্তু ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে এক নূতন নাট্য আন্দোলন তার ভূমিকা গ্রহণ করলো। পথনির্দেশকরূপে উপস্থিত হলো 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' ১৯৪৪ সালে তাঁদের 'নবান্ন' নাটক নিয়ে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য মন্বন্তরের পটভূমিকায় গ্রাম্য কৃষক প্রধান সমাদ্দারের দুঃখ-বেদনা, সংগ্রাম-স্বপ্নের যে চিত্রটি ফুটিয়ে তুললেন—এক কথায় তাকে বৈপ্লবিক বলা যেতে পারে। নতুন বক্তব্য, নতুন পদ্ধতি ও নির্ভীক বাস্তবতায় রচিত এই নাটকটিকে তরুণ অব্যবসায়ী নটনটীদের অভিনয় জীবন্ত করে তুলল্। 'নবান্নে'র অভিনয় দেশের এক শ্রেণীর তরুণ সম্প্রদায়ের সম্মুখে এক নতুন আদর্শের সন্ধান দিল।

'নবান্ন' থেকে যে ধারা মুক্ত হলো, তা আর রুদ্ধ হলো না। বাংলা দেশের জিলায় জিলায় 'গণনাট্য সংঘে'র শাখা স্থাপিত হলো, সর্বত্র স্থানীয় প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করতে লাগ্ল। শ্রমিক-কৃষকের জীবন নিয়ে, সমকালীন সমস্যা ও মধ্যবিত্তের দায়িত্ব নির্ণয় করে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আদর্শকে পুরোভাগে রক্ষা করে নতুন নতুন নাটকের ও নাট্যকারের অভ্যুদয় ঘট্‌তে লাগ্‌লো। ইংরেজ সরকার কোন কোন নাটকের কণ্ঠরোধ করলো—কিন্তু এই শ্রেণীর নাটক রচনা অব্যাহত গতিতে চল্ল।

এই নতুন-নাট্য আন্দোলনের কয়েকটা বিশেষ উপস্থাপ্য বিষয় ছিল। বাহুল্য হলেও আজ সেগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে ; কারণ, 'শিল্পের জন্য শিল্প'-কে এই আন্দোলনের কর্মীরা কোনদিনই মেনে নেন নি। 'জীবনের জন্য শিল্প'—এই-ই ছিল তঁদের বক্তব্য। এই জীবনকে কি ভাবে পরাজয়ের পঙ্ক থেকে মুক্ত করে একটা সুস্থ সমাজবাদী অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সমুত্তীর্ণ করানো যায়, তাঁরা সেইটিকেই তাদের ধ্রুব লক্ষ্যে পরিণত করেছিলেন। এই কারণেই তাঁদের নাট্য-চেষ্টাগুলোর মধ্যে

কয়েকটা লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আমরা মোটামুটি ভাবে সেগুলোকে এইভাবে নির্দেশ করতে পারি :

প্রথমতঃ নাটকে শ্রমিক-কৃষকের উপেক্ষিত ব্রাত্য জীবনকে উজ্জ্বল মহিমায় জাগিয়ে তোলা ; তারাই আগামী ইতিহাসের অধিনায়ক—এই কথা স্মরণ রেখে তাদের সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের দাবিকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা এবং জমিদার-মহাজন-কালোবাজারী ও দুর্নীতি-গ্রস্ত আমলাতন্ত্র কি ভাবে তাদের ওপর শোষণ ও নির্যাতন করে, তাও উদ্‌ঘাটিত করা। এরই সিদ্ধান্তরূপে স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তিকে তুলে ধরা।

এই সময় বাংলা দেশে লীগ-কংগ্রেসের বিরোধের ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প চারদিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছিল—লজ্জাস্কর আত্মকলহ প্রতিদিনই কদর্যতর হয়ে উঠ্‌ছিল। সুতরাং, নাটকের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুস্‌লিম ঐক্যের বাণী প্রচার করা এবং জনগণকে বোঝানো যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বজ্রকঠিন বন্ধন দিয়েই দেশের স্বাধীনতা আনা সম্ভব।

সমাজতন্ত্রবাদের সূত্র অনুযায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শূন্য-নির্ভর ত্রিশঙ্কু বলে এর কর্মীরা মনে করতেন। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে অবক্ষয়ী মধ্যবিত্তের স্ববিরোধী বিভ্রান্ত ভূমিকাটি স্পষ্ট করে তোলা এবং তাদের সংগ্রামের অংশীদার হওয়া—পুঁজিবাদী ও শোষকশ্রেণীর কৃপানির্ভর হলে যে চলবে না, তা তাঁরা বোঝাতে চাইলেন। মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙ্গনের রূপটিও নির্ভয়ে তুলে ধরতে লাগলেন।

জাপানী ফ্যাসিজ্‌ম্‌ ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বাংলা দেশের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তাকে রোধ কর্‌তে পারছে না। এই ফ্যাসিস্তরা যাতে দেশের মৃত্তিকায় পদক্ষেপ করতে না পারে, তার জন্যে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ-বাহিনী গড়বার প্রেরণা যোগানো—প্রয়োজন হলে ঘরের মেয়েরাও তাতে অংশ গ্রহণ করবেন, এই রকম বিশ্বাস সৃষ্টি।

বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ ব্যাপারেও নবতর পদ্ধতি অবলম্বিত

হলো। জনসাধারণের সম্মুখে, মজুর-কৃষকের সমাবেশে যে নাটক অভিনয় করা হবে, তার জন্যে বিচিত্র দৃশ্যপট, সাজসজ্জা কিংবা বর্ণাঢ্য আলোক-সম্পাতের আয়োজন সম্ভব নয়। আন্দোলনের কর্মীরা সেইজন্যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত স্মরণে রেখে কালোপর্দার সাহায্যে অথবা প্রতীকরূপে একটা গাছের ডাল কিংবা খড়ের চালাকে পশ্চাৎপটে রেখে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। বক্তব্যের শক্তি এবং আন্তরিকতাপূর্ণ বলিষ্ঠ অভিনয় দিয়েই তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করতে চাইতেন—লক্ষ লক্ষ দর্শক অনুপ্রাণিত হয়ে উঠত, মঞ্চগত দৈন্য তাঁরা লক্ষ্যও করত না।

তারপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তসমুদ্র মন্থন করে স্বাধীনতা এলো। কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বাদ বাঙ্গালী সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারলো না। বঙ্গব্যবচ্ছেদ এবং উদ্বাস্তু সমস্যার বেদনা তার বুকে পাষাণের ভার হয়ে চেপে বসল।

'গণনাট্য সংঘে'র শিল্পসৃষ্টিরও মোড় ঘুরল। নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্য বহু-বিচিত্র মুখে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। ব্যক্তির অধিকার নিয়ে সংগ্রাম, মধ্যবিত্ত সমস্যা প্রভৃতি ত রইলই, তার সঙ্গে এলো ঐতিহ্যচর্চা। দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নতুন ভাবে সাজিয়ে মঞ্চস্থ করা হলো। নাটকের গণ্ডী স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে সেক্সপীয়র, ইবসেন, গোর্কী, চেকভ, প্রভৃতির নাটকাদির অনুবাদ বা ভাবানুবাদ হতে লাগল। ভিখারী থেকে ফাঁসীর আসামী পর্যন্ত কেউই আর নাটকের বাইরে রইল না। এক কথায় নূতন নাট্য আন্দোলন জীবনের সবদিকেই নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে দিল।

আঙ্গিকে এবং অভিনয়েও নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হলো। নবপদ্ধতির যাত্রা এসেও দেখা দিল, বর্তমান কালে আমরা নূতন নাটক আন্দোলনের এই বহু ব্যাপক অভিব্যক্তিই লক্ষ্য করছি। অসংখ্য নাট্যকার এবং অগণ্য শৌখীন নাট্য প্রতিষ্ঠান সহস্রাশ্ব রথের ন্যায় তাকে বহন করে কিছুকাল ধরে চলেছিল। সার্থকতা ও ব্যর্থতা, ফ্যাশন ও আন্তরিকতা, নিছক পরীক্ষা-মূলকতা ও নবীন কর্মোদ্যম—

এইগুলো সম্মিলিত ভাবে অগ্রসর হওয়ার পর তার ধারা আজ অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। তবু এ-কথা বলা যেতে পারে, ব্যবসায়ী মঞ্চই আজ আর একমাত্র বাংলা নাটকের ভাগ্যনিয়ন্তা নয়—এই শৌখিন ও অর্ধব্যবসায়ী নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতেই সম্ভবত আগামী কালের নাটক ও নাট্যকলা গড়ে উঠবে।

কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আন্দোলনের ধারা আজ প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে এসেছে; 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র কেন্দ্রীয় সংস্থা বলে আজ আর কিছু নেই; তবে তার নামে যে সকল আঞ্চলিক শাখা গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে কোন কোনটি এখনও কোন রকমে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। যাঁরা একদিন 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে সক্রিয় ভাবে সংযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কোন কোন শক্তিশালী অভিনেতা ও নাট্যকার তা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নিজেরা নিজেদের এক একটি গোষ্ঠী রচনা করে নিজেদের নাট্যসংস্থা গড়ে তুলেছেন; তাদের মধ্য দিয়ে সর্বত্রই যে নতুন ধারার নাট্য আন্দোলনের মৌলিক আদর্শ অনুসরণ করা হচ্ছে, তা বলবার উপায় নেই। যে সকল প্রত্যক্ষ সমস্যার ওপর নির্ভর করে সংঘের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল, তাও আজ অনেকখানি গৌণ হয়ে পড়েছে বরং তার পরিবর্তে সমাজে ইতিমধ্যেই নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য একটি অবিচল আদর্শকে সাম্‌নে রেখে তার অগ্রসর হবারও কোন উপায় ছিলনা।

সাম্প্রতিক বাংলা নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে একশ্রেণীর নতুন বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে, তা কাব্যনাট্য বলে পরিচিত; কিন্তু এখনও তা পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষ আশাপ্রদ হয়ে উঠছে, তা একাঙ্ক নাটক। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বাংলার প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায় আধুনিক বাংলার প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' যখন রচনা করেছিলেন, তখনই বাংলার বিদগ্ধ সমাজ তার মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন; সেই

সময়ই নাটকটি কোলকাতার একটি বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে সার্থকভাবে অভিনীত হয়ে কেবল মাত্র তা পাঠ্য নাটক হিসেবেই নয়, অভিনয়-যোগ্য নাটক রূপেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তারপর থেকে তিনি সুদীর্ঘ কাল ধরে নিঃসঙ্গ সাধনা করে একাঙ্ক নাটক রচনার ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন; সাম্প্রতিক কালে তিনি এই সাধনার পথে বহু সঙ্গী লাভ করেছেন।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে, তা' থেকে বাংলা একাঙ্ক নাটকও তুল্য সার্থকতা লাভ করতে পারবে, এ কথা মনে করা স্বাভাবিক হলেও, প্রকৃত পক্ষে ছোট গল্প ও একাঙ্ক নাটকের ধর্ম এক এবং অভিন্ন নয়—এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবু এ'কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, বাঙ্গালীর জীবনে একাঙ্ক নাটক রচনার উপকরণেরও আজ অভাব নেই। কেবল যথাযথ যদি উপলব্ধি করবার ক্ষমতা থাকে, তবে তার সন্ধান করে তা দিয়ে সাহিত্যের এই বিশেষ অঙ্গটি পরিপুষ্ট করা যেতে পারে। অনেক তরুণ নাট্যকার এই পথে অগ্রসর হয়ে ইতিমধ্যেই যে সাফল্য লাভ করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজ আর উপেক্ষা করাযেতে পারে না।

কিন্তু বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের পথে বাংলা একাঙ্ক নাটকের যে উদ্ভব হয়েছে, তা নয়—তার মূলে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের One Act Drama রচনার বিশেষ প্রভাব সক্রিয় বলে অনুভব করা যায়। এই প্রভাব কেবল যদি আঙ্গিকেরই হোত, তা হলে বলবার বিশেষ কিছুই থাকত না; কিন্তু অনেক সময় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্ত্য একাঙ্ক নাটকের ভাব কিংবা আইডিয়ারও প্রভাব এদের মধ্যে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌ছে। বাংলা ছোট গল্পেরও একদিন তাই হয়েছিল, কিন্তু ক্রমে যখন তার প্রভাব থেকে তা মুক্ত হয়ে এসে বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ জীবনের রসে জারিত হলো, তখনই তার মধ্যে যথার্থ শক্তি দেখা দিল। বাংলা একাঙ্ক নাটকের

মধ্যেও ধীরে ধীরে সে গুণ প্রকাশ পাচ্ছে বলেই তার ভিতরে শক্তির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

আধুনিক নাটক কেবল দৃশ্যই নয়, পাঠ্যও বটে। নাটককে যদি দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যও না করে তোলা যায়, তবে তার স্থায়িত্ব রক্ষা পায় না। একাঙ্ক নাটকের পাঠ্যগুণ আরও বেশি হওয়া আবশ্যক; কারণ, তাদের অধিকাংশেরই অভিনীত হবার কোন সুযোগ হয় না। আমাদের দেশে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ কদাচ একাঙ্ক নাটকের অভিনয় করে না; সেইজন্য অনেকে একাঙ্ক নাটকেও দৃশ্যগুণ অযথা বাড়িয়ে তুলে অভিনয়ের দিক থেকে তাদের আকর্ষণ সৃষ্টি কর্‌তে চান, তা'তে তার সাহিত্য গুণ বিসর্জিত হয়। একাঙ্ক নাটকের পরিমিত পরিসরের মধ্যে রোমাঞ্চকর নাট্যক্রিয়ার কোন অবকাশ নেই; এমন কি, বিয়োগাত্মক পরিণতিরও অবকাশ অনেক কম; অতি-নাট্যিক (melo-dramatic) ঘটনার অবকাশ আরও কম। অথচ একাঙ্ক নাটকও যে নাটক, ছোট গল্প কিংবা ঘটনা মাত্রের ধারা-বিবরণী নয়, তাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। এতগুলো দিক বাঁচিয়ে একাঙ্ক নাটক লিখবার যে দায়িত্ব আছে, তা যথাযথ পালন করতে পার্‌লে সাহিত্যের যে তা একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ হতে পারে, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। সাম্প্রতিক বাংলা নাট্য সাহিত্যের এই বিষয়ক প্রয়াস যে সার্থক হতে চলেছে, এমন আশা দুরাশা নয়।

বাংলা নাটকের স্বাধীন বিকাশের পথে আর একটি কঠিন বাধা সাম্প্রতিক কালে দূর হয়ে গেছে—তা' এর উপর ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রভাব। বাংলা নাট্য সাহিত্যের মধ্য যুগে কোলকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গঞ্চেগুলো বাংলা নাটক রচনা এবং নাট্যকারদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করত। তার ফলে বাংলা নাটকের স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে তার একটি নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন ধারা সৃষ্টি করেছিল। কেবল রবীন্দ্রনাথ তার ব্যতিক্রম ছিলেন। সাম্প্রতিক কালে কতকগুলো শৌখীন নাট্যসম্প্রদায় গড়ে ওঠে, নাটক রচনা এবং

অভিনয়গুণ উভয়েরই যথার্থ শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ করেছে। তার ফলে ব্যবসায়ীর নির্দেশ-মুক্ত স্বাধীন নাটক রচনার প্রেরণা দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গতানুগতিকতা মুক্ত নব নব অভিনয় গুণেরও বিকাশ দেখা যাচ্ছে। আশা করা যায়, নবযুগের শ্রেষ্ঠ নাটক তার মধ্য থেকেই একদিন রচিত হবে। কারণ, যেখানে স্বাধীনতা, সেখানেই সৃষ্টি, যেখানে বন্ধন সেখানেই বিনাশ।

সমাপ্ত

অভিনয়গুণ উভয়েরই যথার্থ শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ করেছে। তার ফলে ব্যবসায়ীর নির্দেশ-মুক্ত স্বাধীন নাটক রচনার প্রেরণা দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গতানুগতিকতা মুক্ত নব নব অভিনয় গুণেরও বিকাশ দেখা যাচ্ছে। আশা করা যায়, নবযুগের শ্রেষ্ঠ নাটক তার মধ্য থেকেই একদিন রচিত হবে। কারণ, যেখানে স্বাধীনতা, সেখানেই সৃষ্টি, যেখানে বন্ধন সেখানেই বিনাশ।

সমাপ্ত